ধুলোউড়ির কুঠি

প্রমথনাথ বিশী

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬২
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
গণেশ বসু
মুদ্রাকর
সরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা ৬

শ্রীসুরুচি বিশী

কল্যাণীয়াসু

ধুলোউড়ির কুঠি

দেখ্‌, দেখ্‌, মোহন, ঐ আর একখানা ডিঙি ডুবে গেল।

দাদাবাবু সকালবেলা থেকেই দেখছে ডিঙি ডুবছে।

না দেখে উপায় কি রে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতেই হবে। কেন যে তোর চোখে পড়ে না তাই ভাবছি।

চোখে পড়ে বই কি, আমি তো চোখ বন্ধ করে নেই।

তবে ?

তবে আর কি। তুমি দেখছ ডুবলো আমি দেখছি ভেসে উঠল।

দীপ্তিনারায়ণ হেসে উঠল, বল্‌ না, না ডুবলে ভেসে উঠবে কেমন করে।

দাদাবাবু, তুমি যাকে ডোবা বলছ সেটা আর কিছুই নয় ঢেউয়ের আড়ালে পড়ে যাওয়া, যা বড় বড় ঢেউ দিচ্ছে বিলের জলে। এসব ছোট নৌকো বড় একটা ডোবে না। এতকাল তো আছি বিলের কাঁধিতে একখানা ডিঙিও তো ডুবতে দেখলাম না। বড়রই বিপদ।

আচ্ছা মোহন তুই আগে কখনও এত বড় ঝড় দেখেছিস ?

ক – ত। শব্দটা টেনে লম্বা করে উচ্চারণ করল, যেন ওতেই ঝড়ের প্রচণ্ডতা প্রকাশ পেল।

তবে কি জান দাদাবাবু চোত-বোশেখের ঝড়ে আর এই আশ্বিনের ঝড়-গুলোয় তফাত আছে। কালবৈশাখীর ঝড়েই নৌকো বানচাল হয় বেশি, আচমকা আসে কিনা।

কিন্তু যাই বলিস এত বড় আশ্বিনে ঝড় আগে কখনো দেখিনি।

তুমি আর কদিনের ছেলে, নেহাত এখন মনিব হয়েছ তাই আজ্ঞে আপনি দাদাবাবু বলি।

বলিস কি রে, আমার বয়স এই আশ্বিনে কুড়ি হল।

কুড়ি কি আবার একটা বয়স নাকি। আমার বয়স দেড়কুড়ি আর মুকুন্দদার বয়স তিনকুড়ি হবে।

তোদের গাঁয়ে সবাই কুড়ি দিয়ে গোনে।

তা যা বলেছ। ঐ যে আমাদের ভানু রায়ের মা খুনখুনে বুড়ী, তাকে বয়স

জিজ্ঞাসা করলে একবার বলে তিনকুড়ি, আর একবার বলে পাঁচকুড়ি, আবার এক দিন বলে কিনা হবে এককুড়ি। শুনে বললাম তবে দেখছি তুমি আমাদের দাদা-বাবুর সমান। ওমা তাও তো, বলে গালে হাত দিয়ে বসে রইল।

আসলে কি জানিস ও কুড়ির বেশি জানেই না।

ঝড়ের দাপট কমে এসেছিল, সেই সুযোগে ওরা কথা বলে চলেছিল, নইলে ঝড়ের হা হা ধ্বনির মধ্যে মুখের কথা কানে এসে পৌঁছয় না।

ঝড় আবার প্রচণ্ডতর মূর্তি ধারণ করল, ঝড়ের তর্জন এমন ভীষণ হয়ে উঠল যে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না। মোহন দেখল দর্পনারায়ণের ঠোঁট দুটো নড়ছে কিন্তু কথা পৌঁচচ্ছে না তার কানে। তখন সে হাতের মুদ্রায় জিজ্ঞাসা করল, কি বলছ ?

দীপ্তিনারায়ণ হাতের মুদ্রায় বিলের দিকে দেখিয়ে দিল। কিছু চোখে পড়ল না মোহনের, অসম্ভব নয়। যেমন ঝড়ের গর্জন তেমনি ঢেউয়ের আস্ফালন, বিল দামাল হয়ে উঠেছে। তখন সে এগিয়ে এসে জানলা বন্ধ করে দিয়ে শুধালো, দাদাবাবু কি বলছিলে ?

কিছুই বলিনি। দূরে যেন একটা বজরা চোখে পড়ল বলে মনে হল—তাই হাত দিয়ে দেখালাম।

ঠিক দেখেছ তো ?

তাই তো মনে হল। তবে বাইরে যেমন অবস্থা নিশ্চয় করে বলতে পারি না।

এসো না দেখাই যাক।

জানলা খুলে ফেলতেই ঝড়বৃষ্টির শব্দ একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বন্ধ করে দিতে হল জানলা।

কি রে কিছু দেখতে পেলি ?

সে শুধু ঘাড় নাড়ল। তারপর এগিয়ে এসে বলল, ডাকু রায়ের মা বলত এই বিলের মধ্যে একশো কুড়ি ডাকিনী বাস করে। যখন তারা নৃত্য শুরু করে তখন আরম্ভ হয় ঝড়জল।

চল আর একবার জানলাটা খোলা যাক দেখি কি চোখে পড়ে; ডাকিনী তো কখনও চোখে দেখিনি। যদি দেখতে পাওয়া যায় মন্দ কি।

এবারে জানলা খুলতে আর ঝড়জল ঘরে ঢুকল না। আশ্বিনে ঝড়ের এলো-মেলো গতি, জানলার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। দু'জনেরই চোখে পড়ল এক-খানা বড় বজরার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে ডাকিনীর দল।

দেখেছিস ?

এবার দীপ্তির কথা শুনতে পায় মোহন।

তাই তো দেখছি, এ যে মস্ত বজরা।

তুই তো বলেছিলি বড় বজরাতেই ভয়- ডুববে নাকি ?

তাই মনে হয়।

আর আমাদের বাড়ির সামনে বানচাল হবে, না জানি ভিতরে কারা আছে।

বৃহৎ বজরাখানা ঝড়ের দাপটে এপাশ ওপাশ করছে। ঝড় আর একটু রেগে উঠলেই কাত হয়ে ডুবে যাওয়া অসম্ভব নয় কিংবা একেবারে উল্টে যেতেও পারে।

একবার মুকুন্দদাদাকে ডাক না, মা বলতেন বিপদকালে বুড়োর কাছে পরামর্শ নিবি।

দাদাবাবু খুব সাবধান। মুকুন্দদার কানে যেন না যায় যে তাকে বুড়ো বলেছ।

দীপ্তি হেসে বলল, তাও বটে। ঝড়ের শাসানিতে ভুলেই গিয়েছিলাম।

ব্যাখ্যা করে মোহন বলল, একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম মুকুন্দদা বয়স ষাট না বলে তিনকুড়ি বলো কেন ?

জানিস কি ষাট বললে মনে হয় এত বয়স হয়েছে তবে তো বুড়ো হয়েই গিয়েছি, তাই বলি তিনকুড়ি, কত কম হল।

বললাম আর সঙ্গে সঙ্গে বয়সটাও কমে গেল।

শুনে মুকুন্দদা হেসে উঠল, দেখা গেল সবগুলো দাঁত, একটাও পড়েনি।

এখনি পড়বে কিরে, ওর বয়স তো মাত্র তিনকুড়ি। যা, ডেকে নিয়ে আয়।

মোহন একতলায় নেমে চলে গেলে দীপ্তি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বিলের মধ্যে ডাকিনীর নৃত্য।

কত কথা মনে পড়ে যায়। অনেকদিন আগে একবার বাবার সঙ্গে নৌকো করে বিলের মধ্যে বের হয়েছিল, তখন তার কত বয়স মনে পড়ে না, তবে বাবার সঙ্গে গোপনে জোড়াদীঘি যাওয়ার পরে ভুল নাই। তখন ঘোড়ায় চড়তে শিখেছে, ঘোড়ায় চড়ে দূরের পথ পাড়ি দিতে পারে। ধুলোউড়ি থেকে জোড়াদীঘি অনেক ক্রোশ পথ, কত ক্রোশ ঠিক জানে না, তবে জানে যে সেখানে পৌছতে দুদিন লেগেছিল। মাঝখানে রাত এসে পড়ল, দুজনে আশ্রয় নিল এক সম্পন্ন কায়স্থ গৃহস্থের বাড়িতে। হঠাৎ দুটি ভদ্রলোক অতিথি পাওয়ায় লোকটা খুব খুশী। কিন্তু মুশকিল হল এই যে কিছুতেই সে অন্ন দিতে রাজী হল না। বলল, বাবু দয়া করে এসেছেন এ আমার সৌভাগ্য কিন্তু ব্রাহ্মণকে অন্ন দিয়ে নরকস্থ হতে পারব না।

নবীননারায়ণ হেসে বলল, তবে কি অনাহারে রাখবেন ?

রাঘব দত্ত (ঐ তার নাম) জিভ কেটে বলল, আর অপরাধ বাড়াবেন না। আমার বাড়িতে ব্রাহ্মণ পাচক আছে তবু তো এক চালের তলে কিনা।

আচ্ছা যা দিলে আপনার সন্তোষ হয় আর আমাদের বাপ-বেটার পেট ভরে তাই দেবেন।

সেদিনের আহারের স্মৃতি এখনো মনে আছে দীপ্তিনারায়ণের। গরম গরম ফুলকো লুচি, বাটিভরা ক্ষীর আর কাঁচাগোল্লা। ওরা দুজনে খেতে বসলে রাঘব দত্ত মৃদু শাস্ত্রীয় হাসি হেসে বলল, ঘৃতপক্ক খাত্তে দোষ নাই।

পিতা হেসে উত্তর দিল, এমন ঘৃতপক্ক পেলে আর কে জলপক্ক অন্ন খাবে।

তারপরে নানা প্রসঙ্গ উঠল : বাবুদের কোথায় যাওয়া হবে, কোথা থেকে আসছেন। এটি আপনার একমাত্র সন্তান ইত্যাদি।

নবীননারায়ণ যথাসম্ভব কাঁটা এড়িয়ে উত্তর দিতে লাগল, তবে সন্তান সম্বন্ধে প্রশ্নটি অকপটে স্বীকার করল—হ্যাঁ, এই আমার একমাত্র সন্তান।

রাঘব দত্ত বলল, যখন দেশভ্রমণেই বের হয়েছেন তবে এক কাজ করবেন। পথেই পড়বে জোড়াদীঘি গ্রাম। ঘোড়ায় যখন যাচ্ছেন আগামী কাল সন্ধ্যার মধ্যেই গিয়ে পৌছবেন।

নবীননারায়ণ বলল, সেখানে কি দেখবার আছে ?

প্রশ্নটা কিছু ভুল বুঝবার ফলে রাঘব দত্ত বলল, হাঁ, যা বলেছেন। এখন আর কি দেখবার আছে। ছিল বটে এক সময়। একবার দোলের সময় ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম, দুই শরিকের কর্মচারীরা এসে হাত ধরে টানাটানি করতে শুরু করল। এ বলে আমাদের বাড়িতে প্রসাদ পাবেন ; ও বলে তা কেন, কালকে তোমরা দু'জন পথিককে নিয়ে গিয়েছ, আসুন মশায় আজ আমাদের বাড়িতে প্রসাদ না নিলে ছাড়ছি না। এইভাবে চলল টানাটানি। প্রাণ যায় আর কি। তখন প্রাণ বাঁচাবার আশায় বললাম এবেলা দশআনির বাড়িতে যাই ; ওবেলা যাবো ছ'আনির বাড়িতে। দশআনি মহা খুশী। বলল, এবেলা এমন খাওয়া খাওয়াব যাতে ওবেলা আর খেতে না হয়। এমনি ছিল রবরবা। বাবু শুনছেন তো। আর ভালো যদি না লাগে তবে না হয় থাক।

একটা সন্দেশ ভাঙতে ভাঙতে মুখ নীচু করে নবীন বলল, না না বেশ লাগছে, বলে যান।

মুখ তুলতে সে ভয় পায়, পাছে অস্তমিত গৌরবের স্মৃতিতে উদ্গত অশ্রু

চোখে পড়ে গৃহস্বামীর। বলে, বেশ লাগছে, বলে যান।

বলব আর কি, এসব কথা আজ আর কে বিশ্বাস করবে। তখনকার দিনে দোলে দুর্গোৎসবে গাঁয়ের কারো বাড়িতে উনুন ধরত না, সব হয় এ-বাড়িতে নয় ও-বাড়িতে। আসতে দেরি হলে বরকন্দাজ গিয়ে ধরে নিয়ে আসত। শুনেছি জমিদার উদয়নারায়ণের সময়ে আরও জলুষ ছিল, তবে সে আপনাদের জানবার কথা নয়।

রাত্রে ঘরজোড়া পালঙ্কের প্রশস্ত শয্যায় শুয়ে পুত্র শুধায়, বাবা ওসব কি সত্যি, না বাড়িয়ে বলা?

বাড়িয়ে বলা কি রে, তার চেয়ে বল্ কমিয়ে বলা কিনা, উনি আর কতটুকু জানেন।

আচ্ছা উনি যে বললেন তারপর দর্পনারায়ণের সময়ে লাঠালাঠিতে সব ধ্বংস হয়ে গেল, এটা সত্যি?

ধ্বংস তো হয় না বাবা। গাছের যেন ডালপালা আর কাণ্ডটাই কেটে ফেললে, কিন্তু মূল তো মাটির ভিতরে তেমনি থেকে যায়। আবার কালে সেখানে নতুন গাছ গজায়।

হ্যাঁ তা তো দেখেছি আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানে এমনিভাবে একটা কাটা গাছের গুঁড়ি থেকে নূতন গাছ গজিয়েছিল। আচ্ছা বাবা, লাঠালাঠি হল কাদের সঙ্গে?

সেই কথা বলবার জন্যই তোকে নিয়ে বের হয়েছি, যাব জোড়াদীঘি।

বিস্মিত পুত্র শুধায়, কেন?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নবীননারায়ণ বলে, যা আগামী কাল বলব আজ না হয় আভাস দিয়ে রাখি তার।

অন্ধকারে উৎসুক পুত্রের মুখ দেখা যায় না।

বল বাবা, পুত্রের কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হয় আগ্রহের আতিশয্য।

ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি হয়ে জোড়াদীঘি ধ্বংস হয়নি, ধ্বংস হয়েছিল প্রতিবেশী এক জমিদারের সঙ্গে বিবাদে।

সেই জমিদারের নাম কি বাবা?

রক্তদহ।

নামটা তো কখনও শুনিনি বাবা।

ইচ্ছা করেই শোনাইনি। ভেবেছিলাম একটু বড় হলে তোকে সমস্ত বলব।

সে কতদিন আগেকার কথা ? তখন জোড়াদীঘির জমিদার কে ছিল ?

দর্পনারায়ণ চৌধুরী। তিনি ছিলেন আমার পিতা।

আগ্রহের আবেগে দীপ্তিনারায়ণ উঠে বসে, বলে, তা হলে আমার দাদু।

এমন সময়ে পিছনে লাঠির ঠকঠক শব্দ শুনতে পেয়ে দীপ্তি ফিরে তাকিয়ে দেখে মুকুন্দ এসেছে, পিছনে মোহন।

মুকুন্দদা তোমার আসতে এতক্ষণ লাগল ! মোহন তো অনেকক্ষণ আগে ডাকতে গিয়েছিল।

আজকাল চলতে ফিরতে কষ্ট হয় দাদা।

তোমার এমন কি বয়স হয়েছে ?

কম হল কি, তিনকুড়ি হয়েছে।

তিনকুড়ি কি একটা বয়স, তিন আর কুড়ি একুনে তেইশ।

দীপ্তির কথা শুনে মুকুন্দ হেসে ওঠে, দেখা যায় তার সমস্তগুলো দাঁত।

মুকুন্দ, তোমার একটা দাঁতও তো পড়েনি।

পড়তে দেব কেন ? রোজ সকালে উঠে নিমের দাঁতন করি না ?

কিন্তু এবারের এই ঝড়ের দাপটে দাঁতগুলো সব পড়বে। ঝড়ের বেগ দেখেছ !

তা একটু দাপট হবে বইকি, একে বলে আশ্বিনের ঝড়, তবে এমন কিছু বেশি নয়।

বেশি নয় ! একসঙ্গে বলে ওঠে দীপ্তি আর মোহন।

এদিকে এসে জানলার কাছে দাঁড়াও দেখি।

জানলার কাছে এসে মুকুন্দ বলে, তাই তো দেখছি, এ যে বিল দামাল হয়ে উঠেছে।

মোহন দামালের সঙ্গে মিল দিয়ে বলে শুধু, দামাল নয়, সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।

দীপ্তি বলে, ওই বজরাখানা একবার দেখ।

মুকুন্দ সভয়ে বলে ওঠে, ও যে ডুবল বলে, মাস্তুল ভেঙে পড়েছে, মাঝিদের কাউকে তো ছাদের উপরে দেখতে পাচ্ছি না।

তারা সবাই ঢুকেছে বজরার মধ্যে।

বজরার মধ্যে ঢুকেছে কি ঝড়ের দাপটে জলের মধ্যে পড়েছে। আরে মোহন দেখেছিস, হালের কাছে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

এবারে মোহন ভাল করে লক্ষ্য করে চিৎকার করে ওঠে, মুকুন্দদা হাল কোথায়?

হাল নাই, ভেঙেছে, তবে তো বজরা রক্ষা করা যাবে না, ডুবল বলে।

দর্প বলে, আমার বাড়ির সামনে বজরা তলিয়ে যাবে। কিছু একটা করতে হয়।

বিপদের আশঙ্কায় মুকুন্দর বয়স যেন কমে গেল. সে বলে উঠল, আমরা ডিঙিখানার উপরে উঠে কাছি নিয়ে এগিয়ে যাই।

দর্পনারায়ণের খান দুই নৌকো ছিল, একখানা ডিঙি আর একখানা পানসি। সে বলে, ডিঙিতে কি হবে, পানসিখানা নিয়ে যাও।

তার মানে বজরার সঙ্গে পানসিখানাও ডুবুক। না দাদাবাবু, এ বজরা রক্ষা পানসির কর্ম নয়, ও তোমার সৌখীন হাওয়া খাওয়ার জন্যে থাকুক।

কিন্তু একখানা ডিঙি নৌকোতেই বা কি করবে।

ডিঙি নৌকো করে এগিয়ে গিয়ে বজরার সঙ্গে কাছি বেঁধে টেনে তীরে আনতে হবে।

আমরা তিনজনে কি পারব? আর কাছিই বা কোথায়?

মস্ত দুটো কাছি আছে। কর্তাবাবু কিনে রেখেছিল। তখন তুমি ছোট। একবার একখানা বজরা এই রকম আশ্বিনের ঝড়ে পড়ে তলিয়ে গিয়েছিল, কাছির অভাবে রক্ষা করা যায়নি। সেই দুঃখে কর্তাবাবু গুরুদাসপুরের হাট থেকে মস্ত দুটো কাছি কিনে এনেছিল, সেগুলো অমনি পড়ে রয়েছে।

চলো তবে যাওয়া যাক।

মোহন ও মুকুন্দ একসঙ্গে বলে, তুমি কোথায় যাবে? না না, তা হবে না।

বেশ তা নাই হল, কিন্তু তোমরা দুজনে কি করতে পারবে?

আমরা দুজন কেন, নজির আর গফুর আছে।

তারা আবার এল কোথা থেকে?

কালকে রাতে তারা হাট-ফিরতি এসে পড়ল। আমি বললাম এত রাতে আর নাই গেলে, চাট্টি ডালভাত খেয়ে এখানে শুয়ে থাকো। তাদের সঙ্গে নেব।

চলো তবে আর দেরি নয়।

তিনজনে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। নজির আর গফুর কাছি দুটো টেনে নিয়ে সঙ্গে এলো। এতক্ষণ মুকুন্দরা ঘরের মধ্য ছিল। ঝড়ের প্রচণ্ডতা বুঝতে পারেনি। এবারে আশ্বিনের পাগলা ঝড়ের কাণ্ড দেখে বলে উঠল, এ কি ভীষণ ঝড়! বাতাস যেন ছোবলাচ্ছে। মুহূর্ত-মধ্যে তাদের কাপড়চোপড় ভিজে গেল।

দাদাবাবু তুমি ভিতরে যাও। জামাকাপড় ভিজে যাবে।

সে-সব তো কখন ভিজে গিয়েছে, নতুন করে আবার ভিজবে কি। চল্ শীগগির চল্।

তারা কাছি টেনে নিয়ে এসে ডিঙিখানায় চড়ল।

বজরার ভিতরে যারা ছিল তাদের অবস্থা বাইরে থেকে জানবার উপায় নাই, তবে যেহেতু লেখক অন্তর্দর্শী পুরুষ মানুষের মনের ভিতরকার কথা পর্যন্ত জানে, নৌকোর ভিতরে কি ঘটছে জানা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। নৌকোর আরোহীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে কয়েকজন পাইক বরকন্দাজ চাকর ও পাচক ব্রাহ্মণ, আর এক ভাগে মাতা কন্যা বৃন্দাবনী নামে এক দাসী। আর একজন প্রবীণ ব্যক্তি বোধ করি জমিদারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তৃতীয় ভাগে মাঝিমাল্লা, হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে। মাতাই কর্ত্রী, তিনি বললেন, ভাদুড়ী-মশাই, একবার তেওয়ারীকে ডাকুন তো।

চহরজা সিং এসে উপস্থিত হলে কর্ত্রী বললেন, কি রে, নৌকো ডুবাবি নাকি?

চহরজা সিং বলল, কি করবো মাইজি। হলদার (এ অঞ্চলে হিন্দু মাঝিকে হলদার বলে) আমার কথা মানছে না।

কেন কি বলছে?

কি আর বলবে, বলে দারোয়ানজি, তুফানে মাস্তুল ভেঙে গেল। আমরা কি করব।

হলদার কে, গদাধর নাকি?

হাঁ জী।

ডাকো তাকে।

বৃদ্ধ গদাধর এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

কি গদাধর, বয়স কত হল?

গদাধরের শব্দহীন ঠোঁট নড়তে লাগল।

থাক অনেক হয়েছে, আর বয়সের হিসেব করতে হবে না। এ বজরা কতদিন চালাচ্ছ?

— এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অত্যন্ত অপ্রিয় উত্তর দিতে হয়, সে সাহস নাই।

তা এখন কি করবে। এতগুলো মানুষ এই অথৈ বিলের জলে ডোবাবে নাকি!

মাস্তুল ভাঙাতে তো ভয় করিনে।

তবে ভয় কিসের ?

হাল ভেঙে গেল মা-ঠাকরুন।

ও, হালখানাও ভেঙেছে! নৌকো ছাড়বার সময় হলে মাস্তুল সব দেখে নাওনি ?

সবই দেখেছিলাম, এমন সর্বনেশে আশ্বিন তুফান উঠবে ভাবিনি।

আশ্বিন মাসে আশ্বিনে ঝড় কি কখনও পাওনি ?

একবার পেয়েছিলাম।

কতদিন আগে ?

সঠিক উত্তর দিতে আবার ভীত হয়।

এবারে কর্ত্রী বোধ করি তার ভয়ের কারণ বুঝতে পারেন। বলেন, আচ্ছা যাক। কিন্তু দেখছি মাঝিমাল্লা সব আনাড়ি, দেখে নাওনি।

গদাধর বলে, সেই সব পুরনো দিনের লোক কি আর কেউ আছে!

কর্ত্রী মনে মনে বলে, থাকবার মধ্যে তুমি আছ, তবে ঝড়ে বজরা ডুবলে তোমাকেও আর থাকতে হবে না। তারপরে বললেন, আচ্ছা এখন যাও।

গদাধর প্রস্থানোদ্যত হলে কর্ত্রী বললেন, কাছেভিতে কোন গাঁ আছে কিনা— দেখতে কিছু পাও কি।

ঝড়ে-জলে চারদিক অন্ধকার, কিছু দেখবার জো নাই।

আচ্ছা তবে এবার গিয়ে নাম জপ করো।

সে প্রণাম করলে চহরজা সিং বলল, মাইজি হামি তো এতক্ষণ রামনাম জপছিলাম।

এতক্ষণ কর্ত্রীর সঙ্গীরা নীরব ছিল। এবার বৃন্দাবনী বলে দাসী কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠল, বলল, ভেবেছিলাম বৃন্দাবনে গিয়ে যমুনার কালো জলে ডুব দেব। এখন দেখছি বিলের জলে ডুবে মরতে হবে।

তার কথা শুনে কর্ত্রীর মেয়ে বলে উঠল, বৃন্দাবনী মাসী, তোমার যমুনার জলও কালো আর এই বিলের জলও কালো। ক্ষতি কি। সেখানে ডুব দিতে, আর এখানে ডুবে যাবে।

থাম্ তো চন্দনী, এখন তোর রঙ্গ-রসিকতা ভালো লাগে না।

চন্দনীর কথায় কর্ত্রী হেসে উঠলেন, সেই হাসিতে সাহস পেয়ে সঙ্গের কর্মচারীটিও হেসে উঠল। এতক্ষণ বজরার মধ্যে যে গুমোট চলছিল চন্দনীর কথায় তাতে হাসির ফাটল ধরল।

তা চন্দনী দিদি মন্দ কি বলেছে।

থামো তো নায়েব মশাই। আমি ডুবলে তোমরাও বাঁচবে না।

চন্দনী বলল, আমি ডুবসাঁতারে গিয়ে ডাঙায় উঠব।

আবার সকলে হেসে উঠল। এক বৃন্দাবনী ছাড়া।

দাসীটির পিতৃদত্ত নাম একটা কিছু ছিল কিন্তু অনেকদিন হল তা বৃন্দাবনী উপনামের তলে চাপা পড়ে যাওয়ায় সকলে ভুলে গিয়েছিল, এখন সবাই তাকে বৃন্দাবনী বলে ডাকে।

এই নামটির একটি ইতিহাস আছে। প্রায় দশ-বারো বছর আগে এই মাঝ-বয়সী বিধবা মেয়েটি একদিন সকালবেলায় জমিদারবাড়িতে এসে বলল, দাও না দাও বাবু, বৃন্দাবন পৌঁছে দাও—

তার হাতে খঞ্জনী, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, গলায় তুলসীর মালা। দরোয়ান চাকররা তার বুলি শুনে ভারি মজা পেল, একজন দাসীকে বলল ওকে কর্ত্রীর কাছে ভিতরে নিয়ে যাও। আমাদের সাধ্য কি ওকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাই।

কর্ত্রী তার বুলি শুনে, চেহারা দেখে শুধালেন, তোমার ঘর কোথায়?

সে বলল, শ্রীবৃন্দাবন।

যাবে কোথায়?

শ্রীবৃন্দাবন।

এই কি বৃন্দাবনের পথ?

মা সব পথই সেখানে গিয়েছে।

তা আমার কাছে থাকো না কেন, তোমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাব একদিন।

এই আশ্বাসবাক্যে সে খুশী হয়ে পুনরায় বলে উঠল, "দাও না দাও বাবু, বৃন্দাবন পৌঁছে দাও—।"

সেই থেকে সে জমিদারবাড়িতে আছে। বড়লোকের বাড়িতে কর্ত্রী ও দাসীর মাঝামাঝি যে একটা অনির্দিষ্ট অন্তরীক্ষ আছে বৃন্দাবনী এখন তার অধিবাসী। সে আজ দশ বছরের কথা, তখন চন্দনীর বয়স তিন বছর। তখন থেকে সে চন্দনীর মাসী। বাড়ির লোকেদেরও সে মাসী। তারা শুধায়, মাসী তোমার বৃন্দাবন যাওয়ার কি হল?

এই তো চলেছি বাবা।

চললে আর কোথায়? এই গাঁয়েই তো দশ বছর কেটে গেল।

দশ বছর কেন, হয়ত এই জীবনটাই যাবে।

যেমন ভাব দেখছি এইখানেই তোমার শ্রীধামপ্রাপ্তি ঘটবে। তারপরে গুন গুন রবে নিজমনে গান করে। "না পোড়াইও রাধা অঙ্গ, না ভাসাইয়ো জলে, মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালেরি ডালে।"

শ্রোতাদের একজন বলে, এখানে তমাল গাছ কোথায়।

আর একজন বলে, তমাল গাছ না থাক তাল গাছ আছে, মাঝের ঐ 'ম' অক্ষরটা বাদ দিলেই হল।

তার প্রধান কাজ, একমাত্র কাজ বললে অন্যায় হয় না, সন্ধ্যাবেলায় কর্ত্রীকে কৃষ্ণ বিষয়ক গান শোনানো, "তমাল কালো কাজল কালো, আমি কালো ভালোবাসি, জীবনে মরণে আমি কালো পায়েব দাসী।" এই গানটা জমিদার বাড়ির সকলের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

মাসী এবারে দাসী হওয়ার জন্যে তৈরি হও, বজরা ডুবতে শুরু করেছে।

তোর কি প্রাণে ভয়ডর নাই চন্দনী, বলে বৃন্দাবনী।

একা মনেই ভয়। সবাই একসঙ্গে তলিয়ে গেলে ভয়টা কিসের।

এমন সময় বিনা এত্তালায় চহরজা সিং ঢুকে পড়ে বলে, মাইজী, রামজী বহুৎ দয়া করিয়েছেন।

রাখ, তোর রামজী, এ আমার বৃন্দাবনের দুষ্টু ছেলেটার দয়া।

কর্ত্রী বললেন, রামজী আর বৃন্দাবনের দুষ্টু ছেলে দুজনেই মাথায় থাকুন, কি হয়েছে আগে বল্।

কিন্তু সে মুখ খুলবার আগেই এসে ঢুকল গদাধর, বলল, কর্তামা, বজরা রক্ষা পেয়ে গেল। গাঁ থেকে দু'খানা ডিঙি নৌকোয় পাঁচ-সাতজন লোক এসে কাছি দিয়ে বজরার গলুই-এর সঙ্গে বেঁধেছে! এবারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তীরের দিকে।

নায়েব এতক্ষণ বোধ করি ইষ্টনাম জপছিল, বলল, চোরডাকাত নয় তো?

চোরডাকু হোবে তো আমি আছি কিসকো ওয়াস্তে।

কর্তা-মা চোরডাকাত নিশ্চয় নয়, নইলে চহরজা সিং-এর এত সাহস হত না।

গদাধরের কথা সত্য প্রমাণিত করে বাইরে থেকে কণ্ঠস্বরে ঘোষণা শোনা গেল, বজরার চড়নদাররা ভয় পাবেন না। আমরা চোরডাকাত নই, এই গাঁয়ের লোক। বজরা টেনে নিয়ে চলেছি, এখনি তীরে গিয়ে ভিড়বে।

উভয় পক্ষ থেকেই চোরডাকাতের প্রসঙ্গ উঠল, তার কারণ তখন চোর-ডাকাতের আমল।

মাসী, এবার তোমার সত্যই অযাত্রা। যমুনার কালো জল বিলের কালো জল

কোথাও ডুব দেওয়া হল না।

তখন কর্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বেশবাস সুবিন্যস্ত করে নিলেন, চন্দনীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন সব ঠিক আছে। তারপরে ইশারায় নায়েবকে কাছে ডেকে কিছু আদেশ দিলেন, বললেন, মনে থাকে যেন, আর মাঝিমাল্লা চহরজা সিংদের সাবধান করে দেবেন।

ওদের জন্য ভাবি না কর্তামা। গোল বাধবে এই বৃন্দাবনী দিদিকে নিয়ে

তাকে বুঝিয়ে দেবার ভার আমার উপরে।

আরোহীরা বুঝতে পারল কোন একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা হচ্ছে নৌকো খানা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে কর্ত্রী বলে উঠলেন, মস্ত বড় একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। নৌকো তীরে ভিড়ল। তখনও বাইরে সমানে চলছে প্রবল আশ্বিনের ঝড়।

২

কুঠির পিছন দিকে প্রাচীরঘেরা একটা বাগান ছিল। বাগানে লিচু, জামরুল, গোলাপজাম প্রভৃতি কয়েকটা গাছ ছিল। জামরুল, গোলাপজামের গাছ দর্প-নারায়ণ লাগিয়েছিল, লিচুগাছটা আগে থেকেই ছিল। গাছগুলোর গোড়ায় ইট দিয়ে বেদীর মতো বাঁধিয়ে নিয়েছিল দর্পনারায়ণ। সকালবেলায় দীপ্তি নারায়ণকে নিয়ে গিয়ে বসত। ফলের সময় নিজহাতে জামরুল, গোলাপজাম পেড়ে দীপ্তিকে দিত নিজেও খেত। বলত জানিস দীপ্তি, বাগানে আমাদের এই সব গাছ ছিল।

ছেলে শুধাত, এখানে তুলে আনলে কি করে?

বাপ হেসে বলত, ওরে বোকা ছেলে, বড় গাছ কি তুলে আনা যায়।

তবে?

তবে আর কি, এই রকম ফলের গাছ ছিল। তুই যখন বড় হবি, এ গাছ গুলো কাটিস নে।

অবোধ ছেলে। আবার শুধাত, কেন বাবা?

এই সব ফল খেতে গিয়ে বাড়ির বাগানের সেই সব ফলের কথা মনে পড়ে যায়। নে, এখন খা।

এই বলে দুজনে খেত।

ছেলের মুখে ফল মিষ্টি লাগত, বাপের মুখে আরও কিছু বেশি লাগত, তন্ময় হয়ে যেত সে।

বাপের মৃত্যুর পরে সকালবেলায় এখানে এসে বসা ছেলের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ফল খেতে খেতে অনুমান করতে চেষ্টা করত এই ফলগুলোয় বাবা বাড়ির কি স্বাদ পেত, যে বাড়িকে সে দেখেনি সেই বাড়ির স্বাদ গন্ধ কল্পনায় আকর্ষণ করে নিতে চেষ্টা করত।

ক'দিন ঝড়বাদলের জন্য এখানে আসা সম্ভব হয়নি, আজ সকালে উঠেই এখানে এসে বসেছিল। গাছের দিকে চেয়ে তার মনে পড়ল এখন ফলের সময় নয়, কতকটা আশাভঙ্গের ভাব হল তার মনে। ফল কেন সব সময় ফলে না, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এ তার বাল্যকালের কথা, এখন বড় হয়ে বুঝেছে ফল বারো মাস ফললে এমন মিষ্টি হত না।

এমন সময় সে লক্ষ্য করল বজরার যাত্রীদের বুড়ো নায়েব আসছে, সে এগিয়ে যেতেই নায়েব নমস্কার করল। বলল, এত সকালবেলায় উঠেছেন!

আমার তো সকালবেলাতেই ওঠা অভ্যাস। আপনিও দেখছি সকালে ওঠেন।

কাজের খাতিরে উঠতে হয়।

এখানে আবার কি কাজ?

তা বটে, কদিন আরামে আছি, তবে কর্তামা বলে দিয়েছিলেন আজ সকালে উঠে আপনার সঙ্গে যেন একবার দেখা করি।

তবু ভাল যে কর্তামার নায়েবের সঙ্গে দেখা হল, তাঁর দর্শন তো একদিনও পাইনি। তবে দেখা না পেলেও নিত্য তাঁর প্রসাদ পাচ্ছি। পাচকের রান্নায় অরুচি ধরে গিয়েছিল।

হাঁ, আমাদের কর্তামায়ের মতো রাঁধতে কাউকেই দেখিনি।

বুঝতে পারছি কর্তামার কোন বিশেষ হুকুম নিয়ে এসেছেন। তা হুকুমটা কি?

নায়েব হাত কচলাতে কচলাতে বলল, তিনি বললেন, অনেকদিন তো হয়ে গেল, এবারে—

বাধা দিয়ে দীপ্তিনারায়ণ বলল, একের বেশি হলেই অনেক, বুঝেছি তাঁর প্রসাদ আর দেবেন না। চলুন কুঠির দিকে যাওয়া যাক। এই বলে তারা রওনা হল।

কুঠির মধ্যে এসে তারা দাঁড়াল একটা জানলার ধারে। দীপ্তি শুধাল, দেখছেন ?

আমি ক'দিন ধরেই দেখছি বাবুজি মস্ত বিল, আমাদের অঞ্চলেও বিলের একটা অংশ পড়েছে, তবে এত মস্ত নয়।

নায়েব মশাই, আপনি তো দেখছেন বিল, আমি দেখছি বিলের ভাবগতিক, সন্দেহ হচ্ছে ওর মতলবটা মোটেই ভালো নয়।

আমি তো বুঝতে পারছি না কিছু।

পারবেন না জানি, বিলের ধাত আমার জানা। এ কয়দিন যে কাণ্ডটা করেছে এখনো তার রেশ যায়নি, আবার যে কোন মুহূর্তে উত্তাল হয়ে উঠতে পারে।

আপনার কথাই হয়তো ঠিক, আপনারা হলেন বিলের ধারের লোক।

তা যদি মনে করেন তবে আমার পরামর্শ শুনুন, এখন যাত্রার আয়োজন স্থগিত রাখুন। তাছাড়া ছুতোর মিস্ত্রিরা বজরার ভাঙা হাল মাস্তুল কতদূর কি মেরামত করল খবর নেওয়া দরকার।

আমি খবর নিয়েছি, শ্রীকান্ত বলল, আজকার মধ্যেই একরকম দাঁড় করিয়ে দেবো।

শ্রীকান্তকে আমি বিলক্ষণ জানি। ওর মতো গাঁজাখোর এ অঞ্চলে নেই, অনেকবার ওর কথায় বিশ্বাস করে ঠকেছি।

তাহলে কর্তামাকে গিয়ে কি বলব ?

বলবেন যে এখনো কিছুদিন তাঁর প্রসাদ পাওয়া আমাদের ভাগ্যে আছে, তারপর সময় হলে আমি নিজে সঙ্গে গিয়ে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।

এই ভয়টিই নায়েব করছিল।

কর্ত্রী যখন দেখল যে বজরা বানচাল হতে হতে রক্ষা পেল, তখন বিশেষ করে সকলকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন তাঁদের পরিচয় না প্রকাশ করে। কেন নিষেধ করেছিলেন তিনিই জানেন, হয়তো বিপন্ন অবস্থায় প্রকৃত পরিচয় দিলে গৌরবের হানি হতে পারে এই ধারণা তাঁর হয়েছিল। তিনি বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন উদ্ধারকর্তারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে না, কারণ পরিচয় জানলেই পরিচয় জানাবার দায়িত্ব এসে পড়ে। তাঁর নিষেধ শুনে নায়েব বলেছিল, আমার তো মনে থাকবে, ভয় আপনার ঐ বৃন্দাবনী মাসীকে নিয়ে। তার কথা শুনে চন্দনা বলে উঠেছিল, বৃন্দাবনী প্রকাশ করলে এই বিলের কালো জলেই তাকে

যমুনা পাইয়ে দেব, কষ্ট করে বৃন্দাবনে আর যেতে হবে না।

নায়েব উপরে যেতে উদ্যত হলে, (দীপ্তি কুঠির দোতলাটা আগন্তুকদের ছেড়ে দিয়ে নীচের তলায় এসে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিল) দীপ্তি বলল, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। বললেন আপনারা তীর্থযাত্রা করেছেন, আবার এরই মধ্যে ফিরবেন!

নায়েব কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, ব্রজেশ্বর দয়া না করলে তো আর বৃন্দাবনে পৌছানো যায় না।

বিস্মিত হয়ে দীপ্তিনারায়ণ বলে উঠল, সে কি! আপনারা নদীপথে চলেছিলেন বৃন্দাবনে, সে তো প্রায় চার-পাচ মাসের পথ।

আগে তাই ছিল বাবুজি, ইদানীং রেলপথে যাওয়া যায়।

অধিকতর বিস্মিত হয়ে দীপ্তি বলল, রেলপথে! কি রকম বলুন তো শুনি?

নায়েব আরম্ভ করল, কলকাতা থেকে বৃন্দাবন অঞ্চলে রেলগাড়ি অনেকদিন হল চলাচল করছে। কর্তামার ইচ্ছা ছিল বজরা করে কলকাতায় পৌছে রেলে বৃন্দাবন যাত্রা করবেন! এর মধ্যে পাবনা শহর থেকে খবর পাওয়া গেল দু-তিন মাসের মধ্যে কলকাতা থেকে দামুকদিয়া পর্যন্ত ছোট লাইনের রেল চলবে। তাই শুনে কর্তামা বললেন, ভাদুড়া তবে তাই চল। তার পরে ঐ ভাদুড়া সম্বোধনের ব্যাখ্যা করে বললেন, আমার নাম হরিহর ভাদুড়া। তিনি হরিহর আর বলতেন না, ওটা তাঁর শ্বশুরের নাম।

দীপ্তি বাধা দিয়ে বলল, দামুকদিয়া কোথায়?

পাবনা থেকে পদ্মা বরাবর এগিয়ে গেলেই দামুকদিয়া, অল্প পথ।

তারপরে কি হল বলুন?

যথাসময়ে দামুকদিয়ায় পৌছে রান্নাবান্না করে খেয়েদেয়ে টিকিট কিনতে যাব এমন সময় গাঁ থেকে ছিপ পৌছায়, দেওয়ানজীর লিখন এসে উপস্থিত, তিনি জানিয়েছেন যে আমাদের একটা নূতন পরগণায় প্রজা বিদ্রু হয়েছে, শীগগির ফিরে আসুন।

দীপ্তি বুঝতে না পেরে বলল, বিদ্রু আবার কি, কখনও তো শুনিনি।

হরিহর ভাদুড়ী হেসে বলল, শুনবেন কি করে, শব্দটা বিদ্রোহ, কর্তামার মুখে দাঁড়িয়েছে 'বিদ্রু'।

তা প্রজাবিদ্রোহ হতে গেল কেন?

মজ্জমান বজরার আরোহীরা কুঠিবাড়িতে এসে উঠলে পরে দীপ্তিনারায়ণ সাদরে তাদের কুঠির দোতলাটা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নীচতলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। কর্ত্রী বলেছিল, বাবা এতে তোমার অসুবিধা হবে জানি।

দীপ্তি বলেছিল, মোটেই না, দোতলাটা মেরামত করে, বাসযোগ্য করে নেওয়ার আগে অনেকদিন আমরা কাটিয়েছি নীচে।

কিন্তু—

কিন্তু না কর্তামা, আপনাদের বাড়িতে বিপন্ন অবস্থায় উঠলে আপনি কি ভালো ঘরটা আমাদের ছেড়ে দিতেন না। তাছাড়া উপরে থাকতাম আমি একা, আর সবাই নীচতলার অধিবাসী, মোহন, মুকুন্দ আর জঞ্জালি নামে আমাদের ঝি।

চন্দনী হেসে উঠে বলেছিল, জঞ্জালি আবার কারো নাম হয় নাকি! এমন অদ্ভুত নাম কেন?

কদিন থাকলেই বুঝতে পারবেন। জঞ্জাল জমা করতে জঞ্জাল বাধাতে ওর জুড়ি নাই।

ভারি মজার নাম তো। মা ওকে নিয়ে চল না।

কি যে বলিস চন্দনী, উনি দয়া করে আশ্রয় দিলেন আর ওঁর কাজের লোকটি নিয়ে যেতে চাস। তোদের বাড়িতেও ওরকম ঝি আছে তবে নামটা অত স্পষ্ট নয়।

কথাপ্রসঙ্গে দীপ্তি জানতে পেল মেয়েটির নাম চন্দনী, বয়স অনুমান করল বারো-তেরো হবে। সেকালের বারো-তেরো মেয়েরা এখনকার ঐ বয়সের মেয়ের চেয়ে অনেক পরিণত হত। পুরাণের নায়িকারা অনেকেই ঐ বয়সের। স্বয়ং রাম যদি বিয়ের সময়ে "ঊনষোড়শ" অর্থাৎ পনেরো হন তবে সীতাদেবীর বারো তেরো হতে বাধা কি। সেকালে মেয়েরা চোদ্দ-পনেরোয় মাতৃত্ব লাভ করত কাজেই তার অনেক আগেই তাদের পরিণত হতে হত। একালে বয়সের সীমা বেড়েছে কাজেই ধীরেসুস্থে পরিণত হলেও চলে। সত্য কথা বলতে কি, দীপ্তি-নারায়ণের চোখে চন্দনীকে নিতান্ত খুকি বলে মনে হল, তাই অনায়াসে বলল, খুকি চাও তো ওকে তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।

ঐ খুকি সম্বোধন দীপ্তিনারায়ণের কাল হল। সে অর্ধোক্তভাবে বলল, মা ঐ ভদ্রলোককে আমার সঙ্গে কথা বলতে বারণ করে দিয়ো। এই বলে পুরাকালের নায়িকাদের যোগ্য একটি চাহনি নিক্ষেপ করে ঝড়ের ছিপ নৌকোর গতিতে প্রস্থান করল।

এদিকে দীপ্তি অপ্রস্তুতের একশেষ। বলল, কর্তামা, আমি তো অভদ্রতা করিনি, ঐ বয়সের মেয়েদের তো আমরা সবাই খুকি বলে থাকি।

না বাছা, কিছু মনে করো না। ওর ঐ রকম ভাব, আমাদের বাড়িতেও সবাই ওকে খুকি বলে ডাকে।

সেই থেকে চন্দনীর সঙ্গে দীপ্তির দেখা হয়নি। সে ভাবত খামোকা মেয়েটার মনে কষ্ট দিলাম। সে শুনেছিল বুড়োকে বুড়ো বলতে নেই, আজ দায়ে ঠেকে শিখলো খুকিকেও খুকি বলা নিরাপদ নয়।

আজ দোতলায় খাওয়ার ডাক পড়লে ভেবেছিল চন্দনীর সঙ্গে দেখা হবে, তখন ব্যাপারটা বলে কয়ে মিটিয়ে নেবে। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। আহারের সময়ে চন্দনী অনুপস্থিত। খাওয়ার সময়ে সে যখন মনে মনে অনুশোচনা করছিল, এত কাণ্ডকারখানার মূলস্বরূপ নারীটি দুজন ব্যক্তিকে আয়নায় প্রতিফলিত করে কৌতুক অনুভব করছিল, ভাবছিল ঐ ছোকরা হেন বয়সের লোকটা আবার আমাকে বলে খুকি! আস্পর্দা দেখ!

চন্দনী যদি মনস্তত্ত্ব-বিশারদ হত তবে বুঝতে পারত ঐ খুকি সম্বোধনের দ্বারা তার আসল নারীত্বকে একপ্রকার অস্বীকার করা হয়েছে। ছায়া পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করবার চেষ্টা করছিল দীপ্তিনারায়ণের মনের ভাব, আর ভাবছিল কি মজা, আমি যাকে দেখছি, আমাকে দেখতে পাচ্ছে না সে। এমন সময়ে জানলা দিয়ে একঝলক রোদ এসে পড়ল আয়নাখানার উপরে আর তার চাকচিক্যে চকিত হয়ে উঠল দীপ্তিনারায়ণ আর স্বভাবতঃই চোখ গেল ঐ আয়নার দিকে।

এ কি কাণ্ড! আয়নাতে সলজ্জ তার ছায়া আর সেই ছায়াতে দত্তদৃষ্টি চন্দনী। ভাবল তবে তো খুকি নিতান্ত খুকি নয়। ভাবল দাঁড়াও, আমিও মজা দেখাতে জানি না! বলল, কর্তামা দরজাটা ভেজিয়ে দিতে বলুন, আয়নার আলো এসে পড়ছে চোখে।

ওরে কে আছিস রে দেখ্ তো, বলে উঠতেই আয়নায় জিভ দেখিয়ে অন্তর্হিত হল ছায়া-পর্যবেক্ষণকারিণী।

থাক আর দরকার নাই, রোদটা সরে গিয়েছে।

উদ্যত ভৃত্যকে কর্ত্রী বললেন, তবে থাক।

তারপর থেকে আয়নার মাধ্যমে ছায়াতে আর কায়াতে দৃষ্টিবিনিময় চলছিল, ভোজনে আর তেমন নিঃসপত্ন মনোযোগ দিতে পারছিল না দীপ্তিনারায়ণ।

কর্ত্রীর অনুযোগ, রান্না নিশ্চয় ভাল হয়নি বাবা, মন নেই তোমার খাওয়ায়।

তা কেন কর্তামা, ভালো জিনিস চারদিকে এত যে কোন্ দিকে মন দেব ভেবে পাচ্ছি নে।

এর সরল অর্থটাই গ্রহণ করলেন কর্ত্রী, বললেন, এত ভাল জিনিস কোথায় দেখলে বাবা। না, না, পায়েসটা ফেলতে পারবে না, ওটা সব খেতে হবে নইলে তোমার খুকি আবার রাগ করবে। ওটা রেঁধেছে সে।

ও, তাহলে রাঁধতেও শিখেছে। তবে তো খুকি কেবল খুকিই নয়।

সেটা ক্রমে ঠেকে বুঝবে বাবা।

চকিতে একবার আয়নার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল ছোট্ট একটি উদ্যত মুষ্টির কিল।

দীপ্তিনারায়ণ খেয়ে উঠেছে এমন সময়ে বৃন্দাবনী এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে প্রণাম করল, বলল, প্রাতঃপ্রণাম হই দাদাবাবু।

আগেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

এতক্ষণে তোমার প্রাতঃকাল হল মাসি। এখন যে বেলা বারোটা বাজে।

দীপ্তিনারায়ণ জানতো তাকে সবাই মাসি বলে ডাকে।

কর্ত্রী বললেন, এতক্ষণে ওর প্রাতঃভ্রমণ সারা হল, তাই ওর কাছে প্রাতঃকাল।

দীপ্তিনারায়ণ হাসতে হাসতে নীচে নেমে গেল।

বৃন্দাবনী প্রাতঃভ্রমণের বিবরণ দিতে শুরু করল। কর্তামা, এখানে যে এত দেখবার আছে কে জানত! তুমি তো দোতলায় বসে থাকলে, কিছু দেখলে না।

কর্ত্রী ও চন্দনী খেতে বসেছিল।

চন্দনী বলে উঠল, বলই না মাসি, কি সব আশ্চর্য জিনিস দেখলে?

তবে শোন— বলে শুরু করল, গাঁয়ের পশ্চিম দিকে দুই মস্ত দীঘি আছে। তোমাদের বাড়ির দীঘির চেয়ে বড় ছাড়া ছোট হবে না। আর তাদের নাম দুটোই বা কি সুন্দর! অতল, নিতল। কেমন জোড়া নাম।

তা দীঘি দুটো দেখাল কে?

রায় মশায়ের মেয়ে।

সে আগেই ডাকু রায়ের পরিচয় দিয়েছিল। নূতন করে আর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হল না।

কুসমি নামে তার এক মেয়ে আছে, ঐ একই মেয়ে।

কর্ত্রী বললেন, সেখানে যাতায়াত হল কতদিন থেকে ?

তা বলিনি বুঝি। একদিন ভোরবেলা তাঁর বাড়ির সুমুখ দিয়ে খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছি, এমন সময়ে ডাক দিলেন, ও কে যায়। ডাক শুনে গিয়ে প্রণাম করলাম।

চন্দনী টিপ্পনী কাটলো, বলো প্রাতঃপ্রণাম।

ওই হল, দাঁড়া, বাধা দিসনে, বলতে দে। দেখলাম শান্তমূর্তি এক সুপুরুষ বৃদ্ধ।

তোমাদের তো নূতন লোক বলে মনে হচ্ছে, কোথায় থাকো এখানে ?

হ্যাঁ বাবা, আমরা ভিন গাঁয়ের লোক। এখানে উঠেছি কুঠিবাড়িতে।

ও, সেদিন তোমাদেরই বজরা ডুবতে লেগেছিল, যাহোক খুব রক্ষা পেয়েছ।

হ্যাঁ কর্তা, সবাই মিলে বজরা টেনে নিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধলো তাতেই রক্ষা।

তা তোমরা আসছ কোথা থেকে ? গাঁয়ের নাম কি ?

শোনো মা, মাসি সব ফাঁস করে দিয়েছে।

কর্ত্রী বললেন, কি মাসি, বলেছ নাকি ?

বললাম বইকি।

শুনলে মা।

আগে শোনই কি বললাম, বললাম আমাদের বাড়ি শ্রীধাম বৃন্দাবন।

যাবে কোথায় ?

শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এসেছিলে কোথায় ?

শ্রীধাম বৃন্দাবন।

এই তো গোল বাধালে।

বললাম, বাবা তিনি যে গোলকনাথ, তাই গোল বাধে, আর গোল বাধান।

আমার কথা শুনে ডাক দিলেন, কুসমি, কুসমি একবার শুনে যা।

ডাক শুনে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল, যেমন সুন্দর তেমনি চোখে মুখে বুদ্ধি ঝরে পড়ছে। কিন্তু কি বলব, এই বয়সেই কপাল পুড়েছে !

কর্ত্রী শুধালেন, বয়স কত হবে ?

খুব বেশি হবে তো পনেরো-ষোলর বেশি নয়।

কুসমি, এই বুড়ীর তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে। এতক্ষণ তত্ত্বকথা শোনাচ্ছিল আমাকে।

শোনো বাছা, আমার এই মেয়েটি বড় দুঃখিনী, তুমি মাঝে মাঝে এসে ওকে গান শুনিয়ে যেয়ো।

আজ তবে উঠি বাবা।

মেয়েটি বলল, একটু বসো বুড়ীমা।

মেয়েটি ভিতরে গেলে তখন রায় মশায় শুধালেন, তোমার নাম কি বাছা ?

বললাম, আমার আবার নাম ! লোকে বৃন্দাবনী বলে ডাকে।

রায় মশায় বললেন, তুমি দেখছি বৃন্দাবনময়। বাড়ি বৃন্দাবন, যাবে বৃন্দাবন, আসছ বৃন্দাবন থেকে, আবার নামটিও বৃন্দাবন।

বাবা, তবু তো বৃন্দাবনের মালিক দয়া করেন না।

হাঁ, লোকটি খুব ফাঁকি দিতে পটু, তবে তোমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।

আশীর্বাদ করো বাবা তাই যেন হয়।

এমন সময় মেয়েটি ডালায় করে চাল এনে দিল, বেঁধে দিলেন আঁচলে। এই নাও সেই চাল।

চাল ঢেলে দিয়ে আবার শুরু করল, তখন মেয়েটি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সেই দীঘি দুটো দেখিয়ে নিয়ে এল, বলল, একদিন সকালের দিকে এসো, দুজনে মিলে স্নান করব। তারপর ফিরবার পথে বলল, বুড়ীমা, এখানে যখন এসেছ বেণী রায়ের ভিটে না দেখে যেয়ো না।

সে আবার কোথায় ?

এই গাঁয়ের লাগোয়া বটে, তবে ঠিক গাঁয়ের মধ্যে নয়। ওটা একটা পীঠস্থান, না দেখে যেয়ো না।

কে আমাকে দেখাবে মা ?

কুঠীবাড়ির বাবুকে বলো সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবেন। চাই কি নিজেও সঙ্গে যেতে পারেন। নিতান্ত নিজে না যান মোহনদাকে সঙ্গে দেবেন। সে খুব ভালো লোক।

তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ছেলেটি খুব ভালো। তুমিও কেন চলো না মা।

দেখি বাবা যদি নিষেধ না করেন তবে যেতে চেষ্টা করব।

যতক্ষণ বৃন্দাবনী এই কাহিনী বলছিল কর্ত্রী ও তার কন্যা আহার করছিল, আহার ও কাহিনী একসঙ্গে শেষ হল।

চন্দনী অনুনয়ের সুরে বলল, মা তুমি একবার দীপ্তিবাবুকে বলো, তুমি বললেই তিনি রাজি হবেন।

আমি বললেই রাজি হবেন, যা রাগিয়ে দিয়েছ তাঁকে !

এবার দেখো মা তাঁকে খুশি করে দেব।

আচ্ছা ভেবে দেখি—বলে তিনি গৃহান্তরে গেলেন।

চন্দনী গিয়ে উপস্থিত হল দীপ্তিনারায়ণের কাছে, নীচের তলায় সে কখনও যেত না, বাগানের মধ্যে তো নয়ই, তবে আজ গরজ, অবশ্য মায়ের অনুমতি নিয়েছিল।

দীপ্তি বিস্মিত হয়ে বলল, এখানে এলে ?

উত্তর পেল, আপনি তো এখানে এসেছেন জামরুলের আশায় না কি ?

ধরো তাই যদি হয়।

তবে কিছুকাল অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে, জামরুল তো ফলে বৈশাখ মাসে, এখন সবে আশ্বিন মাস।

দীপ্তি ভাবল মেয়েটি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। বলল, কালকে তোমাকে খুকি বলে ভুল করেছিলাম।

নিশ্চয়ই ভুল করেছিলেন তবু শুনি কেন এখন একথা মনে হল ?

মনে হল এই জন্যে যে খুকিরা তো এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে না।

তবে একটা কাজ করুন।

বল কি কাজ ?

আজ আমাদের সকলকে নিয়ে গিয়ে বেণী রায়ের ভিটেতে কালীস্থান দেখিয়ে আনুন।

বেণী রায়ের ভিটের কথা জানলে কি করে ?

বৃন্দাবনী মাসি শুনে এসেছে ডাকু রায়ের মেয়ে কুসমির কাছে থেকে।

তবে তো সব কথাই শুনেছ। কিন্তু কর্তামার হুকুম না পেলে তো যেতে পারি না।

চন্দনী বলল, এবারে আপনি খোকার মতো কথা বললেন।

কেন ?

কেন আর কি, মায়ের হুকুম ছাড়া মেয়ে এসে কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারে !

কর্তামার হুকুম! তবে অবশ্যই তামিল করব। যাও তাঁকে গিয়ে বল কালকে সকালবেলা তোমাদের সকলকে নিয়ে সেখানে যাব।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, যাবেন কি করে ? চারদিকে তো জল।

ধরো যদি সাঁতরেই যেতে হয়।

না বাপু, তা পারব না।

এই তো ভয় পেয়ে গেলে।

ভয় পাব কেন, তবে কি জানেন পুজোর জন্যে ফুল ফল সন্দেশ নিয়ে যেতে হবে তো। আচ্ছা আমাদের বজরাখানায় করে গেলে হয় না ?

না, বজরা সেখানকার কম জলে পৌঁছবে না।

তবে ?

তবে আর কি, হয় সাঁতরে নয় আমার নৌকোয়।

আপনার নৌকো আছে নাকি ?

বিলের মধ্যে বাস করি, নৌকো না থাকলে চলবে কেন। যাও, কর্তামাকে বল গিয়ে কাল সকালে তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব।

আচ্ছা তাই বলি গিয়ে।

সে পিছতে উদ্যত হলে দীপ্তি বলল, তবে সেই পীঠস্থান সম্বন্ধে একটা কথা জেনে রাখো, সেখানে গিয়ে কোন শপথ, প্রতিজ্ঞা বা মানত করলে তা পূরণ করতেই হবে, এমন কি মনে মনে সঙ্কল্প করলেও পূরণ করতে হয়, নতুবা ঘোরতর অমঙ্গল হয়।

এসব আপনি জানলেন কি করে ?

এখানকার সবাই জানে। তাছাড়া আমিও যে কিছু সঙ্কল্প করেছি।

কি সঙ্কল্প ?

দীপ্তিনারায়ণ হেসে উঠে বলল, এবারে আবার খুকির মতো কথা বললে।

কেন ?

পরের গোপন সঙ্কল্প জানতে নেই।

বেশ আমি যদি কোন সঙ্কল্প করি তবে আপনি যেন জানতে চাইবেন না।

নিশ্চয়ই নয়, তবে সঙ্কল্প না করাই ভালো, ও বড় জাগ্রত দেবী।

দীপ্তিনারায়ণের সতর্কবাণীতে ভীত হল চন্দনী। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে প্রস্থান করল।

৩

নৌকো চলেছে। নৌকোখানা বজরার চেয়ে ছোট। তবে খুব মজবুত আর বিচিত্র তার সাজসজ্জা, মনে হয় কেউ শখ করে তৈরি করিয়েছিল। সত্যি তাই। দর্পনারায়ণের শখের পাখী, নাম দিয়েছিল মাছরাঙা। লেখা ছিল নৌকোর গায়ে। দেখেই হেসে উঠেছিল চন্দনী—ওমা এ যে জেলেডিঙি!

দীপ্তিনারায়ণের মুখ বিষণ্ণ হল দেখে কর্ত্রী বলে উঠলেন, এ তোমার অন্যায় বাছা। এমন সুন্দর পান্সীখানাকে বলছ জেলেডিঙি।

আচ্ছা মা, তুমিই বল কি অন্যায়টা বলেছি। নৌকো তো সুন্দর অস্বীকার করিনি। মাছারাঙা পাখীটাও অসুন্দর নয়। তাই বলে মাছরাঙা পাখী কি মাছ ধরে না! এখন যে ডিঙির নাম মাছরাঙা তাকে জেলেডিঙি বললে কি এমন অন্যায় হয়।

চন্দনীর কথার গাঁথুনি দেখে দীপ্তি বলে উঠল, কর্তামা, তোমার মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে ইংরেজি শিখিয়ে উকীল করো।

শুনলি তো চন্দনী!

ওদের মধ্যে যখন এইরকম কথা হচ্ছিল, মোহনের কাছে চুপি চুপি গিয়ে বসেছিল কুসমি, মোহন ধরেছিল হাল। শ্রোতা নাই প্রশ্নকর্তা নাই এমন অসহায় অবস্থায় বৃন্দাবনী কখনও পড়েনি। তাই সে খঞ্জনী ঠুকে আপন মনে গান ধরেছিল—

পূর্ণিমা রজনী চাঁদ গগনে উদয়
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ হৃদয়।
চাঁদ দে মা বলে শিশু কাঁদে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয়।

এদিকে কোণঠাসা হতেই চন্দনী ভাবছে এবারে কি করবে এমন সময়ে তার কানে গেল বৃন্দাবনীর গানের পদ। সে বলে উঠল, ও মাসি, যাচ্ছ কালীর থানে আর গাইছ গৌরাঙ্গ পদাবলী, দেখো কালী তোমার কি করেন! ও বড় জাগ্রত দেবী। কি বলেন দীপ্তিবাবু?

আমি আর কি বলব, যা বলার তুমিই তো সব বললে।

বৃন্দাবনী ধমকের সুরে বলে উঠল, চন্দনী তুই থাম্ তো। তত্ত্বজ্ঞান হলে বুঝতে পারবি যে শ্যাম সেই শ্যামা। এই বলে গুনগুন স্বরে শুরু করল :

আমার যেমন শ্যামা তেমনি যে শ্যাম
কালীঘাট আর গোকুল শ্রীধাম
এক হয়ে যায় গড়াগড়ি
শ্যাম শ্যামার নাম আমি এক মুখেতে করি।

কর্ত্রী ডাক দিয়ে বললেন চন্দনা তুই না শুনিস আমাকে শুনতে দে। এসব কথা শুনলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

অগত্যা চন্দনী কর্ত্রীর কাছে এসে বসল, এতক্ষণ ছিল দীপ্তিনারায়ণের কাছে। দীপ্তিনারায়ণ তখন পান্সার ছাদে গিয়ে বসল। সে জায়গাটা বেশ নিরিবিলি—একটু নিরিবিলিতে তার প্রয়োজন ছিল।

অনেক দিন পরে, কালকে রাতে নবীননারায়ণকে স্বপ্নে দেখেছিল সে। ভোরবেলায় জেগে মনটা উদাস ছিল। এখন একটু নিরিবিলি পেয়ে সেই উদাসীনতা আবার ফিরে এলো।

কালকে রাতে পিতাকে স্বপ্নে দেখেছিল সে, আগেও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেছে, তবে এবারের স্বপ্ন যেমন প্রত্যক্ষবৎ তেমনি সজীব। রাতের স্বপ্ন ভোরের আলোয় ফিকে হয়ে ক্রমে মিলিয়ে যায়। আগের দেখা স্বপ্নগুলো অল্পক্ষণের মধ্যেই মন থেকে মুছে গিয়েছে, গতরাতের স্বপ্নটা এখনও জীবন্ত। এখনও সে দেখতে পাচ্ছে তর্জনী তুলে তিনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তার সেই টানা টানা চোখ, হীরের টুকরোর মতো উজ্জ্বল কিন্তু এখন উজ্জ্বলতার সঙ্গে মিশেছে একটা সূক্ষ্ম বিষাদের ভাব তখন ঠাহর হল তারা দাঁড়িয়ে আছে বেণী রায়ের কালীবাড়ির ঢিবিটার কাছে। না তাতে আর ভুল নাই। কিন্তু হঠাৎ এখানে কেন? তখনি মনে পড়ল যে জোড়াদীঘি থেকে ফিরবার পথে পিতা তাকে নিয়ে এসেছিলেন এই পীঠস্থানে। বলেছিলেন পথে পীঠস্থান পড়েছে, এখানকার কালী বড় জাগ্রত, এখানে পূজা দিলে বা কোন সঙ্কল্প করলে কখনও মা কালী ভক্তকে বিফল করেন না। তখন একে একে মনে পড়তে লাগল গোপনে তাদের জোড়াদীঘিতে যাত্রা, সেখানে পৌঁছে পুত্রকে জানাল যে এতকালের লোকশ্রুত জোড়াদীঘির চৌধুরী বংশে তার জন্ম একথা সে যেন কখনও না ভোলে। আরও জানাল তাদের বিষয়সম্পত্তি নাশের কারণ।

জোড়াদীঘি ত্যাগ করে ধুলোউড়ির কুঠিতে অজ্ঞাতবাসের কারণ এ সমস্তর মূলে প্রতিবেশী জমিদার রক্তদহ।

বাবা, এমন কেন হল ?

সে অনেক কথা, পরে একসময়ে বলব। (সে সময় আর হয়ে ওঠেনি, তার আগেই মৃত্যু হয়েছিল নবীননারায়ণের।) এখন এইটুকু জেনে রাখ, ওদের সঙ্গে মারামারি লাঠালাঠিতে, সে একটা ছোটখাটো লড়াই বললেই চলে, আমরা জিতেও হেরে গেলাম।

এ কেমন করে সম্ভব হল বাবা ?

ওরা নাটোর শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবর পাঠাল রক্তদহের জমিদারকে আমরা বেঁধে নিয়ে এসে কয়েদ করে রেখেছি। ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজ নিয়ে এসে আমাদের বাড়ি ঘেরাও করল।

তারপরে ?

তারপরে আমাদের বাড়ি তল্লাশ করল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সাহেব কয়েদখানায় ঢুকে দেখল জমিদার নাই।

তখন ?

তখন আর কি, আমাদের বড় বড় পরগণা সব বাজেয়াপ্ত করে নিল।

কিন্তু প্রমাণ তো হল না তোমাদের দোষ। কয়েদখানা তো শূন্য।

একটু ম্লান হেসে পিতা উত্তর দিল, বাবা, বয়স হলে দেখতে পাবি সংসার বড় বিচিত্র, এখানে দুটি মাত্র জাত—প্রবল আর দুর্বল। দুর্বলকে সাজা দিতে প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

কি করতে হবে আমাকে আদেশ করো।

এটা ছিল তোর মায়ের শয়নঘর, এই জীর্ণ পালঙ্ক ছিল তার রাজশয্যা। এখানে প্রণাম করে শপথ কর্, যদি তোর ক্ষমতা হয় তবে রক্তদহের এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবি, আর যদি ক্ষমতা না হয় তবে মনে মনে অন্যায়ের প্রতিবাদ পোষণ করবি, কখনও কোন কারণে তাদের সহযোগিতা করবি নে, আর সক্ষমে হোক অক্ষমে কখনও তাদের ক্ষমা করবি নে, কখনও না কখনও না কখনও না।

পিতার কথা শুনে পালঙ্কের কাছে মাটির উপরে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে দীপ্তিনারায়ণ আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল, বাবা, তোমার আদেশ ভুলব না এবং মায়েরও।

পিতা সবলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন পুত্রকে।

কয়েক মুহূর্তের স্বপ্নের ফিতেয় এত ঘটনার স্থান হয় কি করে? ফিতে বলেই হয়, গুটোলে এতটুকু খুললে এতখানি।

পাল্সীর ছাদের উপরে বসে এইসব কথা তার মনে পড়ছিল। বিলের দিকে তাকিয়ে দেখল ক'দিন আগের দামাল বিল শান্ত হয়ে এসেছে, কেশরীর পৃষ্ঠে পদার্পণ করেছেন পার্বতী। জেলেরা জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছোট ছোট ডিঙিতে। মাছের লোভে পাখীরা ঢেউয়ের গা ঘেঁষে উড়ছে। এদিকে আগা গলুই-এ কর্ত্রীর কাছে বসে চন্দনী। আর হালের কাছে মোহন আর কুসমি ফিসফিস করে কথা বলছে আর একাকী বসে খঞ্জনী বাজিয়ে বৃন্দাবনী গুনগুন স্বরে গান ধরেছে।

"মাধব কৈছন বচন তুহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইলি
জীবন ভেল অতিভার॥"

এমন সময়ে মাল্লাদের একজন বলে উঠল, মায়ের খানে তো এসে পড়েছি, কোন্ ঘাটে লাগাব?

একেবারে বলির ঘাটে লাগা।

এই জায়গাটাতে একসময়ে বলিদান হত, তাই নাম বলির ঘাট। আজ বেণী রায়ের প্রতাপ, কালীর অমোঘ মাহাত্ম্য সমস্তই লোকের স্মৃতিগতমাত্র। দৃষ্টিগত-মাত্র উঁচু একটা ঢিপি, তার উপরে কোন ভক্ত কর্তৃক প্রোথিত রক্তচন্দনলিপ্ত একটা ত্রিশূল। ঐ ত্রিশূলটা দেখে সেদিনকার আর একটি স্মৃতি দীপ্তিনারায়ণের মনে পড়ল। জোড়াদীঘি থেকে ফিরবার পথে এখানে উপস্থিত পিতা-পুত্র দুজনেই ঘোড়া থেকে নামল, তখন শীতকাল, নৌকোর দরকার হত না। কালীর থানে এসে দুজনে প্রণাম করল। পিতা ত্রিশূল থেকে রক্তচন্দন নিয়ে পুত্রের কপালে লাগিয়ে দিল, বলল, কালকে জোড়াদীঘিতে যে শপথ করেছিলে এখানে তা আর একবার কর। না, জোরে বলবার দরকার নেই, মনে মনে বললেই দেবতারা শোনেন, তাঁরা অন্তর্যামী।

বলেছিস?

হাঁ বাবা, বলেছি।

মনে থাকে যেন। এখানকার শপথ ভঙ্গ করে কৈবর্তগাঁতির জমিদার সবংশে ধ্বংস হয়েছিল।

কি হয়েছিল বাবা?

ও, বলিনি বুঝি। আচ্ছা আর একদিন বলব।

বাবু এবারে যে নামতে হয়।

মাঝিরা নৌকো ভিড়িয়েছে।

সকলে একে একে নামল।

দীপ্তিনারায়ণ বলল, কর্তামা, ভাদুড়ী মশাই কেন এলেন না!

কি বলব বাবা তিনি ঘোরতর বৈষ্ণব, কালীর থানে আসবেন তিনি!

জানেন দীপ্তিবাবু, ভাদুড়ী মশাই কালী শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না। তিনি দোয়াতের কালিকে বলেন মসী। আর কালির দোয়াতকে বলে মস্যাধার।

তবে তো দেখছি ভাদুড়ী মশাই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কিন্তু চন্দনী তোমাদের বাড়িতে কালীপুজোর সময়ে ঢাকের বাজনা শুনলে কি করেন?

শুনবেন কি করে, কানে আচ্ছা করে তুলো গুঁজে দিয়ে রাখেন।

আর প্রসাদের বেলায়?

তিনি বলেন প্রসাদে দোষ নেই।

চন্দনীর কথা শুনে সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

চন্দনী খুব সাবধান, জাগ্রত কালীর থানে কোন শপথ করে বসো না যেন।

আপনিও সাবধান থাকবেন দীপ্তিবাবু।

কর্ত্রী বলে উঠলেন, ও কি রকম সহবৎ চন্দনী, তোর চেয়ে কত বড় তাকে নাম ধরে ডাকা হচ্ছে!

সে বলে উঠল, উনিও তো আমাকে নাম ধরে ডাকেন। আচ্ছা মা, এবার থেকে না হয় কুঠিয়ালবাবু বলে ডাকব।

কর্ত্রী হতাশ হয়ে বললেন, তোমরা বাপু দুজনেই ছেলেমানুষ।

এমন সময়ে মোহন ও কুসমি এসে উপস্থিত হয়। কুসমি বলে, কর্তামা, পুজো দেবেন না?

মোহন বলে, এখনি পুজো কি রে? দুপুরের আগে পুজো হয় না, তাই তো লোকে কালীমাকে বলে দুপুরে চণ্ডী।

চন্দনী বলে, দুপুরের এখনও দেরি আছে, কুঠিয়ালবাবুর সঙ্গে আমি জায়গাটা ঘুরে দেখে আসি। তুমি আপত্তি করো না মা।

তা যাও না কেন। তবে একটু সাবধানে থেকো—শুনতেই তো পাচ্ছ জায়গাটা ভালো নয়।

চলুন—বলে এগিয়ে গেল দীপ্তিনারায়ণের দিকে।

দীপ্তি নির্বিকারভাবে বলল, কুঠিয়ালবাবুর সঙ্গে যাও।

ও, কুঠিয়াল বলেছি বলে খুব রাগ হয়েছে! আচ্ছা মাপ চাইছি। আর এমন খারাপটাই বা কি বলেছি মা!

সে তোমরা আপোস করে নাও, আমাকে ততক্ষণ একটা পদ শোনাও বৃন্দাবনী।

শীগগির চলুন, মাসির পদ শুনলে আমার ঘুম পায়।

চন্দনার অনুনয়ে অগত্যা দীপ্তি রওনা হল।

কর্ত্রী বললেন, দেখো, জলেজঙ্গলে পড়ো না, পুজোর আগে ফিরে এসো।

মোহন ও কুসমি পুজোর আয়োজন করতে লাগল।

বৃন্দাবনী খঞ্জনী ঠুকে গান ধরল—

অাইস আইস বন্ধু বঁধু
আধ আঁচরে আসি বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে
মনের মানসে
সফল করিয়া আঁখি
বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে
যেখানে পরাণ
সেইখানে লইয়া থোব॥

দূরে এসে পড়া সত্ত্বেও গান শুনতে পাচ্ছিল ওরা। দীপ্তি বলল, তুমি বলছিলে বৃন্দাবনী মাসির গান শুনলে তোমার ঘুম পায়, আমার কিন্তু মনে হয় তাকে এখানে রাখি আর সারারাত জেগে তার গান শুনি।

আহা, আপনার এই প্রশংসা শুনলে মাসি এখানেই থেকে যাবে, আমাদের সঙ্গে আর ফিরে যাবে না।

মাসি কি তার বোনঝিটিকে ছেড়ে থাকতে রাজি হবে?

সাহস যদি থাকে তবে তাকেও না হয় রাখুন।

বলব নাকি কর্তামাকে?

এমন সময়ে চন্দনা বলে উঠল, ঐ দেখুন ঐ গাছটার উপরে কেমন সুন্দর একটা পাখী বসেছে।

তাই তো দেখছি, এমন পাখী তো আগে দেখিনি। দাঁড়াও, শব্দ করো না, উড়ে যাবে। চন্দনী, এ তো এদেশী পাখী নয়, এই ক'দিনের ঝড়ের বেগে কোথা থেকে উড়ে এসেছে।

অনেকটা আমাদের মতো, কি বলেন!

আহা, কথা বলো না, উড়ে যাবে।

গেলই বা, ক্ষতি কি! এদেশের পাখী তো নয়।

এদেশের নয় বলেই তো এত লোভ হচ্ছে। এখন বন্দুকটা থাকলে মেরে নামাতুম।

আচ্ছা পুরুষরা কি নিষ্ঠুর, এমন সুন্দর পাখীটাকে মারতে ইচ্ছা করে?

সুন্দর বলেই তো মারতে ইচ্ছা করে।

তবে তো আমাদের বড় বিপদ।

কেন বল তো?

সুন্দর কি শুধু ঐ পাখীটাই!

না, তোমাদের বজরাখানাও কম সুন্দর নয়। কিন্তু তাকে শিকার করতে হলে তো কামান চাই, বন্দুকে চলবে না।

যাক, তবু রক্ষা পেল বজরাখানা।

কিন্তু বজরার কোন কোন আরোহীর সম্বন্ধে বেশি নিশ্চিন্ত হয়ো না।

তখনও বৃন্দাবনীর গানের শেষ দুটো পদ শোনা যাচ্ছিল—

চণ্ডীদাস কয় শুন বিনোদিনী
পুরিল মনের আশ
শুভ দিন ভেল দুরদিন গেল
বন্ধুরা মিলিল পাশ॥

দীপ্তিনারায়ণ আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল, সুন্দর!

চন্দনী শুধাল, কি?

দীপ্তি বলল, গলাটা।

আর গানটা?

বাজে বাজে বাজে—নিতান্ত বাজে।

গান থামলে অনেকক্ষণ কর্ত্রী উদাসভাবে বসে রইলেন। বৃন্দাবনী বলল, কর্তামা একটা কথা বলব?

কর্ত্রী চমকে উঠে বললেন, কি কথা?

তুমি তো আজকাল চন্দনীর বিয়ের কথা মাঝে মাঝে বল।

বলিই তো মাসী, ওর বিয়ের বয়স কি হয়নি ?

মেয়েদের বিয়ের বয়স বলে কি কিছু আছে! যখনি বর জোটে তখনি বিয়ের বয়স।

কিন্তু ওর তো বর জুটে উঠছে না, খোঁজখবর তো করছি।

এবারে বোধ করি ব্রজেশ্বর ওর বর জুটিয়ে দিলেন, বললেন আগে চন্দনীর বিয়ে দাও তারপরে শ্রীধাম এসো, ঝড়ের মুখে এই সংবাদ পাঠালেন।

সংবাদ তো পাঠালেন কিন্তু বর তো পাঠালেন না।

তুমি কর্তামা দেখেও যদি না দেখ তবে আর ব্রজেশ্বর কি করতে পারেন!

তুমি তো দেখেছ, বলই না!

কেন, ঐ যে আমাদের কুঠিরবাবু আছে।

কর্ত্রী চমকে উঠলেন।

বৃন্দাবনী বলে চলল, বয়সে মিলবে আবার মনেও বোধ হয় মিলেছে।

বেশ বুঝতে পারা যায় ওদের ভাবগতিক এড়ায়নি বৃন্দাবনীর চোখ।

তোমার কথা সত্যি হোক মাসী, কিন্তু যার-তার হাতে তো চন্দনীকে দিতে পারি না।

তুমিই তো কতবার বলেছ কর্তামা, ছেলেটির শিক্ষাসহবৎ বড়বংশের মতো। তবে কেন এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকে!

এখনও সেই কথাই বলছি!

খোঁজখবর নাও কর্তামা।

অতঃপর এ প্রসঙ্গে আর উত্তর-প্রত্যুত্তর হল না। মনে মনে কিছু হল কিনা জানেন মনের মালিক।

দীপ্তি বলল, চল এবারে ফেরা যাক, পুজোর সময় হল।

চন্দনী বলল, এখনও দুপুর হয়নি।

তবে চল এখানে বসা যাক—এই বলে দীপ্তিনারায়ণ বসে পড়ল, কাজেই বসতে হল চন্দনীকে।

সম্মুখে বিলের অবাধ প্রসার। দিগন্ত বলতে কিছু নাই, কেবল মাঝে মাঝে জলীয় আগাছা, দুজনে চুপ করে তাকিয়ে থাকল বিলের দিকে।

দীপ্তির ইচ্ছা হল পরিচয় জিজ্ঞাসা করে চন্দনীকে, কিন্তু তখনি মনে পড়ল সে

যদি ফিরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে! ভাবল পরিচয় জেনে কি হবে? জলে ভেসে এসেছে আবার ভেসে চলে যাবে জলের স্রোতে। এই তো ভালো, এই তো যথেষ্ট। তখনি মনে হল পরিচয় ছাড়াও আরও অনেক জ্ঞাতব্য থাকতে পারে। জিজ্ঞাসা করল—চন্দনী, একটা সত্য কথা বলবে?

কথাটা না শুনলে বলতে পারি না।

তবে না হয় কথাটা শোন। এখান থেকে চলে গেলে আমাকে মনে থাকবে কি?

সেটা আপনার মন দিয়েই বুঝুন। যদি বলি থাকবে না!

ওটা তো আমার মনের কথা হল না।

আপনার মনের কথাটা কি শুনতে পাই কি?

যদি বলি থাকবে?

শুনে সুখী হলাম।

বাস্ ঐটুকু!

ও বুঝেছি। সুখী শব্দটা ছোট। তবে শুনুন, আনন্দিত হলাম। হয়েছে?

থাক, তোমার মনের কথা জেনে আমার কি হবে!

বাস্ এটা বুঝলেই তো সব বোঝা হয়ে যায়। উঠুন, পুজোর সময় হয়েছে।

তুমি পুজো দাও গে যাও, আমি অনেকবার পুজো দিয়েছি।

যাচ্ছি, তবে জেনে রাখুন আপনার নিষেধ অগ্রাহ্য করে শপথ করব।

কি শপথ?

কেন বলব? আপনি যে শপথ করেছেন তা তো বলেননি। নিন, আর কথা কাটাকাটি করে লাভ নাই, এবারে উঠুন। বলে সে উঠে পড়ল।

অগত্যা উঠতে হল দীপ্তিকে। দুজন নীরবে চলল, তারপরে আর কথা জমল না। কালীর থানে পৌছে তারা দেখল সকলে এসে উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

যথাবিহিত পূজা-অর্চনা সম্পন্ন হয়ে গেল। কুঠীর বাগান থেকে ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিল মোহন। সকলে ফিরে চলল নৌকোর দিকে। চন্দনী বলল, দীপ্তিবাবু, একটু ধীরে চলুন। সারাটা সকাল ঘুরে ঘুরে আমার পা ব্যথা করছে। কাজেই ওরা দুজনে দল থেকে পিছিয়ে পড়ল। এইরকম অকস্মাৎ পায়ের ব্যথা বোধ করি তপোবন-কন্যা শকুন্তলাও অনুভব করেছিল। দূরত্বের সুযোগে চন্দনী কথা বলতে শুরু করল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি

সঙ্কল্প করলেন ?

দীপ্তি বলল, নূতন কিছু নয়, পুরনোটাই আবার ঝালিয়ে নিলাম। তুমি ?

আমি কিছু সঙ্কল্প করিনি, তবে মা বোধ করি কিছু করেছেন।

কেমন করে জানলে ?

প্রণাম করে উঠবার সময়ে বললেন, মা আমার আশা পূর্ণ করো। আমি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, শুনলাম।

মায়ের সঙ্কল্পের জন্য ভাবি না, ভাবনা ছিল মেয়ের সঙ্কল্পের জন্য।

কেন ?

মা বুঝেসুঝেই করবেন।

আর মেয়ে ?

মেয়েরা চিরকালই অবুঝ হয়ে থাকে।

দীপ্তির চোখে পড়ল নির্মাল্যের বেলপাতায় রক্তচন্দন লেগে আছে—এ সেই ত্রিশূলের রক্তচন্দন। সে কি করছে বিচার না করে আঙুলের ডগায় চন্দন নিয়ে চন্দনীর কপালে একটি ফোঁটা এঁকে দিল।

হঠাৎ চন্দনী গম্ভীর হয়ে বলল, কি করলেন, শেষরক্ষা করতে পারবেন ?

এতক্ষণ সে হাসছিল।

দীপ্তিনারায়ণ অপ্রস্তুতের একশেষ। সে গম্ভীর হয়ে গেল। তার গাম্ভীর্যে জাগিয়ে দিল চন্দনীর হাসি, বুঝতে পারল না এই গাম্ভীর্য, এই হাসি, ব্যাপার কি! দীপ্তির গম্ভীর মুখ আরো বেশি করে হাসি হাসি-তরঙ্গিত করে তুলল চন্দনীর মুখে।

ওরা যখন নৌকোয় এসে চাপল বৃন্দাবনী বলে উঠল, দেখ দেখ কর্তামা, চন্দনীর কপালের ফোঁটাটি কেমন মানিয়েছে!

রেগে গিয়ে চন্দনী ফোঁটা মুছতে উদ্যত হলে কর্তামা বলে উঠলেন, ছি মা, কপালের ফোঁটা মুছতে নেই।

৪

বাবুজি, বাবুজি বলে ডাক শুনে দীপ্তিনারায়ণ ধড়মড় করে জেগে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে, কে ডাকে ?

দরজার বাইরে থেকে সাড়া এলো, আজ্ঞে বাবুজি, আমি ভাদুড়ী।

দাঁড়ান, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, বলে দরজার কাছে গিয়ে দেখল, দরজা খোলা আছে, রাতে খিল দেওয়া হয়নি, বুঝল সারাদিনের ধকলের পরে এসে শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। দরজা খুলে দিয়ে ভাদুড়ীকে ভিতরে আসতে বলে শুধালো, আজ এত সকালে যে, বলুন ব্যাপার কি ?

আজ্ঞে কর্তামা একবার আপনাকে দেখা দিতে বলেছেন।

আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে, আজ সকালে উঠেই নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল, কর্তামায়ের প্রসাদ জুটবে।

আপনি একবার সময় করে যাবেন। ভুলে যেন যাবেন না, কর্তামা খবর দিয়েছেন।

কেন বলুন তো ? জরুরী কিছু খবর আছে ?

আজ্ঞে হাঁ, কালকে অনেক রাতে বাড়ি থেকে জরুরী খবর নিয়ে লোক এসেছে।

বটে ! কিন্তু আপনারা যে এখানে আছেন জানলো কি করে ?

জানবার কথা নয় সত্যি, কারণ এতদিন আমাদের শ্রীবৃন্দাবন রওনা হয়ে যাওয়ার কথা। তাই বাদল সর্দারের উপরে হুকুম ছিল দামুকদিয়ায় যাও, বউমাদের সেখানে পাও ভালো, না পেলে বৃন্দাবনের ঠিকানায় তার পাঠিয়ে দেবে, যেমন আছেন সেইভাবেই নিয়ে আসতে।

দীপ্তি বলল, দাঁড়ান, একটু বুঝে নি। যে লোক সংবাদ নিয়ে এসেছে তার নাম বাদল সর্দার। আর যিনি খবর পাঠিয়েছেন, আপনাদের জমিদারীর পুরনো বৃদ্ধ কর্মচারী, অর্থাৎ কর্তামা যখন বাড়ির বধূ ছিলেন তখনই তিনি মুরুব্বী, নইলে বউমা বলবেন কেন ?

সমস্তই আপনি বুঝেছেন। কর্তা গত হওয়ার পরে তিনিই এখন রাজবাড়ির প্রধান।

প্রজা বিক্রর খবর তো কর্তামা আগেই পেয়েছিল তবে—

বাবুজি ওরকম বিক্র প্রত্যেকবার কিস্তির আগেই হয়। খাজনা চাইলেই বিক্র। তবে এবারে নিশ্চয় কিছু বিশেষ হয়েছে নইলে দেওয়ানজি খবর পাঠাবেন কেন।

তিনি মেয়েছেলে, তিনি ফিরে গিয়ে কি করবেন ?

সে কি হয় বাবুজি, তিনিই এখন মালিক, তা ছাড়া প্রজাশাসনেও তিনি বুদ্ধি রাখেন।

আচ্ছা আপনি যান, আমি যাচ্ছি, তবে বলবেন পরামর্শ চেয়েছেন পরামর্শ দেব কিন্তু তার দক্ষিণাবাবদ প্রসাদ দিতে হবে।

এসব কথার প্রত্যক্ষ উত্তর হয় না, পরোক্ষ উত্তর হয় হাসি নয় নীরবতা। ভাদুড়ী হাসল। সময় বুঝে হাসতে পারা সাংসারিক উন্নতির একটি প্রধান ধাপ।

ভাদুড়ী যেতে উদ্যত হলে দীপ্তি বলল, দেখুন সবই বললাম, সবই বুঝলাম, কেবল আপনাদের গাঁয়ের নামটি এখনো জানতে পারলাম না।

এবার ভাদুড়ী নীরব হয়ে থাকল।

কি হল ভাদুড়ীমশাই?

আজ্ঞে ঐখানে কর্তামায়ের একটু নিষেধ আছে।

নিষেধ যে আছে প্রথম দিন থেকেই বুঝেছি, কিন্তু এ নিষেধটা নিতান্ত আজগুবী মনে হচ্ছে—তাই নয়?

এবারে ভাদুড়ী হাসল, তারপর বলল, কথা কি জানেন, পথেঘাটে বাড়ির পরিচয় দিতে নেই।

সে নিষেধ চোর ডাকাতের সম্বন্ধে, আমি নিশ্চয় চোর-ডাকাতের মধ্যে নই?

সে কি কথা বাবুজি! আপনি আমাদের পরম উপকারী, আপনার জন্যে এযাত্রা সকলের প্রাণরক্ষা হয়ে গেল।

তাই পুরস্কারস্বরূপ আমাকে চোর ডাকাতের পর্যায়ভুক্ত করে বাড়ির পরিচয় গোপন করছেন। আচ্ছা এখন যান, এসব ঝগড়া কর্তামায়ের সঙ্গে করব। কিন্তু বিবাদের ছলে প্রসাদের কথাটা যেন ভুলে না যান তিনি।

ভাদুড়ী বিদায় হয়ে গেলে দীপ্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কর্তামায়ের কাছে যাওয়ার আগে চুলটা ঠিক করে নেবার উদ্দেশ্যে আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়াল, দাঁড়িয়েই চমকে উঠল, এ কি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা এলো কোথা থেকে? না, কালকে তো কালীর থানে কপালে ফোঁটা দেয়নি! তবে? তখনি মনে পড়ল কালকে সারারাত দরজা খোলা ছিল। কারো ঘরে ঢোকা অসম্ভব ছিল না। এমন অসাবধান হওয়া তার স্বভাব নয়। তখন তার মনে হল যে-ই ঢুকুক সে যে বুকে ছোরা না মেরে কপালে ফোঁটা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে—এই তো পরম সৌভাগ্য। কিন্তু কে দিল ফোঁটা? মনের মধ্যে সারাক্ষণ এই চিন্তার রহস্য পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল, ঘুমের ঘোরে লুকিয়ে এসে কে দিয়ে গেল রক্তচন্দনের ফোঁটা! একবার চকিতের মতো একটা নাম মনে এলো, তখনি হেসে উঠে বলল, না, না, এ একেবারেই অসম্ভব, স্বয়ং

ডাকাতে কালীর এসে ফোঁটা দিয়ে যাওয়া এর চেয়ে অনেক বেশি সম্ভাবনার স্থল। কিন্তু বেশিক্ষণ ফোঁটার রহস্য নিয়ে ভাববার সময় ছিল না, তবে মুছে ফেলবার সাহসও হল না, কারণ এ যে কালীর ত্রিশূলের রক্তচন্দন তাতে সন্দেহ ছিল না, তখন সেই অব্যক্ত ফোঁটা কপালে নিয়েই কর্তামায়ের উদ্দেশে দোতলায় চলল।

বাবা, আজ সকালবেলাতেই তোমাকে ডেকে নিয়ে এসে বিরক্ত করলাম।

কিছু না, কিছু না, বরঞ্চ ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেই সকালবেলায় দর্শন পেলাম।

বাড়ি থেকে জরুরী সংবাদ নিয়ে লোক এসে হাজির।

সমস্তই শুনেছি ভাদুড়ীমশায়ের কাছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, লোকটা আপনাদের খুঁজে পেল কি করে?

কাজটা কঠিন তবে বাদল সর্দারের কিছুই অসাধ্য নয়। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হ্যাঁরে বাদলা, ও ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে মানুষ হয়েছে, তাই বাদলা বলে ডাকি। বললাম, হ্যাঁরে বাদলা, বিলের মধ্যে আমাদের খুঁজে পেলি কেমন করে? বিলের মধ্যে খুঁজে পাওয়াই তো সহজ, ডাঙায় এদিকে ওদিকে খুশিমতো চলে যাওয়ার উপায় আছে, বিলের মধ্যে জল ছেড়ে এদিক ওদিক যাওয়ার উপায় নাই, কেবল তলার দিকে ছাড়া। আমি বললাম, ঝড়ের মুখে পড়ে সেই দিকেই যাওয়ার গতিক হয়েছিল। বললাম, খুঁজে যখন পেয়েছিস বল্ এখন ব্যাপার কি? এখন তো কিস্তির সময় নয় যে বিদ্রু করবে। সে বলল, এবারে খাজনা নিয়ে বিদ্রু না কর্তামা, কি সব জমির মাপজোখ নিয়ে বিদ্রু। তোমার নতুন পরগণার প্রজারা ক্ষেপে উঠে জমিদারদের কাছারীতে আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। ওসব কি আমি জানি না বুঝি। চলো গিয়ে দেওয়ানজির কাছে সব শুনবে।

তারপরে বললেন, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি একটা আর্জি আছে বলে। আজ সন্ধ্যায় আমাদের বিদায় দিতে হবে।

এ কথাটাও বলেছেন ভাদুড়ীমশাই। কর্তামা এ তো আর্জি নয়, এ যে হচ্ছে মর্জি। মর্জির উপরে তো আর কথা নাই। দয়া করে কদিন ছিলেন, এখন মর্জি হয়েছে যাবেন।

দয়া করে আসিনি বাবা, নিতান্ত দায়ে পড়ে এসেছিলাম, তোমরা রক্ষা না করলে ডুবে মরতাম।

বেশ তো যাবেন, আটকে রাখবার কি অধিকার আছে! স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল দীপ্তিনারায়ণ রাগ করেছে।

রাগ করলে বাবা?

দীপ্তি উত্তর দেওয়ার আগেই শুনতে পেল, মা, বৃন্দাবনী মাসিকে দীপ্তিনারায়ণবাবুর কাছে রেখে যাও। তার কীর্তন শুনলে মনে শান্তি পাবেন।

কখন সবার অলক্ষিতে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দনী।

চন্দনী, ঠাট্টা এখন ভালো লাগে না।

চন্দনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতেই সে বলে উঠল, দীপ্তিনারায়ণবাবু একেবারে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে এসেছেন যে!

না, আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করি না (এখনো কণ্ঠস্বরে পুরামাত্রায় ক্রোধ)।

তবে কপালে ফোঁটা এলো কোথা থেকে?

যেন কিছুই জানে না এমনভাবে চমকে উঠে বলল, কপালে ফোঁটা! (পুরাপুরি অবিশ্বাসের সুর।

বিশ্বাস না হয়, স্বচক্ষে দেখুন।

এই বলে আঁচলের তলা থেকে ছোট একখানা আয়না বের করে দীপ্তির হাতে দিল। চন্দনী আগেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল।

দীপ্তিনারায়ণের এখন বিস্ময়ের ভান করা ছাড়া গতান্তর নাই। সে বলে উঠল, তাই তো!

কৃত্রিম বিস্ময়ে চন্দনীও বলে উঠল, তাই তো!

দীপ্তির এখন অভিনয় করা ছাড়া উপায় ছিল না, সে ফোঁটা মুছতে উদ্যত হল।

মা দেখো, কালী মায়ের চন্দনের ফোঁটা মুচছে।

কর্ত্রী ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলে উঠলেন, না বাবা, মুছো না, মুছো না। তোমার উপরে দেবী কৃপা করেছেন।

আয়নাখানা রাখবার অছিলায় চন্দনী ঘরে প্রবেশ করে বিছানার উপরে হাসিতে ভেঙে পড়ল, দেবীর কৃপাই বটে। কোন্ দেবীর?

কালকে গভীর রাত্রে অনভিজ্ঞা কিশোরী এক দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল। দীপ্তি তার কপালে ফোঁটা এঁকে দেওয়াতে সে রাগ করেছিল একথা যদি কেউ ভাবে তবে বুঝতে হবে কিশোরী নারীর মনস্তত্ত্বে সে অনভিজ্ঞ। তবে রাগের ভান অবশ্যই করতে হয়েছে, যে-সে এসে কপালে ফোঁটা দিয়ে যাবে!

বৃন্দাবনী গভীর শাস্ত্রীয় হাসি হেসে বোঝাল, শ্বেতচন্দনের ফোঁটা হলে

এ কথা বলতে পারতে, কিন্তু মা এ যে রক্তচন্দনের ফোঁটা! রক্তচন্দন মা কালীর পায়ের ঘাম।

কর্ত্রী তাকে সমর্থন করে বলল, হাঁ মা, এসব শাস্ত্রকথা বৃন্দাবনী জানে, ওর তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে।

কোথাও কোনো ভরসা না পেয়ে সবটা রাগ (রাগের ভান) গিয়ে পড়ল মূল আসামীর উপরে। ভাবল দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি! সে স্থির করল প্রতিশোধের একমাত্র পন্থা কুঠিয়ালবাবুর কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা এঁকে দিয়ে আসা। কালকে সকালে আয়নায় দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে যাবে লোকটা. কল্পনায় মনে মনে সে খুব হাসল, জোরে হাসবার উপায় নেই, পাশের খাটে শুয়ে আছে মা। বিছানার উপরে উঠে বসে দেখল এই অবশ্যকর্তব্য সহজ কাজটিতে সমস্যা অনেক। প্রথম এত রাতে কোথায় রক্তচন্দন, দ্বিতীয় দীপ্তি-বাবুর শয়নঘরের দরজা খোলা আছে কি না, তৃতীয় হঠাৎ মা যদি জেগে ওঠেন তাহলে সব মাটি হয়ে যাবে। ঘরে রেড়ির তেলের আলো জ্বলছিল, জানলার কাছে এসে বিলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তরঙ্গলেশহীন জলের ঘোলা রঙের চাদরের উপর মাঠো মাঠো জ্যোৎস্নার আলো। তার মনে পড়ছিল সারাদিনের অভিজ্ঞতার বিচিত্র জাজিমখানার উপরে নানা পায়ের আনাগোনায় রকমারি ফুল তোলা।

তখন বেশবাস সংবৃত করে নেবার উদ্দেশ্যে এসে দাঁড়াতেই প্রথমেই চোখে পড়ল কপালের রক্তচন্দনের ফোঁটা। মা নিষেধ করায় আর মুছে ফেলা হয়নি। আদৌ তার মুছে ফেলবার ইচ্ছা ছিল না, তবু ভান করতে হয়েছিল। সারাদিন মাঝে মাঝে নানা ছুতোয় আয়নার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখেছে ঐ ফোঁটাটি, পিছনে দাঁড়ানো মানুষটাকেও চোখে পড়েছে। একবার চোখ বুজে একাগ্রচিত্তে অনুভব করতে চেষ্টা করল তার আঙুলের ডগার স্পর্শ। ডুবুরি যেমন জলের তলে সংসারে হাতড়ে খোঁজে অবলুপ্ত রত্নকণাটি, তেমনিভাবে সে খুঁজতে লাগল সেই হারানো মুহূর্তটি যখন নাকি এক খণ্ডিত মুহূর্তে তার আঙুলের ডগার আর নিজের কপালের ত্বকে স্পর্শ ঘটেছিল। মনে মনে বলল এই অস্ত্রেই সে নিহত হবে, বাঁ হাতের তর্জনীর ডগা দিয়ে খানিকটা তুলে নিল ঐ ফোঁটার রক্তচন্দন। প্রথম সমস্যার সমাধান হতেই তার সাহস বেড়ে গেল, অবিকম্পিত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে চলল দীপ্তির ঘরের দিকে। দরজার কাছে এসে এতক্ষণের সাহস কোথায় গেল, তার পা আর চলল না। কান পেতে

শুনল, না ভিতরে কোনো শব্দ নেই, ভাবল ঠিক আছে, স্থির করল দরজা বন্ধ থাকলে দরজার গায়ে মানুষের বিকল্পে ফোঁটাটি এঁকে দিয়ে পালাবে। দরজায় হাত দিতেই দরজা বাধা দিল না, ফাঁক হল, ঈষৎ একটুখানি, তবে কি দরজা খোলা, কেন, ভিতরে লোক আছে না বেরিয়ে গিয়েছে! মরীয়া হয়ে দরজায় চাপ দিল, দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। আজ তার ভাগ্য ভালো। অবাধে দ্বিতীয় সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। ভিতরে প্রবেশ করল, এবারে আর তার পা অবিকম্পিত ছিল না।

কাছে গিয়ে যখন নিদ্রিতের মুখের দিকে তাকাল দেখল চাঁদের আলো এসে পড়েছে মুখের উপরে। দেখল প্রশস্ত গৌরবর্ণ কপালের উপরে উড়ো চুল দু-এক গোছা, দেখল পাণ্ডুর কপোলে একটি তিল পথহারা পথিকের মতো দণ্ডায়মান, দেখল শুভ্র গ্রীবার খাঁজে খাঁজে সূক্ষ্ম ঘামের আভাস—ইচ্ছা করল মুছিয়ে দেয়, আর দেখল রক্তাক্ত ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে যূথীশুভ্র দন্তপংক্তির আভা, ইচ্ছা করল—এমন সময়ে ঈষৎ নড়ে উঠল নিদ্রিত, ভাবল এই বুঝি তার সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়, তখনি তর্জনীর ডগা দিয়ে একটি বিন্দু এঁকে দিল আলগোছে, অতিশয় আলগোছে, এ যেন কায়িক স্পর্শ নয়, মনে মনে স্পর্শ করা। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতেই রাজ্যের ভয় লজ্জা সঙ্কোচ এসে চেপে ধরল, ভীত হরিণীর মতো ছুটে বাইরে চলে এলো। একবারও তাকাল না পিছনে। তৃতীয় সমস্যাও বাধা সৃষ্টি করল না, না, মা এখনো জাগেনি। বিছানায় শুয়ে পড়তে তার মনে হল কি দুঃসাহসিক কাজই না সে করে এলো! দ্বিতীয়বার আর তার পুনরাবৃত্তি করবার সাহস হবে না। কিন্তু মুখখানি কি সুন্দর! দিনের বেলাতে দেখেছে, রাতের বেলাতে দেখেছে, আবার ঘুমের মধ্যেও দেখল কোনো তুলনা হয় না। নিদ্রার রহস্যগভীর সরোবরের উপরে এ কোন্ শুভ্র কহ্লার। এমনভাবে দেখবার সুযোগ জীবনে দু'বার আসে না। তখনি আক্ষেপ হল, এই সুযোগের সবটুকু সুখ কেন আদায় করে নিতে পারল না সে! সেই ঈষন্মুক্ত রক্তাভ ওষ্ঠাধরের উপরে আলগোছে অতিশয় আলগোছে···নিদ্রিত কমলের উপরে ভ্রমর বসলে কমলের কি ঘুম ভাঙে না টের পায়! এমন সূক্ষ্ম সুকুমার বিশ্লেষণ কি তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরীর পক্ষে সম্ভব! হাঁ কিশোরীতেই সম্ভব, আর কয়েক বছর পরে এই কিশোরী যখন তরুণী হবে, তারপরে যুবতী হবে, তখন মনের সূক্ষ্ম আনাগোনার পথের উপরে পড়বে প্রেমের রূঢ় পদাঙ্ক। কিশোরীতে প্রণয়ের বিশুদ্ধ মূর্তি। কিশোরীতে প্রণয়, যুবতীতে প্রেম। হাজার হাজার বছরেও

রাধার বয়স আর বাড়ল না। আমাদের রাধা চিরন্তনী কিশোরী।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে দীপ্তিনারায়ণ বলল, কর্তামা, প্রসাদ না অমৃত। বড় তৃপ্তি পেলাম।

বাবা মুখে ভালো লাগলেই রাঁধুনীর তৃপ্তি।

কিন্তু দুঃখ এই যে, আজকেই প্রসাদ পাওয়ার শেষ দিন।

ছিঃ বাবা, ওকথা বলতে নেই। শেষ কেন! তবে এক হিসাবে তোমার কথা সত্যি, আমার যে বয়স তাতে যে কোনোদিন মরতে পারি।

কর্তামা, তোমার শরীর শ্বেত পাথর কেটে তৈরি। হঠাৎ মরবার কথা ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু আপনার মেয়ে কোথায়, দেখছি নে কেন?

ও বোধ হয় পান সাজছে। ও চন্দনী, এদিকে আয়, তোর দাদাকে পান দে।

রুপোর ডিবেতে পান সেজে নিয়ে এসে দীপ্তিনারায়ণের সম্মুখে ধরল। দীপ্তি-নারায়ণ গোটা দুই পান তুলে নিয়ে চন্দনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু গম্ভীর দেখছি যে!

কর্ত্রী এই অভিযোগের উত্তর দিলেন, গম্ভীর হবে না কেন, ওর এখান থেকে যেতে মোটে মন সরছে না, কাল থেকে বলছে, মা এমন খোলামেলা জায়গায় থাকলে তোমার শরীর সারবে, আর কয়েকদিন থাকো না। আমি বললাম, বুড়ো বয়সে আমার শরীর সারিয়ে কার কি লাভ! ও বলে, তবে মনে করো না কেন আমার শরীর সারবে। বললাম, বাড়ি থেকে জরুরী খবর এসেছে তা জানিস! ও বলে, এ একটা কি খবর? প্রতি ছ'মাস অন্তর তোমার জমিদারিতে বিদ্রু হচ্ছে। হোক না, কিছু খাজনা মাপ দিয়ো, তাহলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বললাম, না রে, তা হওয়ার নয়।

কেন?

কেন কি, সব কথা তুই বুঝবি নে!

বলেই দেখ না।

নূতন যে দুটো পরগণা হাতে এসেছে তার প্রজারা কিছুতেই বশ মানছে না।

তবে যার কাছ থেকে কিনেছ তাকে ফিরিয়ে দাও।

তাই কি কেউ দেয়?

কর্তামা চন্দনী ছেলেমানুষ, ও জমিদারির কি বোঝে!

চন্দনী চোখে ছোট্ট একটা বিদ্যুৎ স্ফুরিয়ে বলল, ও, তাড়াতে পারলেই খুশী!

এখানকার দুধ দই সন্দেশ অতল নিতল দীঘির মাছে ভাগ বসাচ্ছি কি না!

দীপ্তিনারায়ণ হো হো করে হেসে উঠল।

হাসলেই সব মামলা মিটে যায়। তোমরা যাও মা, ঐ অতল নিতল দীঘি দুটোর সব মাছ না ফুরানো অবধি আমি এখান থেকে যাব না।

নে চন্দনী, পাগলামি করিস নে, এখন জিনিসপত্র গোছাতে হবে চল্।

দীপ্তি বলল, ও কি, চললে কোথায়, দুটো পান দিয়ে যাও।

পান নিয়ে আসবার আগেই কর্ত্রী গৃহান্তরে চলে গিয়েছেন। দীপ্তি পান নিতে উদ্যত হলে চন্দনী বলে উঠল, ও কি দীপ্তিবাবু, আপনার কপালের ফোঁটা কি হল?

স্নানের সময় জলে ধুয়ে গিয়েছে। তোমার ফোঁটা দেখছি এখনো আছে!

রাখলেই থাকে।

ধুলেই যায়।

মা না নিষেধ করেছিলেন!

তাঁর মেয়েকে।

বটে, দাঁড়ান! মাকে এখনি বলে দিচ্ছি—এই বলে দুই চোখে বিদ্যুতের ল- কলা ফুটিয়ে সে চলে গেল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দীপ্তিনারায়ণ ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে গেল—ঐ এতটুকু মেয়ের চোখে এত বিদ্যুৎ আসে কোথা থেকে! ঐ এতটুকু মেয়ের মুখে এত কথা আসে কোথা থেকে! তার একবারও মনে পড়ল না, আমাদের পুরাণ ও শাস্ত্রের সব মেয়েরই বয়স চন্দনীর বয়সের গা-ঘেঁষা; প্রবীণাকে নিয়ে তত্ত্বালোচনা হতে পারে, কাব্যের উৎস নবীনা। রাধাকে নিয়ে কাব্যরচনার পালার আর শেষ হল না। হবেও না কোনোদিন। কেননা "আজিও কাঁদিছে রাধা হৃদয়-মন্দিরে"।

রাতের আহারপর্ব চুকিয়ে দিয়ে কর্ত্রী, চন্দনী, বৃন্দাবনী আর ভাদুড়ী-মশাইকে বজরায় তুলে দিতে এসেছে দীপ্তিনারায়ণ। কর্ত্রী আগেই গদাধর মাঝিকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে শুনে নিয়েছে বজরার হাল মাস্তুল সমস্ত মেরামত হয়ে গিয়েছে।

গদাধর অভয় বাণী উচ্চারণ করেছে, ভয় নাই কর্তামা, আর ঝড়জল আসবে না।

যদি আসে তবে আবার বজরা বানচাল হবে তো !

না কর্তামা, ঝড়জলের সময় চলে গিয়েছে। আশ্বিনের ঝড় একবারের বেশি আসে না এক বছরে।

সেই ভরসাতেই যাচ্ছ গদাধর, কি বলো ?

না মা, মাল্লাদের সব হুঁশিয়ার করে দিয়েছি।

হালে বসছে কে ?

আমি নিজে মা।

বেশ। কবেতক ঘাটে পৌঁছতে পারবে ?

মনে হচ্ছে কালকে সন্ধ্যাতক পৌঁছবো।

ঠিক তো।

হ্যাঁ মা। এই বিলের মধ্যে যা বিলম্ব। তারপরে নদীতে গিয়ে পড়লে স্রোতের টানে হু হু করে এগিয়ে যাব।

যতক্ষণ কর্ত্রী ও গদাধরের মধ্যে কথা হচ্ছিল, দীপ্তিনারায়ণ একান্তে দাঁড়িয়ে বজরার অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ করছিল, আগে কখনো ভিতরে আসেনি। বজরার সাজসজ্জা আসবাবপত্র খাটপালঙ্ক দেখে সে বুঝল এ বড়লোকের ব্যাপার। বজরায় তিনটে কক্ষ, প্রশস্ততমটিতে তারা সকলে উপবিষ্ট। তাদের সঙ্গে ঝুলছে চৌকো কাঁচের দুটি লণ্ঠন, ভিতরে রেড়ির তেলের স্নিগ্ধ আলো। কাঠের দেয়ালে ডানাওয়ালা দুটো পরী শঙ্খ বাজাচ্ছে, আর দুদিকের কাঠের দেয়ালে দশমহাবিদ্যার, রাধাকৃষ্ণের ছবি। পাটাতনের উপরে পাশাপাশি দু'খানি মানুষ-প্রমাণ পালঙ্ক কর্ত্রী আর চন্দনীর জন্যে, দু'পাশে দু'খানি গদিআঁটা কুর্সি, মেঝেটা দামী কার্পেট দিয়ে ঢাকা।

কি দেখছ বাবা ?

দীপ্তি বলল, এমন সুন্দর বজরা আগে কখনো দেখিনি।

এখানা আর কি দেখছ, আরও দু'খানা ছিল আরও বড়, আরও সাজানো-গোছানো। সে দু'খানা গিয়েছে প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে দাঙ্গায়, একখানা ডুবেছে, আর একখানা পুড়েছে।

আচ্ছা কর্তামা, জমিদারদের দাঙ্গা করা ছাড়া কি আর কাজ নাই ?

আর কি কাজ বলো বাবা ! প্রজারা খাজনা যোগায়, নায়েব গোমস্তারা এনে মুখে তুলে দেয়। নিছক শুয়ে থাকলে তো খিদে পায় না তাই মাঝে মাঝে নিজেরা দাঙ্গা কাজিয়া করে। ওটা অনেকটা ব্যায়ামের মতো আর কি।

তারপরে তিনি চন্দনীকে বললেন, যাও তো মা, তোমার দাদাকে বজরাখানা ভালো করে দেখিয়ে দাও।

চন্দনী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আসুন কুঠিয়ালবাবু!

দীপ্তি বলল, চলো বজরাওয়ালী দিদি।

কেমন হল তো! বলে হেসে উঠলেন কর্ত্রী। নাও শোধবোধ হয়ে গিয়েছে, আর কথা-কাটাকাটি নয়। যাত্রার সময় হয়ে এলো।

কর্ত্রীর কানের বাইরে গিয়ে চন্দনী বলল, কি আর দেখবেন। সামনের দিকে একখানা কামরা। থাকেন ভাদুড়ীমশাই, পিছনদিকে আর একখানা কামরায় থাকে বৃন্দাবনীমাসী। হল তো এবার। চলুন হালের কাছে গিয়ে বসে গল্প করি গে।

তোমার মা যে বললেন সব দেখিয়ে আনতে?

মায়েরা অমন বলেই থাকে। আর—

কথা কেড়ে নিয়ে দীপ্তি বলল, মেয়েরা অমন অমান্য করেই থাকে, কি বল?

নিন, বসা যাক। কি রকম দেখলেন?

দেখলাম তোমাদের বজরাখানা মস্ত।

আপনার কুঠিটাও ছোট নয়।

বজরার সঙ্গে কি কুঠির তুলনা হয়?

কেন? একটা ভাসমান আর একটা দণ্ডায়মান কি বলেন!

কতকটা তাই বটে। ভাবছি কালকে এমন সময়ে তোমরা কোথায়?

কোথায় আবার, আমাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়েছি।

এত সাধ্যসাধনা করেও তো ঘাটটার নাম জানতে পারলাম না।

মাকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন। কি ভাবছেন?

ভাবছি সেখানে যদি যেতে পারতাম—

চলুন না কেন?

যাকে নামটি পর্যন্ত বললেন না মা, তাকে নিয়ে যাবে মেয়ে!

মেয়ের দরকার কি, আপনি নিজেই তো যেতে পারেন।

কি করে?

তবে দেখুন—এই বলে চন্দনী পাটাতনের একখানা কাঠ সরিয়ে দিল। বেরিয়ে পড়ল ভিতরের আধো-অন্ধকার একটা কুঠরি। বলল, ঐ জায়গায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকুন। ঠিক গিয়ে পৌঁছবেন।

ঐ অন্ধকার কুঠুরিতে মরি আর কি!

বালাই ষাট—মরবেন কেন? ওখানে চাল ডাল, নুন তেল সব মজুত আছে। পেট ভরে খাবেন আর ঘুমুবেন।

এখন ঠাট্টা রাখো চন্দনী।

তবু ভালো যে বুঝেছেন। আমি ভাবছিলাম এখনি ঢুকে পড়বেন!

চলো এবার যাওয়া যাক। নইলে মা আবার কি ভাববেন।

কি আর ভাববেন? বুঝবেন দুজনে অথৈ জলে গিয়ে পড়েছে!

নাও চলো—বলে উঠে পড়ল দীপ্তি।

বসে থাকব।

আর আমি একলা ফিরে গেলে মা ভাববেন মেয়ে জলে ডুবেছে।

বলবেন এখনও ঠিক ডোবেনি তবে জল গলা পর্যন্ত উঠেছে।

এসব কথার অর্থ দীপ্তির না বুঝবার নয়। সে স্থির গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, চন্দনী!

চন্দনী ততোধিক গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, কি কুঠিয়ালবাবু?

দুই গাম্ভীর্যের ঠোকাঠুকিতে দুজনেই হেসে উঠল। প্রথমে চন্দনী, তারপরে দীপ্তিনারায়ণ।

যেতে যেতে দীপ্তি বলে উঠল, আমার ভয় করে তোমার বৃন্দাবনী মাসিকে।

কেন বলুন তো! মাসি আমার নিরীহ লোক।

নিরীহ বইকি—ও সকলের মনের কথা জানে।

সকলের না হোক আপনার মনের কথা জানে মনে হচ্ছে।

কর্ত্রীর কাছে গিয়ে চন্দনী বলল, মা, দীপ্তিবাবু বলছিলেন বৃন্দাবনী মাসিকে এখানে রেখে দেবেন।

বৃন্দাবনী কখন এসে বসেছে, সে বলল, আমার কি অসাধ তবে আমি, যে কর্তামাকে নাম শোনাই, নইলে আমার সকল স্থানই বৃন্দাবন।

চন্দনী আমি কখন বললাম যে বৃন্দাবনী মাসিকে রাখতে চাই।

তার মানে রাখতে চান না। কেন, উনি তো বেশ নামগান করেন।

এবারে কর্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, ওর কথায় কিছু মনে করো না বাবা, ওর মুখে যা আসছে তাই বলছে। গাঁয়ের লোকে ওকে বলে হরবোলা।

চন্দনী বলে উঠল, কেবল মাসি বলে হরিবোলা।

নাও, এখন খুব হয়েছে, এবারে মাসি একটা পদ গাও।

মাসি মন্দিরায় কেবলি ঠুং করে আওয়াজ তুলেছে এমন সময়ে হাতে একটি হাঁড়ি ঝুলিয়ে নিয়ে মোহনের প্রবেশ।

ও কি রে?

সন্দেশ কর্তামা।

কেন রে?

বাবুকে জিজ্ঞাসা করো।

দীপ্তি বলল, পথে খেতে হবে না!

আচ্ছা এনেছিস রাখ্।

চন্দনী বলল, পথের ভাবনা পথ ভাববে, দুপুরবেলাতেই বাদল সর্দার রওনা হয়ে গিয়েছে।

সে কি গাঁয়ে গাঁয়ে সন্দেশের বায়না দিতে দিতে যাবে নাকি!

কুঠিয়ালবাবু কিছুই জানেন না দেখছি। নদীর ধারে ধারে যেখানে আমাদের মহাল সেখানে খবর পৌঁছলেই যথাসময়ে লোকে নদীর ঘাটে দুধ দই সন্দেশ নিয়ে হাজির থাকবে, উপরির মধ্যে নগদ টাকার নজর।

নে থাম চন্দনী, আর ব্যাখ্যা করিস নে। নাও মাসি এবারে একটি পদ ধরো।

বৃন্দাবনী মাথা নীচু করে মন্দিরায় ঠুং ঠুং আওয়াজ তুলে গান ধরল।

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি।
আবরণ ভারিণী নব অনুরাগিণী
রস সোহাগিনী তরঙ্গিণীরে
কুঞ্চিতকেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রসআবেশিনী ভঙ্গিনীরে
নব অনুরাগিণী, নিখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণীরে
রাস-বিহারিণী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাস চিত মোহিনীরে।

কর্ত্রীর চোখে জল গড়াতে লাগল। তিনি আহা আহা করে উঠলেন, বললেন, মাসি, তোমার একটি পদ শুনলে মানুষের তত্ত্বজ্ঞান হয়।

কর্ত্রীর উক্তি কার সম্বন্ধে সত্য জানি না, তবে দীপ্তিনারায়ণের মনে নানা ভাবের নানা ছন্দের খেলা চলছিল, তার মনে হচ্ছিল পদকর্তা গোবিন্দদাস কি করে

চন্দনীর মূর্তি অঙ্কিত করলেন, কি করে জানলেন যে চন্দনী কুঞ্চিতকেশিনী, নব-অনুরাগিণী। কি করে জানলেন চন্দনী নিখিলসোহাগিনী, পঞ্চমরাগিণী! না, কবিদের কিছুই অসাধ্য নয়।

এদিকে চন্দনী একান্তে বসে দীপ্তির উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখে মনে মনে হাসছিল, আবার কিছু সুখও অনুভব করছিল, যখন পদগুলোর টুকরো একটার পরে একটা এসে ঐ অসহায়ের হৃদয়ে ভিড় হচ্ছিল।

কুঞ্চিতকেশিনী শুনতে শুনতে নিজের একগোছা কুঞ্চিত চুল আঙুলে জড়াচ্ছিল, নব অনুরাগিণী শুনতে শুনতে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল দীপ্তি-নারায়ণের উপর, আর রাসবিহারিণী হাস-বিকাশিনী শুনতে শুনতে অধরের উথলে পড়া হাসি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না।

গান শেষ হয়ে গেলে যখন সবাই বাহা বাহা করছিল চন্দনী বলে উঠল, মাসি, ঐ ছিঁচকাঁদুনে রাধা মেয়েটাকে নিয়ে পদকর্তাদের এত আদিখ্যেতা কেন? কৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখতে পারেন না?

তাও আছে মা, শুনবে? বলে মন্দিরায় ঠুং ধ্বনি করবামাত্র ভাদুড়ীমশাই প্রবেশ করল, বলল, কর্তামা, যাত্রার লগ্ন উপস্থিত হয়েছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

কর্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, এসো বাবা।

এতক্ষণ দীপ্তিনারায়ণ ও চন্দনী ভাবের পঞ্চম স্বর্গে বিরাজ করছিল। যার না আছে আদি না আছে অন্ত। হঠাৎ তারা পতিত হল কঠিন ভূতলে। চন্দনী ও দীপ্তির চোখে আলো জলে উঠল, এমন সময়ে কর্ত্রী দীপ্তিকে বললেন, বাছা একবার এদিকে এসে শোন—বলে তাকে নিয়ে অন্তরালে গেলেন। গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, বাবা, তোমাকে আমাদের পরিচয় দেব না ভেবেছিলাম কিন্তু এই ক'দিনেই তোমাকে আত্মীয়ের অধিক করে পেয়েছি তাই এখন না বলে বিদায় হয়ে গেলে অন্যায় হবে—

এ পর্যন্ত শুনে দীপ্তিনারায়ণ ভেবেছিল হয়তো অসম্ভব সম্ভব হল, হয়তো স্বপ্ন সত্য হতে চলল, হয়তো এখনি চন্দনীকে আমার হাতে দেবার প্রস্তাব করবেন, তারপরে যখন শুনল বাবা আমাদের বাড়ি রক্তদহ গ্রামে, আমি রক্তদহ জমিদারবাড়ির গৃহিণী—আর চন্দনী আমার একমাত্র মেয়ে—সেই মুহূর্তে নৌকোর পাটাতন সরে গিয়ে দীপ্তিনারায়ণ নিক্ষিপ্ত হল অতল জলে, এ যে কত নিষ্ঠুর অশনিসম্পাত কেউ বুঝতে পারবে না। তার সমস্ত ভবিষ্যৎ মুহূর্তে রুদ্ধশ্বাস

হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। সময়োচিত বিদায় সম্ভাষণ না করে একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত প্রণামে কর্তব্য সম্পাদন করে সে ফিরে চলল। সম্মুখে পড়ল চন্দনী, হাস্যমধুর মুখে জিভ বের করে ভেংচি কাটল, কোনো প্রতিক্রিয়া হল না দীপ্তির মুখে।

সে ভাবল লহমার মধ্যে এ কি হল! সমস্ত রহস্য না জেনে বিদায় নেবে না কখনো। পিছন পিছন গিয়ে ভাদুড়ীমশায়ের কামরায় একাকী পেল দীপ্তিনারায়ণকে। সমস্ত সঙ্কোচ সমস্ত সংস্কার সবলে সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ কি, এমন করে কোথায় চললে—এই বলে তার হাত ধরল।

এই প্রথম তুমি, এই প্রথম হাত ধরল। দীপ্তিনারায়ণ এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নৌকো থেকে নেমে পড়ল। তারপর নৌকোর কাছি খুলবার শব্দ, মাঝিদের হাঁকডাক, জলের কল্লোলধ্বনি।

না বুঝল কর্ত্রী না বুঝল চন্দনী, হঠাৎ কেন পরিবর্তন হল দীপ্তিনারায়ণের মনে!

৫

বাংলা দেশের নদনদী খাল বিল যে দেখেনি বাংলাদেশকে দেখেনি সে;—এইসব নদনদী খাল বিলকে যে জানে না বাংলাদেশকে জানে না সে; এইসব নদনদীর কলধ্বনি যার কানে প্রবেশ করেনি বাংলাদেশের মনের কথা শোনেনি সে, এই জলধারায় অবগাহন করেনি যে এ দেশকে আলিঙ্গন করেনি সে, এইসব বারিপ্রবাহের সিক্ত স্নিগ্ধ উদ্ভিজ্জ গন্ধ যার নাসায় প্রবেশ করেনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই তার বৃথা। গ্রীষ্মে ক্ষীণ বর্ষায় স্ফীত শরতে পূর্ণ শীতে শান্ত এইসব নদীমালা উত্তর ভারতের নদনদীর নান্দী আর পূর্বভারতের নদনদীর ভরতবাক্য, দুয়ে মিলিয়ে ভারত মহাকাব্যের উপসংহার। হিমালয়ের পরপারবর্তী মানস সরোবরের হিমবাহ শয্যা থেকে রাগে অভিমানে আর মুখ-দেখাদেখি না হয় এইভাবে যারা বিপরীত দিকে যাত্রা করেছিল দীর্ঘাতিদীর্ঘ পথের শেষে এসে তারা আবার মিলিত হল বাংলাদেশের মাটিতে যে-মাটি তাদেরই সৃষ্টি তাদেরই আশ্রয় তাদেরই বিলয়। বাংলাদেশকে জানা মানে তার নদনদীকে জানা। এইসব নদীতে নৌকো ভাসিয়ে যাওয়ার তুলনা নাই আনন্দের এবং জ্ঞানের। বাংলাদেশের আন্তরিক পরিচয় লাভের জন্য ভিতরে প্রবেশের আবশ্যক নাই—ঘাটে ঘাটে তার সুখদুঃখের

জীবলীলা অঙ্কিত, সকাল সন্ধ্যায় নূতন তার রূপ ; দুপুরের রোদে গভীর, রাত্রির নক্ষত্রের ভাস্বরতায় নূতন তার রূপ ; শ্মশানের চিতানলে তার এক রূপ ; আর বিবাহের হোমানলে ক্লান্ত মধুর মুখমণ্ডল বর ঐ যে বধূকে নিয়ে ঘাট থেকে নৌকোযোগে স্বদেশে যাত্রা করল তার আর এক রূপ।

হঠাৎ চন্দনীর চিন্তায় বাধা পড়ে, মনে পড়ে কাল রাতে দীপ্তিনারায়ণের আকস্মিক প্রস্থানের পরে মায়ের অনুরোধে বৃন্দাবনী যে গীতটি গেয়েছিল তার কয়েকটি পদ।

ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মূরছা যায়।
কিবা সে নাগর কি ক্ষণে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে।

কাল রাতে চন্দনীর ঘুম হয়নি। মা বারে বারে প্রশ্ন করেছে, হ্যাঁ রে চন্দনী হঠাৎ দীপ্তি চলে গেল কেন, না একটা প্রণাম, না একটা মিষ্টি কথা, কি হল বল্ তো!

আমি কি করে বলব, তুমি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কি ফুস-মন্তর দিলে তারপরেই তো এই রকম হল।

কি আর ফুস-মন্তর দেব। আমাদের পরিচয়টা দিলাম।

তাতে রাগবার এমন কি হয়েছে, ও তো অনেক আগেই জানানো উচিত ছিল।

আমি ভাবছি কি দীপ্তির হয়তো দুঃখ হল এত বড় জমিদারের বাড়ির গিন্নি এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর যথাযোগ্য সম্মান করতে পারিনি।

কিঞ্চিৎ বিরক্তির সুরে চন্দনী বলল, নাও এখন ঘুমোও তো, দশ পনেরো দিন সবংশে তার ঘাড়ে পড়ে গাণ্ডেপিণ্ডে গিললে আর বলছ তার দুঃখ হয়েছিল। দুঃখ হয়েছিল তোমার, বেশ তো চলছিল, আরও কয়েকদিন কেন থাকলাম না।

আমার যেন থাকবার জায়গা নেই, পরের বাড়িতে পড়ে থাকি—তুই থাকগে যা, বলে মা পাশ ফিরে শুলো।

মনের কথাটি মায়ের মুখ দিয়ে বের হল শুনে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়ের। সে জিভ বের করে মায়ের উদ্দেশে, মুখ ভেংচিয়ে ওঠা তার চিরকেলে অভ্যাস।

কি রে চুপ করে গেলি যে বড় —মায়ের ইচ্ছা নয় যে আপোসে ঝগড়াটা এত শীঘ্র থেমে যায়। মায়ের অভ্যাস সে জানে। তাই বলল, মা আপোসে ঝগড়া আর করতে পারি নে, তার চেয়ে বৃন্দাবনী মাসীকে বলো পদ গাইতে।

কর্ত্রীর অনুরোধে বৃন্দাবনী তার কামরা থেকে এসে মন্দিরা ঠুকে গান ধরলো—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।

বজরার ছাদের উপরে বসে নদীর ঘাটে ঘাটে প্রতিবিম্বিত বাংলাদেশের জীবযাত্রার ছবি দেখছিল চন্দনী, এমন সময় তার চোখে পড়ল সদ্য বিবাহিত বধূকে নিয়ে বর যাত্রা করছে স্বগৃহে, বধূর গায়ে এখনো চেলী, বরের গলায় এখনও গত রাত্রির ফুলের মালা, দুজনেরই মুখে চোখে বিবাহ উৎসবের ক্লান্তি। বরের মুখখানি তার বড় সুন্দর মনে হল, সলজ্জ সানন্দ আবার ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাব, আর বধূর মুখে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে ভীতি ও কৌতূহলের পাথরে পরানো আনন্দের বান। ও অনেকক্ষণ ধরে বিদায়ী ও বিদায়-দাতা জনতাকে লক্ষ্য করছিল, অনেকেরই চোখে জল পড়বার সময় মনে পড়ছিল একদিন তাদেরও এমনি ভাবে জল পড়েছিল, যাদের জন্য পড়েছিল তারা আজ পরস্পর। ক্রমে নৌকোখানা দূরে গিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল—কিন্তু মনের মধ্যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল বরের মুখটি। হঠাৎ কালকে রাতে সেই গানটি মনের মধ্যে গুন গুন করে উঠল—ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়। সে যদি বিজ্ঞ হত তবে বুঝতে পারত পদাবলীর পদ্মবনে গানের ভ্রমর বাসা বেঁধেছে, একটু নাড়া খেতেই গুন গুন করে গান গেয়ে ওঠে, সে-সব গান না নূতন না পুরাতন, সে-সব গান সুখের না দুঃখের। সে-সব গান না রামীর না রাধার। সে-সব ভ্রমরের মুখে চারশো বছরের বন্দনা, যা গান হয়ে ওঠে, পদ্মবন একটু নাড়া খাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। আজ চন্দনীর পদ্মবন নাড়া খেয়েছে তাই তার মনে পড়ে গিয়েছে আর একখানি মুখ, সেও এমনি কাঁচা, এমনি তরুণ, এমনি লাবণ্যময়।

রাতের বেলায় বিল পার হয়ে এসে বজরা নদীতে পড়েছে। এখন স্রোতের টানে পালের হাওয়ায় বেশ দ্রুত চলছে। চন্দনী বজরার ছাদের উপর বসে একমনে নদীর তীরের দৃশ্য দেখছে। সে দৃশ্য চিরপরিচিত আর চিরনতুন। মাঠে আমন ধানের ভার আর সইতে পারে না, পাট কাটা হয়ে গেলেও নাবালে

বোনা পাটের ক্ষেত মাঝে মাঝে চাষীর কাস্তের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে—আর মাথা তুলে আছে আখের ক্ষেত, মাঝে মাঝে আমবাগান। হঠাৎ ডান দিকে তার চোখে পড়ল মস্ত একটা কুঠী। সে চমকে উঠল। এ কি সেই ধুলোউড়ির কুঠি নাকি! তা কেমন করে সম্ভব! নয়ই বা কেন, রাতের ঘোরে আমরা হয়তো দিক ভুল করে উজিয়ে চলেছি। স্বয়ং জগন্নাথের যদি উল্টোযাত্রা সম্ভব তবে আমাদেরই নয় কেন। আর একটু এগোতেই ভুল ভাঙল। এ অন্য কোনো কুঠি, ধুলোউড়ির কুঠি ছিল তিন তলা, এটা চার তলা। বুঝল কোনো পরিত্যক্ত নীল কুঠি হবে। সে শুনেছিল এদিকে আগে নীলের চাষ ছিল। উঠে যাওয়া ব্যবসার সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে কুঠিগুলো। ধুলোউড়ির কুঠি মনে পড়তেই মনে পড়ল দীপ্তিনারায়ণকে। হঠাৎ চলে গেল কেন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি মাকে। নিজেকেও দিতে পারেনি। এখন আবার প্রশ্নটা নূতন করে মনে আসতে শুরু করল। তার মনে হল তার কোনো অজ্ঞানকৃত অপরাধেই দীপ্তি-নারায়ণের রাগ হয়েছে—তাই সে এমন করে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, তার প্রথম তুমি সম্বোধন উপেক্ষা করে চলে গেল। যতই অপরাধ হয়ে থাকুক না কেন, অনাত্মীয়ের মুখের 'তুমি' সম্ভাষণে কি তার স্খালন হয়নি! এরকম অবস্থায় রাগ হওয়ার কথা চন্দনার। দীপ্তি হঠাৎ রাগ করবে কেন। লোকটা নেহাৎ গোঁয়ার দেখছি, এবং থাকে পড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে, ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে জানে না দেখছি। কিছুতেই তার মনে পড়ল না, অনেকবার দীপ্তির শিক্ষা সহবতের অনুকূলে মায়ের কাছে সে সাক্ষ্য দিয়েছে। ভালই হয়েছে এমন লোকের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে, স্থির করল আর কখনও কাছে ঘেঁষবে না, অদূরে একটা বাঁধানো ঘাট দেখা গেল, নিশ্চয় কোনো বড় গ্রাম আছে।

ঘাটে একদল স্ত্রী পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের একজন বলল, বজরা থামাও।

আর একজন বলে উঠল, হালে বসে কে, গদাধর ভাই নাকি?

আরে রামচরণ যে, হঠাৎ!

হঠাৎ আবার কি, কর্তামার বজরা দেখেই বুঝেছি, তা ছাড়া কালকে বাদল সর্দার এসে খবর দিয়ে গিয়েছে যে কর্তামা আসছে, তোমরা ঘাটে হাজির থেকো।

বজরা ঘাটে ভিড়ল। ভিতর থেকে বের হয়ে এলো ভাদুড়ীমশাই। বলল, আরে রামচরণ, কেদার, ভুবন তোমরা সবাই এসেছ দেখছি।

আসব না! জমিদারের দেখা পেতে হলে রাজবাড়িতে যেতে হয়, আর

স্বয়ং জমিদার ঘাট দিয়ে যাচ্ছে, দেখা না করলে যে পাপ হবে।

একখানা লাল শাল গায়ে কর্ত্রী বাইরে এসে দাঁড়ালেন—বললেন, তোমরা সবাই এসেছ দেখছি।

আসব না! অনেক পুণ্যে জমিদারের দেখা পাওয়া যায়।

দলের মধ্যে একজন টোলের পণ্ডিত ছিল। সে বলল, একটা অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয় গাঁয়ে জমিদারের পদার্পণ হলে।

এবার তো বাবা তোমাদের গাঁয়ে নামতে পারব না। জরুরী কাজ আছে।

সেই পণ্ডিতটি বলল, গাঁয়ের ঘাটে নৌকো ভিড়লেই ঘাটে পদার্পণ করা হয় শাস্ত্রে বলেছে।

ইতিমধ্যে সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে দু' টাকা, এক টাকা নজর দিয়ে প্রণাম করেছে। এটি হিন্দুপ্রধান গ্রাম।

তোমাকে চিনতে পারলাম না বুড়ীমা।

বুড়ী বলল, কি বলেই বা পরিচয় দেব, মেয়েদের পরিচয় স্বামী দিয়ে আর ছেলে দিয়ে। আমার দুই-ই গিয়েছে।

আহা তোমার তো বড় কষ্ট।

বুড়ী আঁচলে চোখ মুছলো।

কর্ত্রী মৃদুস্বরে ভাদুড়ীকে বললেন, গাঁয়ে গিয়ে এর কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। ভুল না হয়।

এমন সময়ে সবাই দেখল একজন বুড়োটেপানা লোক বাঁক কাঁধে নিয়ে ছুটে আসছে আর বলছে, বজরা খুলে দিয়ো না, দাঁড়াও দাঁড়াও!

সবাই বলল, ওরে কেষ্ট গোয়ালা।

বজরায় উঠে বাঁকের দুই দিকের শিকে থেকে দই আর ক্ষীরের ভাঁড় কর্ত্রীর পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে প্রণাম করল।

কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো আছ তো কেষ্ট? কেষ্টকে তিনি চিনতেন।

কেষ্ট হেসে বলল, আছি এইমাত্র, ভালো কি মন্দ জানি না।

কিন্তু এত দই ক্ষীর আনতে গেলে কেন?

আজ্ঞে আপনার সেবায় লাগবে।

তাই বলে এত আনতে হয়!

প্রসাদ পাওয়ার লোকের তো অভাব নেই, চহরজা সিং আর গদাধর ভাই আছে কেন!

বেশ। তোমাদের গাঁয়ে সব ভালো তো?

আমাদের গাঁয়ে তো খারাপ কিছু দেখি না, তবে শুনছি নূতন পরগণা দুটোয় নাকি প্রজাবিক্রু হয়েছে।

তার কথা শুনে সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, আমাদের কানেও কথাটা এসেছে, তবে এখন কর্তামা যাচ্ছেন, সব দুরস্ত হয়ে যাবে।

ভাদুড়ীমশায় অভয় দিয়ে বলল, হাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে, তোমরা ভেবো না।

তখন গদাধরের দিকে চেয়ে কর্ত্রী বললেন, কি গদাধর, আজ এখানেই থাকবে না বজরা ছাড়বে, রাত এক প্রহরের মধ্যে গাঁয়ে পৌঁছাতে হবে যেন মনে থাকে।

গদাধর সবিনয়ে বলল, শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে তাই হবে।

তার পরে কেষ্টর দিকে ফিরে বলল, কি কেষ্ট ভাই, নামবে না বজরার সঙ্গে সঙ্গেই যাবে, দই আর ক্ষীরের মায়া ছাড়তে পারনি দেখছি।

সকলে হেসে উঠল। তার পরে কর্ত্রীর পায়ের কাছে আর একবার প্রণাম করে নেমে গেল।

প্রজাদের গোলমালের সংবাদটা এত দূর পৌঁছে গিয়েছে দেখছি।

না মা, সে ভয় নাই—এরা সব সাত পুরুষের প্রজা, যত গোলমাল ঐ নূতন খরিদা পরগণা দুটো নিয়ে।

এখন তাই তো দেখছি। ঐ দুটো পরগণা কেনার পর থেকেই শান্তি নাই, না সংসারে না জমিদারিতে।

আমি তখনই নিষেধ করেছিলাম। দেওয়ানজী বলল, এত সস্তায় আর পাবেন না। তাছাড়া একটা রেষারেষির ব্যাপারও ছিল।

কর্ত্রী বললেন, জলের দরে পরগণা দুটো কিনে ভেবেছিলাম খুব লাভ হল। এখন দেখছি সে টাকা জলেই পড়েছে। যা আদায় হয় তার দ্বিগুণ ব্যয় মামলা মোকদ্দমা মারামারি লাঠালাঠিতে আর প্রজা-বিক্রু তো লেগেই আছে; এক এক বার ভাবি যার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দি।

কার সম্পত্তি? জিজ্ঞাসা করে ভাদুড়ী, বলে, দর্পনারায়ণ চৌধুরী তো মরেছে।

শুনেছিলাম তার এক ছেলে আছে।

ছিল বটে তবে অনেকদিন হল বাউণ্ডুলে হয়ে কোথায় চলে গিয়েছে, এখন বেঁচে কি মরে কেউ খবর রাখে না।

তার খবর পেলে জানাবেন, হাতে পায়ে ধরে তাকে ফিরিয়ে দি। জলের দরে কেনা তো।

এতক্ষণ পাশে বসে নীরবে শুনছিল চন্দনী, বলল, কেন মা, জলের কি দর নেই, তবে জমিদাররা জলকর আদায় করে কেন!

সেও তো মা জলের দর।

জলের দর তবে জলা নিয়ে রাজায় রাজায়, রাজায় প্রজায় এত লাঠালাঠি মাথা ফাটাফাটি কেন হয়!

আচ্ছা না হয় তাকে দানই করব।

দান করবে দর্পনারায়ণ চৌধুরীর ছেলেকে, আর সে বাপের বেটা হয়ে তোমার হাত থেকে দান নিতে যাবে কেন?

আচ্ছা না হয় ভিক্ষা বলেই দেব।

ভিক্ষাই বা নেবে কেন? আর সে লোকটা বাপের গৌরব ভুলে নিতান্তই যদি নিতে রাজি হয় আমি তোমাকে দিতে দেব কেন? এ সম্পত্তি যে আমার।

এখনো তোর হয়নি মনে রাখিস।

এ প্রশ্নের উত্তর নেই বুঝে চন্দনী অন্য দিকে গেল। বলল, মা, তোমার কি মানুষের শরীর নয়, তোমার শরীরে কি রক্তের বদলে বরফ-জল বইছে। জোড়াদীঘি আর রক্তদহের মধ্যে লড়াই আমার জন্মের আগেকার কথা, লোকের মুখে শুনেছি, জোড়াদীঘির জমিদার দলবল নিয়ে এসে আমাদের বাড়ি লুটে নিয়ে গেল, বাবাকে ধরে নিয়ে গেল, কয়েদ করল, এ সব কি ভুলে গেলে?

মা, সংসার করতে গেলে কিন্তু কিছু কথা ভুলতে হয়।

তাই বলে এত বড় অপমানের কথা!

মানের কথাও ভুলতে হয়, অপমানের কথাও ভুলতে হয়।

তুমি ভুলতে চাও ভোলো, আমার পক্ষে ভোলা অসম্ভব, আমি এ সম্পত্তি দান বিক্রি ভিক্ষা দিতে দেব না।

বেশ তবে তাই হোক। এখন থেকে তোমার সম্পত্তি তুমি দেখো, বুড়ো বয়সে আমার ঝঞ্ঝাট আর সহ্য হয় না। তুমি বুঝেসুঝে নাও, আমি কাশী চলে যাই।

একবার তো রওনা হয়েছিলে, ফিরে এলে কেন? এবারে আর একটা কিছু হবে। রক্তদহ ছেড়ে পালানো তোমার অদৃষ্টে নেই, বলে দিলাম।

শুনছ ভাদুড়ী মেয়ের কথা।

ভাদুড়ী মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, কিছু মনে করবেন না কর্তামা, দিদিমণি তো ঠিক কথাই বলছেন, বলছেন যার দায় তাকেই বইতে হয়। কারণ মা শাস্ত্রেই বলেছে—

শাস্ত্রীয় রহস্য ভাদুড়ীর কণ্ঠনিঃসৃত হওয়ার আগেই বাইরে নদীতীরে একসঙ্গে বন্দুকের তিন-চারবার আওয়াজ শোনা গেল। সকলে সচকিত হয়ে উঠল। এমন সময়ে বজরার ছাদের উপর থেকে চহরজা সিংএর অভয়বাণী উচ্চারিত হল, মহারানী মা, ডরিয়ে মৎ, হাম বন্দুক লে কর তৈয়ার হ্যায়।

কর্ত্রী বললেন, ভাদুড়ী, চহরজা সিং যখন অভয় দিচ্ছে, ভয়ের কারণ নেই।

ভাদুড়ী বজরার বাইরে আসতেই চহরজা বলে উঠল, ভাদুড়ীজি, দেখিয়ে হাম খাড়া তৈয়ার হ্যায়। সঙ্কটকালে চহরজা মাতৃভাষার শরণ নেয়, অন্য সময়ে বাংলা।

ভাদুড়ী বলল, এখন তো খাড়া দেখছি। কতক্ষণ খাড়া থাকবে তাই ভাবছি।

তারা দেখতে পেল ডানদিকে নদীতীরে চারজন ঘোড়সোয়ার ছুটে আসছে, বজরাখানা তাদের চোখে পড়েছে, হাতে তাদের মশালের আলো। ওরা আরও কাছে এসে পড়েছে—একেবারে কানের পাল্লার মধ্যে।

দলের একজন হেঁকে বলল, বজরার ছাদে ও কে, চহরজা ভাই নাকি, খামকা গুলি ছুঁড়ে দরকারী গুলির বাজে খরচ করো না, আমরা রাজবাড়ির পাইক।

তাই বলো, উমীর সর্দার। ঘোড়ার চাল দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, এ উমীর সর্দার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

চহরজা সিংএর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ভাদুড়ীমশাই আরম্ভ করলেন, তা তোমরা সন্ধ্যাবেলা ঘোড়া ছুটিয়ে চললে কোথায়?

আজ্ঞে আপনাদেরই সন্ধানে। আজ বাদল সর্দারের মুখে কর্তামা ফিরছেন খবর পেয়ে দেওয়ানজী বললেন, উমীর, তোমরা ক'জনে এগিয়ে গিয়ে দেখো কর্ত্রীর বজরা কতদূর?

বিপদের আশঙ্কা করেন নাকি দেওয়ানজী?

কেমন করে বলব নায়েবমশাই—দেওয়ানজী তো কোনো কথা ভেঙে বলবেন না, জেরা চলবে না, হুকুম হলে মানতে হবে, তাই চারজনে আমরা চলে এলাম।

আচ্ছা বেশ, তারপরে ওদিকের খবর কি, বিশেষ করে 'আড়াইকুড়ি' পরগণার।—আড়াইকুড়ি একটি নূতন খরিদা পরগণা।

সে-সব গিয়ে শুনবেন দেওয়ানজীর কাছে। কর্তামার তীর্থযাত্রার পরেই

প্রজারা বিদ্রুক করে বসে আছে, গাঁয়ে তশীলদার খাজনা আদায় করতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে এসেছে। পরগণার যে-সব সরকারী কাছারী ছিল পুড়ে গিয়েছে।

পুড়লো কেমন করে?

আপনা-আপনি কি পোড়ে—পুড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আমাদের কাছারী নয় —আশেপাশে অন্য যে-সব জমিদারের কাছারী ছিল তাও জ্বালিয়ে দিয়েছে।

তাই বুঝি তিনি ভয় পেয়ে বাদল সর্দারকে পাঠিয়েছিলেন?

ভয় পাওয়ার লোক বুঝি দেওয়ানজী, তবে মনিব উপস্থিত থাকলে মনে বল-ভরসা পান।

এই তো কর্ত্রী এসে পড়েছেন, এবার তোমরা গাঁয়ে ফিরে গিয়ে খবর দাওগে।

সেই ভালো—বলে উদ্দেশ্যে সেলাম জানিয়ে তারা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল গাঁয়ের দিকে।

বজরার ভিতরে বসে উত্তর-প্রত্যুত্তরে সব কথাই শোনা যাচ্ছিল। কর্ত্রী সমস্তই অবহিত হলেন, তারপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এসব শাসন করা কি এখন আমার আর সাধ্যে কুলোয়, এক সময়ে ছিল বটে তখন করেওছি।

বৃন্দাবনী বলল, তোমার একটি পুত্রসন্তান থাকলে তার হাতে জমিদারির ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে পথ চলতে পারতে।

এক এক সময় মনে হয়, চন্দনী আমার মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হত, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতাম।

মেয়ে তো আর হঠাৎ ছেলে হতে পারে না, তবে একটা করিতকর্মা জামাই হলেও চলত, ঐ কুঠীর বাবু তোমার যোগ্য জামাই হত।

সত্যি কথা বলছি বৃন্দাবনী, আমারও মনে হয়েছিল, কিন্তু—

পাশেই বসেছিল চন্দনী, বলল, কিন্তু আবার কি, তোমরা সকলে মিলে আমার হাত পা বেঁধে ঐ বিলের ঘোলা জলের মধ্যে ফেলে দাও, তোমারও জ্বালা জুড়োক, আমারও।

আমি কি ঐ কথা বলেছি বৃন্দাবনী, তুমিই বল।

হ্যাঁ মা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ কথাই বলেছ।

শোনো একবার বৃন্দাবনী।

শুনছি এবং দেখছি, সবই বয়সের দোষ মা, বয়সের দোষ। আমাদের বৃন্দাবনের শ্রীমতীও ঐরকম কথা বলত।

যাও তোমরা বৃন্দাবনের শ্রীমতীকে নিয়েই থাক, আমি চললাম।

কর্ত্রী শুধালেন, কোথায় ?

ভয় নেই, জলের মধ্যে নয়, ছাদের উপরে।

এই বলে সে ছাদের উপরে গিয়ে বসল।

গিয়ে বসতেই কেন জানি তার মনে পড়ল দীপ্তিনারায়ণের কথা। সে বুঝে পায় না কেন সময়ে অসময়ে ঐ লোকটাকে তার মনে পড়ে। কখনো মনে পড়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, কখনো মনে পড়ে কৌতুক-করুণ তার চোখ দুটি। এই অকারণ মনে পড়বার দায়িত্ব তার উপরে চাপিয়ে রুষ্ট হয়ে উঠল চন্দনী। নাঃ, কিছুতেই তার কথা আর ভাববে না বলে তাকালো আকাশের দিকে, দেখতে পেল দূরে গাছপালার মাথার উপরে আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে, বুঝল চন্দ্রোদয় হচ্ছে। মনে পড়ল এই রকম রাঙা আকাশ একদিন দেখেছিল ধুলোউড়ির কুঠির ছাদ থেকে—সে বলে উঠল, চাঁদ উঠছে।

চাঁদ কোথায় দিদি, এ যে কৃষ্ণপক্ষ—ভাদুড়ীর কণ্ঠস্বর। সে যে পাশে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ্য করেনি চন্দনী। সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, চাঁদ নয় তবে কি ?

শুধু একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ উচ্চারণ করল ভাদুড়ী—আগুন।

আগুন ! কেন ? কারা লাগাল ?

এতদূর থেকে কেমন করে বলব দিদি।

যাই মাকে ডেকে নিয়ে আসি।

কর্ত্রী ছাদের উপরে এসে আগুনের আভা দেখে বলল, ভাদুড়ী, এ মনে হচ্ছে আডাইকুড়ি পরগণার আগুন।

না কর্তামা, সে তো অনেক দূরের পথ, এখান থেকে দেখা পাওয়ার কথা নয়।

তবে কি আরো কাছে কোথাও ?

তাই তো মনে হচ্ছে।

এমন সময়ে সমস্ত সংশয় অনুমানের অবসান ঘটিয়ে বাঁশের গিরে ফাটবার শব্দ শ্রুত হল।

কোন্ হ্যায় ?

ভাদুড়ী বলল, বোধ হচ্ছে নাতুড়ে।

তবে তো কাছে।

ওদের সাহস বেড়ে গিয়েছে, শুনেছে যে আপনি তীর্থযাত্রা করেছেন।

দেওয়ানজী আছেন।

এবারে আপনিও এলেন।

ঐ তো গাঁয়ের ঘাট না?

হ্যাঁ, অনেক লোক এসেছে, খবর পেয়েছে আপনার বজরা এসেছে।

মা ও মেয়ের মনে যুগপৎ দীপ্তিনারায়ণের কথা মনে পড়ল—বিপদকালে ভিন্নমুখী চিন্তা একমুখে প্রবাহিত হয়।

ডঙ্কা মেরে বজরা ঘাটে এসে ভিড়লো।

৬

বাংলাদেশের জমিদার ও প্রজা দুই-ই ধড়িবাজ, একজন স্বভাবে অপরজন অভাবে। নলখাগড়ার বনে বিস্তৃত কর্দম শয্যায় সুখাসনে গড়াতে গড়াতে অতিকায় গণ্ডারের মতো জমিদার চিন্তা করে আর কোন্ কোন্ আব্ওয়াব চাপানো যায় প্রজার উপরে। আর প্রজা সন্ধ্যাবেলায় কল্কেতে সুখটান দিতে দিতে চিন্তা করে এবার কোন্ অজুহাতে জমিদারের খাজনা অস্বীকার করা যায়। জমিদার ভাবে উক্ত জমিকে আউওল জমি বলে চালিয়ে দেবে, প্রজা ভাবে জমির উপরে সব দোষ চাপিয়ে খাজনা মাপ করবার জন্যে কান্নাকাটি করবে। জমিদার ভাবে খাতাপত্রে একটা জমিকে পলাতকা দেখিয়ে মালিককে উৎখাত করবে, প্রজা ভাবে তিন সালের খাজনা বাকি ফেলে পাইক আনবার উপক্রম হলে পাশের জমিদারের মাটিতে উঠে যাবে। জমিদারের পক্ষে আছে পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল, প্রজার পক্ষে আছে খরা ঝরা বন্যা। দীর্ঘকালের অভ্যাসে দুই পক্ষে বেশ বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে, তাই বলছি জমিদার ও প্রজা দুই পক্ষই ধড়িবাজ।

বাংলাদেশের সব জমিদার, সব প্রজা অবশ্য এমন নয়। বড় জমিদার প্রায় এরূপ নয়, পুঁটিমাছের পেট টিপবার প্রয়োজন তাদের হয় না। তবে তাদের মফস্বলের কর্মচারী জমিদারের নামে অত্যাচার করে থাকে। ছোট জমিদার ও উঠতি জমিদার চরম অত্যাচারী। বনেদী জমিদারে আর মাটিতে আর প্রজাতে এক রকম সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। একটা প্রজা উঠে গেলে তাদের অপমান, তাদের কাছে গিয়ে ধরে পড়লেই খাজনা মাপ হয়, কাজেই তাদের জমিদারিতে প্রজা বিক্ষুব্ধ কারণ ঘটে না। উঠতি জমিদার যে এক-আধখানা পরগণা ছলে বলে কৌশলে কিনেছে তার কাছে জমিদারি, জমি, প্রজা সমস্তই নূতন। জমিদার ছোটই হোক আর বড়ই হোক নূতন খরিদা পরগণা জমিদারপক্ষ থেকে অত্যাচার

অনাচার আর প্রজাপক্ষ থেকে প্রজার শেষ অস্ত্র খাজনা বন্ধ অর্থাৎ 'বিদ্রু'।

জোড়াদীঘির বিশাল জমিদারি, দশআনি ছ'আনি ভাগ হয়ে যাওয়ার পরেও মোট আয়তন সমান থাকল। আর তার পত্তনের ইতিহাস কোম্পানীর আমলের সীমানা পেরিয়ে বাদশাহী আমলকে স্পর্শ করেছে। কোনো বস্তু পুরনো হলে তার মর্যাদা বাড়ে। কেন বাড়ে জানি না, মৃত্যু যখন চরম নিয়তি সেই মৃত্যুকে প্রতি-স্পর্ধা করবার ক্ষমতাই হয়তো তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। জমিদারির প্রথম মালিকের বিবরণ আজ ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গিয়েছে, না, সে পাতাখানাই আজ অবলুপ্ত। তারপর থেকে মৃত্যুর পর্যায়ক্রমে মালিকের পরে নূতন মালিক এসেছে, দেখেছে সেই গ্রাম, সেই জমিজমা, সেই পরগণা, ওটাকে তারা একটা ত্রৈমাসিক নিয়ম বলে ধরে নিয়েছিল, জমিদার ও প্রজা দুই পক্ষই, কাজেই সে জমিদারিতে কখনো 'বিদ্রু' ঘটেনি। তার পরে বহুকাল পরে উদয়নারায়ণের পৌত্র দর্পনারায়ণের আমলে ছ'আনির বড় বড় কয়েকখানা পরগণা হস্তান্তর হয়ে গেল—সে আঘাত সইলো না বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের, তিনি গত হলেন। গত হল দর্পনারায়ণের পত্নী বনমালা। তখন প্রায় হৃতসর্বস্ব দর্পনারায়ণ শিশুপুত্রকে নিয়ে চলনবিলের পশ্চিমপাড়ে ধুলোউড়ির কুঠিতে এসে আশ্রয় নিলেন।

রক্তদহের হঠাৎ-জমিদার পরন্তপ রায় বলে উঠল, দর্পনারায়ণের আডাইকুড়ি আর পোনাগাঁতি পরগণা দু'খানা আমি কিনব।

ইন্দ্রাণী বলল, সবগুলো পরগণা কেনো না কেন।

পরন্তপ মদের ঝোঁকে ছিল, ইন্দ্রাণীর কথাটা বুঝল কিন্তু যে স্বরে কথাটা উচ্চারিত হয়েছিল বুঝল না। বুঝল সেগুলো আগেই নীলামে বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

এ দুটো বুঝি তোমার জন্যে ছিল?

তাই তো মনে হচ্ছে।

আমি বলি কি জানো—ও সম্পত্তি কিনো না।

খাড়া হয়ে উঠে বসে পরন্তপ বলল, কেন বল তো?

কেন জানি না, তবে না কেনাই ভালো।

সুরা-বিস্ফারিত নেত্রে বলল, আমি জানি —ও তোমার আশনাই-এর লোক ছিল।

ইন্দ্রাণীর পৌরুষ জাগ্রত হয়ে উঠল, বলল, রক্তদহের জমিদারবাড়িতে এমন কথা কখনো উচ্চারিত হয়নি।

সুরা-বিকল হাসি হেসে পরন্তপ বলল—ওরে আমার সতী রে, তবু যদি না জানতাম। তার পরে উত্তরের অপেক্ষা না করে উচ্চস্বরে ডাক দিল—দেওয়ান!

বাধা দিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, দেওয়ান নয়, হয় দেওয়ানজি, নয় দেওয়ান জেঠা।

ব্যঙ্গের সুরে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে দেওয়ানজি বলতে পার, দেওয়ান জেঠা বলতে পার, এমন কি দেওয়ান বাবা বললেই বা ঠেকায় কে, আমি দেওয়ান বললে লোকে কি বলে জান, বলে নীলবর্ণ শৃগাল—এই বলে হেসে উঠল।

এখানে একটা প্রসঙ্গ আছে। সে-সময়ে এদিকে অনেক নীলকুঠি ছিল, নিকটবর্তী আতাইকুলা গ্রামে একটি নীলকুঠি ছিল। কুঠির সাহেবরা অত্যাচার করত, সাহেবদের চেয়ে বেশি অত্যাচার করত দেশী দেওয়ান গোমস্তা কারকুন পাইকরা। অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে একদিন প্রজারা ক্ষেপে উঠে কুঠিটা দিল পুড়িয়ে। হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে দেওয়ানকে নিয়ে ফেলে দিল নীল ভেজাবার হাওজে। দেওয়ান যখন উঠে দাঁড়াল সর্বাঙ্গ নীলবর্ণ। সংস্কৃতজ্ঞরা বলত নীলবর্ণ শৃগাল। আর সাধারণ লোকে বলত নীল গোসাঁই। নীলকুঠির চাকুরি ছেড়ে দিল, কিন্তু নামটি ছাড়ল না তাকে। সে এসে রক্তদহের এ স্টেটে চাকুরি নিল। এই লোকটি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ছিল, তবে প্রজাদেরও তো কম যন্ত্রণা হয়নি। প্রজাদের খ্যাতি ছিল বলেই তার সহজে চাকুরি জুটে গেল।

এই দেওয়ান—কর্কশ স্বর অপমানে কণ্টকিত।

ইন্দ্রাণী বুঝল প্রতিবাদ করলে অপমানের মাত্রা বাড়বে, চুপ করে থাকল।

বাবুজি শুনতে পাইনি বলে এসে দাঁড়াল দেওয়ান রামজয় গোস্বামী।

শুনতে পাওনি, মনে হচ্ছে চোখেও দেখতে পাও না। তার পরে ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, এইসব বুড়োহাবড়াগুলোকে কতদিন আর পুষবো। ছাড়িয়ে দেব ভাবছি।

ইন্দ্রাণী শুধু বলল, না, তা পারবে না।

তার নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠস্বর শুনলে একটা কাঠের পুতুলও বুঝতে পারে তর্জন-গর্জন যেই করুক ডিক্রি ডিসমিসের কর্তা কে।

সিন্দুকের চাবি কোথায়?

কোন্ সিন্দুক বাবুজি?

ইন্দ্রাণীর অলঙ্কারের সিন্দুক, আর এ বাড়ির সমস্ত অলঙ্কারের সিন্দুক।…কি,

মনে পড়ছে না ? চোখে দেখতে পাও না, কানে শুনতে পাও না, আবার দেখছি স্মৃতিভ্রংশও হয়েছে—অথচ তোমাকে ছাড়বার উপায় নেই, নীলকুঠির দত্তা পেনসনটা আমাকেই দিয়ে যেতে হবে দেখছি।

দেওয়ানজি অসহায় জিজ্ঞাসু ভাবে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালো।

চাবি দিয়ে দিন, কিন্তু মনে রেখো, আমার সমস্ত অলঙ্কার নিতে পার, কিন্তু আমার মায়ের অলঙ্কার স্পর্শ করো না, যা নেবে তাতেই তোমার নীলামের ডাকের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম—বলে উঠে পড়ল পরন্তপ, ক্রোধ ব্যঙ্গ বিরক্তি ধিক্কারের মোয়া পাকানো ঐ শব্দ দুটি, এমন মোয়া সে মাঝে মাঝে নিক্ষেপ করত।

এ অনেকদিন আগেকার কথা, তার পরে পরন্তপের সঙ্গে এ বাড়ির সম্বন্ধ চুকে গিয়েছে, ঐ পরগণা কেনার পরেই বা সত্য কথা বলতে গেলে ঐ পরগণা কিনবার ফলেই ইন্দ্রাণীর জীবনের ও সংসারের শান্তি গেল, স্বস্তি গেল, পরন্তপ তো আগেই গিয়েছিল পরলোকে।

বাইরে যেতে যেতে ফিরে এসে স্থাণুবৎ ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, অলঙ্কার গেল বলে দুঃখ করো না মাইরি, ওগুলো দিয়ে আশনাইয়ের মানুষের সম্পত্তি ঘরে আনলে আবার অবশেষে হয়তো তাকেই ফিরিয়ে দেবে—কেবল আমার পটোল তুলবার মাত্র অপেক্ষা।

বউমা, তারপরে সব ভালো তো ?

দেওয়ান জেঠা বসুন—নারায়ণের কৃপায় আছি একরকম।

আমি তো খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম, একে আশ্বিনের ঝড়, তার উপর আবার তুমি এগোতেই প্রজারা বিদ্রু করল, কারও সঙ্গে যে পরামর্শ করব এমন লোকই নাই, ভাদুড়ীও গিয়েছে তোমাদের সঙ্গে।

এদের মধ্যে সম্বন্ধ মনির আর ভৃত্যের নয়, এক সময়ে হয়তো তাই ছিল। নীরস পাথরের গায়ে মাটি জমে জমে গাছ গজিয়ে সরস করে তোলে, এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। প্রথমে দেওয়ান ইন্দ্রাণীকে খুকি বলত, তারপরে একটু বয়স হলে ডাকত নাম ধরে, অবশেষে পরন্তপ রায়কে বিয়ে করে এই বাড়িতেই যখন রয়ে গেল তখন খুকি আর ইন্দ্রাণী হল বউমা। বাপের বয়সী দেওয়ানকে গোড়া থেকেই দেওয়ান জেঠা বলত ইন্দ্রাণী। দুঃখের সংসারে ইন্দ্রাণীর একমাত্র নির্ভর ছিল এই দেওয়ান।

যাক আশ্বিনের ঝড় তো মিটে গেল—

বাক্য সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে দেওয়ানজি বলল, অমনি মেটেনি মা, ধুলোউড়ি গাঁয়ের লোকে বজরা টেনে তুলল, না হলে কি হত ভাবতেও ভয় হয়। তারপরে আশ্রয় দিলেন কুঠির বাবুজি।

শুধু আশ্রয় নয় দেওয়ান জেঠা, মনে হল ওটাই আমার বাড়িঘর, আর মালিক হচ্ছে নিতান্ত উটকো লোক।

বৃন্দাবনী মাসীর মুখে সব শুনেছি মা। মাসি যদি পঞ্চানন হতেন তবু দীপ্তি-নারায়ণবাবুর প্রশংসা বলে শেষ করতে পারতেন না।

সত্যি অমন ছেলে হয় না।

চন্দনীকে ক্ষেপাবার জন্যে বৃন্দাবনী মাঝে মাঝে বলত, দাঁড়া, ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব—থাকিস এই বিলের ধারে পড়ে।

এমন কি মন্দ কথা বলে বউমা?

হত এরকম একটি জামাই, এসব দায় দফা বিক্রসুদ্ধ তার হাতে তুলে দিয়ে শ্রীধাম যেতাম।

আর আমিই বুঝি এখানে পড়ে থাকতাম! আমার বয়সটার তো খেয়াল রাখো বউমা।

তোমার লাঠি ধরা দেখলে বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না।

সে কি জানো বউমা, সে হচ্ছে বিকারের রুগীর আস্ফালন। চল তো দেখি।

এত তাড়া কিসের, কিন্তু তার যে কিছু বলতে কিছু নাই।

নাই হবে। বাড়ি ঘর জমিদারি নিয়ে কে কবে পেট থেকে পড়ে। তোমার জমিদারি তোমার মেয়ের হবে—অর্থাৎ তোমার জামাইয়ের হবে।

আচ্ছা সে পরে ভাবা যাবে, এখন এদিকের কথা শুনি।

খবর তো পুরাতন। কাল রাতে লোকে এসে নাতুড়ে গাঁয়ের বেবাক বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে।

তাদের অপরাধ?

তারা খাজনা বন্ধ করতে অস্বীকার করেছিল।

এরা সব—

হাঁ মা, আড়াইকুড়ি পরগণার লোক।

সে তো অনেক দূরের পথ।

দুজনে কি পথের দূরত্ব বিচার করে !

নাতুড়ের লোকে কি করল ?

গায়ে আগুন লাগলে যা করে তাই করল, হাউমাউ করে কেঁদেকেটে বিছানা তোশক ঘটিবাটি কাচ্চাবাচ্চা টেনে নিয়ে এসে জড়ো করল। কে আগুন লাগাল, কেন লাগাল, কে প্রথমে দেখল সেই বিতণ্ডা শুরু করে দিল।

আর আপনার লোকে ?

রাজবাড়ির লোক যেতে যেতে সব সাফ। তারা কালকে আসবে জানিয়েছে।

দেওয়ানজি চলে যেতে প্রবেশ করল বৃন্দাবনী মাসী।

ইন্দ্রাণী বলল, মাসী ছিলে কোথায়, তোমাকে যে খুঁজছিলাম।

দিদির বাড়িতে গিয়েছিলাম সত্যনারায়ণ পূজার ব্যবস্থা করে দিতে, মেয়েরা সব ছেলেমানুষ, কিছু জানে না তারা।

হল সব ব্যবস্থা ?

কর্তামা, ব্যবস্থা আর কি, এ কি রাজবাড়ির পুজো—নমো নমো করে হবে। হল এক রকম।

নমো নমো করে যদি তবে এত দেরি করলি কেন ?

সে এক কাণ্ড কর্তামা। কালকে শুনি পাশের ঘরে মেয়েদের বৃন্দাবন যাত্রার বিবরণ বলছে চন্দনী।

কি বলছে ?

ওদের কথাবার্তার ভাবে বুঝলাম তারা ধরেছে বৃন্দাবন যাতায়াত ছ'মাসের পথ, তোমরা এক মাসের মধ্যে ফিরলে কেমন করে।

চন্দনী বলল, আমরা কি নৌকোয় গিয়েছিলাম ?

তবে ?

গিয়েছিলাম কলের গাড়িতে।

সে আবার কি রকম গাড়ি ?

সে তো গাড়ি নয়—পর পর অনেকগুলো গাড়ি লোহার শিকলে বাঁধা, এক একখানা গাড়ি যেন এক একটা ঘর, বসবার কি ব্যবস্থা, গদিআঁটা কুশি, বসো, শোও, ঘুমোও, কেউ বারণ করবে না।

সকলে বিস্ময়ে বলে উঠল, এমন তো জন্মে শুনিনি।

আর একজন বলল, সেই ঘরের মতো গাড়িগুলো চলে কি করে ?

চলে কি আর আপনি ! সমুখ দিকে শিকল দিয়ে দশ-বারোটা হাতী জুড়ে দেয়, প্রত্যেকটার উপরে একজন করে মাহুত। তারা যেমনি ইশারা করে অমনি ঝড়ের বেগে দৌড়তে থাকে, দেখতে দেখতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বৃন্দাবন।

আমি এ ঘর থেকে কান পেতে আছি, হাসিতে দম ফেটে যাচ্ছে, হাসবার উপায় নাই। ও ঘরে সমস্ত নিঃশব্দ। বুঝলাম হাতাতে টানা গাড়ির কথা শুনে কারো মুখে আর রা নেই। কিছুক্ষণ পরে ও ঘর থেকে একজন বলল, তার পরে ?

তার পরে তো আর নাই—বৃন্দাবনে পৌঁছে গিয়েছি। মাহুতরা হাতীগুলোকে খুলে দিয়ে যমুনায় নিয়ে গেল স্নান করাতে।

একজন মেয়ে শুধালো, আচ্ছা ভাই, যমুনা নদীটা কি রকম ? নদীতে জল বটে তো ?

চন্দনী হেসে উঠে বলল, কি যে বলিস ! নদীতে জল ছাড়া আর কি থাকবে, তবে সে জল আমাদের নদীর মতো ঘোলা নয়—কালো, ঘোর কালো।

ওদের তবে তো খুব মজা—কালী কিনতে হয় না।

মজাই তো, যার যখন দরকার দোয়াত ভরে নিয়ে যায়।

তুমি আনোনি ভাই ?

চন্দনী হটবার নয়। বললে, এনেছি বইকি, এক বোতল ভরে নিয়ে এসেছি, তোমদের দরকার হলে যেও, দেব।

অনেকে বলল, নিশ্চয় দেবে তো ?

চন্দনী মনে মনে স্থির করল, কাছারী থেকে এক বোতল কালি এনে লুকিয়ে রেখে দিতে হবে।

একজন হতাশ হয়ে বলল, লেখাপড়া জানি না, কালি দিয়ে কি হবে ?

কেন, তোর ঠাকুরমার পাকা চুল কালো করে দিবি !

সকলে হেসে উঠল।

অন্য একজন বলল, আমার আবার দিদিমার মাথায় বেবাক টাক।

ওসব থাক। এবারে বল্ ফিরলি কি করে ?

তার আগে শোন কি হল।

বল বল।

বৃন্দাবনী মাসী মাটিতে নেমেই গড়াগড়ি দিতে লাগল।

সেই ধুলোর মধ্যে !

ধুলো বলো না, ধুলো বলো না, ওকে বলতে হবে ব্রজের রেণু।

তারপরে ?

তারপরে তাকে সামলে রাখা দায় হল, কখনও যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কখনও তমাল গাছ জড়িয়ে ধরে, কখনও কালো রঙের লোক দেখতে পেলে ঐ ঐ আমার ননীচোরা বলে ছুটে যায়। এদিকে মাহুতরা তাগিদ দিচ্ছে, কর্তামা গাড়ি ছাড়বার সময় হল যে! শুনে মাসী বলে, কর্তামা আমাকে এখানে রেখে যাও, তোমরা যাও দেশে ফিরে।

এখানে খাবি কি?

বৃন্দাবনী বলে, খাদ্যের অভাব কি! এখানকার ফুলে মধু ফলে মধু, জলে মধু স্থলে মধু আর মধু ঐ শ্রীঅঙ্গের বাসে।

তখন ?

তখন আর কি, তাকে জোর করে সকলে মিলে ঠেলেঠুলে নিয়ে গাড়িতে তোলা হল। ভাগ্যিস পাণ্ডারা সাহায্য করেছিল!

কেন, তাদের এত উৎসাহ কেন?

তারা বলল, এমন রাইউন্মাদিনী এখানে থাকলে তাদের ব্যবসা মাটি হবে।

তখন সেই দশ হাতীতে টানা গাড়ি আবার গড়গড় করে ছুটে এসে একদিনের মধ্যে লাগল পদ্মার ঘাটে। তারপরে বজরায়।

তারপরে? শুধালেন কর্ত্রী।

তারপরে আর শুনবার জন্য অপেক্ষা করলাম না, আসর ভাঙে ভাঙে দেখে পালিয়ে এলাম খিড়কি দরজা দিয়ে।

কর্ত্রী বললেন, আমি ভাবছি এতক্ষণ কি করে তুমি না হেসে থাকতে পারলে!

যা বলেছ মা, সে কি আমার সাধ্যে হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনদশা, কুরুসভায় তাঁর নিগ্রহ, দুর্বাশা কর্তৃক অভিশাপ এইসব স্মরণ করে ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন জপতে জপতে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করলাম।

তারপরে আবার সে আরম্ভ করল, এ কি হয়েছে জানো কর্তামা, ঐ যে ছড়ায় আছে না, 'হাপায় গিছিল হপার মা, দেখে এলো বাঘের পা, সে বলল মা শন্নি, মরিবর্তি বাঘ দেখনি।' হপার মায়ের বাঘের পায়ের ছাপ দেখেই বাঘ দেখা হয়েছিল, আমাদের চন্দনীরও সেই রকম দু'খানা রেল লাইন দেখেই রেলগাড়ি দেখা হল, তারপরে কিনা—এমন সময়ে প্রসন্ন মুখে চন্দনীর প্রবেশ।

কোথায় গিয়েছিলি?

দিদির বাড়িতে মা।

বৃন্দাবনের গল্প শুনিয়ে এলি বুঝি?

শ্রীধাম দর্শন কি সকলের ভাগ্যে থাকে, এমন যে ভক্ত মাসীর ভাগ্যে যখন দর্শন ঘটলো না, আমরা দেখব কি করে?

কর্ত্রী আরও কিছু জানাতে যাচ্ছিল, বৃন্দাবনী চোখ টিপে মিনতি করল যেন না বলে।

ব্যাপারটা আপাততঃ এখানেই মিটে গেল।

দুপুরবেলা আহারান্তে একটু গড়িয়ে নেবে ভেবে ইন্দ্রাণী শয়ন করল। ঘুমের বদলে এলো দুশ্চিন্তার স্রোত, ভাবল বিধাতার তো দোষ নাই। দোষ তার ভাগ্যের। বিধাতা রক্তদহের জমিদারবাড়িতে লাগিয়েছিলেন অমৃতফলের গাছ, তার ভাগ্যে ফলল বিষফল। ধনে বংশে রূপে গুণে ইন্দ্রাণীর তুলনা ছিল না। তারপরে যখন জোড়াদীঘিতে বিয়ের সম্বন্ধ এলো সবাই ভাবল, ইন্দ্রাণীও, এবার ষোল আনার উপরে আঠারো আনা। ওখানেই মানুষে ভুল করে। ষোল আনার দাবী পর্যন্ত বিধাতা সহ্য করেন, অতিরিক্ত দু'আনার মধ্যেই বিষফলের বীজ থাকে। হলও তাই আর তা অচিরে। জোড়াদীঘির জমিদারপুত্র তাকে অগ্রাহ্য করে অন্যত্র বিয়ে করল। এই অপমানের প্রতিশোধ দানের ইচ্ছা থেকে শুরু হয়ে গেল সর্বনাশের ধারা। বীরপুরুষ ভেবে চাঁপার প্ররোচনায় যাকে বিবাহ করল ইন্দ্রাণী দেখা গেল সে চরম পাষণ্ড, কোন্ দোষ তার না ছিল, সর্বোপরি সে পরদারনিরত আর সেই পরদার কিনা চাঁপা। তার আবাল্য সহচরী। তাদের মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল রক্তদহের জমিদারবাড়ির দেউড়ি, চিরদিনের জন্য। বহুকাল পরে লোকমুখে শুনেছিল চাঁপার গর্ভে এক মেয়ে হয়েছিল। মাঝে মাঝে উড়ো খবর কানে আসত পরন্তপ রায় নাকি পরশুরামের দলের সর্দার হয়েছে। এ অঞ্চলের সবাই জানত ঐ নামে একটা ডাকাতের দল আছে। অবশেষে একদিন খবর এলো পরন্তপ রায় গত হয়েছে। তখন ইন্দ্রাণী, যে ইন্দ্রাণী পৃথিবীর মানুষ নয় স্বর্গের মানবী, বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদল। ইন্দ্রাণীর তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা উচিত ছিল। সে কিনা দুদিন ঘর বন্ধ করে পড়ে থেকে অস্নাত অভুক্ত অনিদ্র কাঁদল আর কাঁদল, দুঃখীর শেষ অস্ত্র চোখের জল। ঐটুকু কৃপা বিধাতা করেছেন মানুষকে।

স্বামী যতই পাথর হোক, পাপিষ্ঠ হোক, পাষণ্ড অত্যাচারী মদ্যপ পরদারনিরত হোক, মৃত্যু হওয়া মাত্র তার সম্বন্ধে পত্নীর মনে ভাবের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে যায়। আর যতই কাল যায় তার দোষগুলি ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে যায়

—বেরিয়ে পড়ে স্বামীর নিষ্কলঙ্ক আদর্শ মূর্তি। এমন কখনো কেউ দেখবে না যে, নিতান্ত জঘন্য সর্বপাপাশয় স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী হাপুসনয়নে না কেঁদে থাকল। ইন্দ্রাণী দুঃসংবাদ পাওয়ার দিনে কেঁদেছিল, আজও কাঁদল। এক হাতে ধরে মারা ছাড়া বাক্যে ব্যবহারে ঘটনায় সর্বপ্রকারে লাঞ্ছিত করেছে পরন্তপ তবু সেদিন কেঁদেছিল; আজও কাঁদল।

নানাবিধ দুশ্চিন্তার নাগরদোলায় দুলতে দুলতে ক্ষণকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল ইন্দ্রাণী, এমন সময়ে বৃন্দাবনীর ডাকে জেগে উঠল।

কর্তামা ঘুমিয়েছিলে?

ঘুমোইনি মাসী, একটুখানি কেবল ঢুল এসেছিল, কি খবর?

এমন কিছু নয়, তবে পাড়ার মেয়েরা এসে অনেকক্ষণ বসে আছে। আমি বললাম তোমরা বসো, আমি জানিয়ে আসি কর্তামাকে। তা তারা কিছুতেই দেবে না। বলে কর্তামায়ের কত কাজ কত চিন্তা তারপর যাতায়াতের ধকল, আহা ঘুমোন ঘুমোন, আমরা এখানেও বসে আছি বাড়িতেও বসে থাকতাম।

কর্ত্রী বাইরে এসে দেখলেন পাড়ার মেয়ে বউ ঝিয়ে আঙিনাটা ভরে গিয়েছে।

কর্ত্রীকে দেখে সকলে উঠে প্রণাম করল।

তোমাদের তো বড় কষ্ট হল।

কষ্ট আর কি মা, কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্যে। এতদূর গিয়েও শ্রীধাম পৌছনো হল না।

আমার আর কষ্ট কি, কষ্ট হয়েছে ওঁর, বলে দেখিয়ে দিল বৃন্দাবনীকে।

একজন বর্ষীয়সী বলল, ওঁকে আর কি জিজ্ঞাসা করব, ওঁর জগৎ তো বৃন্দাবনময়, পৌছনো না-পৌছনো সমান।

বৃন্দাবনী বলল, ও-সব তত্ত্বকথা তোমরা বুঝবে না, বোঝেন কর্তামা।

আমার ভাগ্য খারাপ, তোমাদের জন্য গোবিন্দজীর প্রসাদ আর ব্রজেশ্বরের চরণামৃত আনব ভেবেছিলাম, তা হল না।

ব্রজেশ্বরের কৃপা থাকলে এবারে হল না বলেই কি আর হবে না?

হবে হবে মা, ও বড় দুষ্টু ছেলে, মা যশোদাকে কত দুঃখই না দিয়েছে।

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল, আহা আহা, বসো মাসি বসো, তোমার মুখে শাস্তর বাক্য শুনে প্রাণটা জুড়োয়।

বৃন্দাবনী চেপে বসল। এতসংখ্যক জিজ্ঞাসু শ্রোতা কখনো তার ভাগ্যে জোটেনি।

এমন সময়ে দেওয়ানজি প্রবেশ করল, পরিবারভুক্ত এই বৃদ্ধের অন্দর মহলে অবাধ যাতায়াত ছিল।

বউমা বুঝি ব্যস্ত আছ!

ছিলাম না, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এবারে ব্যস্ত হতে হবে।

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে দেওয়ানজি বলল, ব্যস্ত হওয়ার মতোই কথা, খবর বড় ভালো নয়।

সেই নেতুড়ের আগুন লাগার ব্যাপার নাকি?

ও তো সামান্য ব্যাপার। এ খুব গুরুচরণ কাণ্ড।

কোন্ ব্যাকরণের নিয়মে না জানি দেওয়ানজি গুরুতরকে গুরুচরণ, প্রভৃতিকে প্রভৃত্তি বলে, এইরকম আরো কিছু কিছু আর্ষপ্রয়োগ আছে।

তারপরে বলল, কিন্তু এখানে হবে না মা, তোমাকে একবার একটু কষ্ট করে তোমার বৈঠকখানায় যেতে হবে।

খুব জরুরী মনে হচ্ছে দেওয়ান জেঠা!

খুবই—

দুজনের মধ্যে একান্তে নীচু স্বরে কথা হচ্ছিল।

ইন্দ্রাণী উঠানে উপবিষ্ট মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা বসে মাসীর কাছে পদাবলীর গান শোন।

মাসীকে গান গাইতে দ্বিতীয়বার বলতে হয় না, ইন্দ্রাণী অনুরোধ করবামাত্র মন্দিরা বের করে ঠুং করে আওয়াজ করল। তার কুড়োজালিতে মন্দিরা থাকে।

ইন্দ্রাণী জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করল, যেতে যেতে বল দেওয়ানজি কি এমন হয়েছে?

দেওয়ানজি বলল, পলোওয়ানার দল এসে নাতুড়ের লোকদের শাসিয়ে গিয়েছে।

বিস্মিত ইন্দ্রাণী বলল, পলোওয়ানার দল আবার কারা!

সে অনেক কথা, বৈঠকখানায় গিয়ে বসবে চল।

পলোওয়ানার দলের যে ব্যাখ্যা দেওয়ানজি করল তাতে কিছুই পরিষ্কার হল না ইন্দ্রাণীর কাছে, কারণ এই দলটি গত দু'তিন মাসের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে আর শুধু গজিয়ে ওঠা নয় চারদিকে ডালপালা মেলে আকাশের অনেকখানি জুড়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। এখন পলোওয়ানাদের নাম শুনলে

লোকে কাঁপে, গৃহস্থ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায়। একসময়ে যেমন আতঙ্ক ছিল বিশে ডাকাতের নামে প্রায় সেই রকম। ইন্দ্রাণী এ সমস্তর কিছুই জানত না, বলল কালকে না হয় নাতুড়ের প্রজাদের মুখেই সব শুনব, তাদের যা সর্বনাশ হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। আর কি করবে!

সুযোগের আশায় দীর্ঘকাল অপেক্ষমাণ ভাদুড়ী বলল, ঐ যে ছড়ায় আছে না, অল্প দোষে চুরি, বহুৎ দোষে পুড়ি, ওদের আর ঘরবাড়ি বলতে নেই। আর কি করবে!

ভাদুড়ী, তুমি আজ মাসাধিককাল গ্রামছাড়া, তুমি এর মধ্যে কথা বলতে এসো না। ঘরে বসে বসে শচীর বেটার নাম জপ করো।

শচীর বেটা কি বীরপুরুষ নয়? বলি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় করেছিল কে?

নির্বিকার মুখে দেওয়ানজি বলল, নন্দ ঘোষের বেটা। হল তো?

কিছুই হল না। বলল ভাদুড়ী।

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, অনেক হয়েছে।

শচীনন্দন ভক্তের রাগ তখনও কমেনি। বলল, কি এমন অনেক হয়েছে!

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, রাত অনেক হয়েছে, এখন শাস্ত্র আলোচনার সময় নয়। কালকে যখন নাতুড়ের ঘরপোড়া প্রজার দল আসবে তাদের বরঞ্চ শাস্ত্র শুনিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবেন। এখন থাক।

দেওয়ানজি বলল, বউমা যা বলেছ। রাত অনেক হয়েছে, আবার দু'দিনের ধকলে তোমার দেহটাও ক্লান্ত, তুমি অন্দরমহলে যাও।

ভাদুড়ী যেমন কট্টর বৈষ্ণব দেওয়ানজি তেমনি কট্টর শাক্ত, দুজনে শাস্ত্রীয় বিবাদ লেগেই আছে, ওরা এ বাড়ির রাহু আর কেতু।

ইন্দ্রাণী অন্দরমহলে গিয়ে শুনল বৃন্দাবনী গেয়ে চলেছে—আমার যেমন শ্যামা তেমনি যে শ্যাম।

৭

পরদিন ভোর না হতেই দলে দলে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো জমিদারবাড়িতে ঢুকে পড়ল, দেউড়ি খুলবার অবকাশ হয় না এমন অবস্থা। দেখতে দেখতে মস্ত আঙিনা কানায় কানায় ভরে উঠল। দেউড়ির চহরজা সিং প্রভৃতি বরকন্দাজের দল সামলাতে পারে না তাদের। ধীরেসুস্থে আসতে বললে

ওরা বলে, আরে বাপু হিন্দিমিন্দি কইয়ো না, অমন হিন্দি আমরাও বলতে পারি।

চহরজা সিং-এর ভাই বিষ্টু পাঁড়ে বলল, রাজবাড়িতে এসে এ কি বেয়াদবি!

আদবকায়দা আমরাও জানি, কিন্তু সে-সব ভুলিয়ে দিয়েছে পলোওয়ানাদের দল।

পলোয়ান শব্দটা নূতন বিধায় বুঝতে না পেরে বিষ্টু পাঁড়ে বলল, ক্যা পালোয়ান পালোয়ান বোলতা, হামভি পালোয়ান হ্যায়, আর আমার চাচাতো ভাই বুদ্ধু, সিং ছাপরা জিলার সবসে আচ্ছা পালোয়ান, পহিলা রদ্দামে গির পড যাতা---

এমন সময়ে দেওয়ানজি প্রবেশ করল। সকলে সম্মান জানাবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াল।

দেওয়ানজি বলল, তোমরা সবাই বসো।

একজন বলল, আর বসতে বাকি কি কর্তা, পরশু রাতে পলোওয়ানার দল এসে একেবারেই বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

দেখো বাপু আমার কাছে যেমন বলছ বলো, কিন্তু রানীমা এলে তাঁর সম্মুখে অমন সব হাবিজাবি কথা বলো না, সর্বদা মনে থাকে যেন কার সঙ্গে কথা বলছ।

আরে দেওয়ানজি মশাই, আমরা কি রাজবাড়িতে নূতন এসেছি, না রানীমার সঙ্গে নূতন কথা বলছি!

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বলল, তুমি আর কতদিন এ বাড়িতে এসেছ, এই তো সেদিন নীল গোঁসাই ছিলে, আজই না হয় দেওয়ানজি হয়েছ। ভাগ্যের জোর, ভাগ্যের জোর।

তাকে সমর্থন করে একজন বলে উঠল, নসিব নসিব, সবই নসিবের খেলা।

সেই বৃদ্ধটি বলল, আমরা আজ সাত পুরুষ এই জমিদারের প্রজা। বেশ মনে আছে দোলাই গায়ে দিয়ে বড়দাদার হাত ধরে কাছারীতে এসেছি, তখন তুমি কোথায় ছিলে ঠাকুর!

এবারে ভাদুড়ী বলল, ওসব বাজে কথা থাকুক, কি বলতে এসেছ বলো।

বলতাই তো আইছি, তবে তোমায় কবো কেন, মালিক আসুন তখন দেখে নিয়ো কি করে কথা বলতে হয়।

বেগতিক দেখে ভাদুড়ী চুপ করল। এমন সময়ে ইন্দ্রাণী প্রবেশ করলেন, পিছনে পাগড়ি চাপরাসধারী তিনজন পাইক। উঁচু একখানা পিতলের সিংহাসনের

উপরে এসে তিনি উপবিষ্ট হলেন। সকলে দেখল ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণীই বটে, স্বর্গের সিংহাসনেও তিনি বেমানান হবেন না। প্রতিমার মতো টানা টানা চোখ, অচপল স্নেহময় দৃষ্টি, বয়সটা প্রাণপণে ছুটেও কিছুতেই তাঁর নাগাল পাচ্ছে না।

তাঁকে প্রবেশ করতে দেখে সকলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। এখন ঐ দিব্যমূর্তির প্রভাবে বসতে ভুলে গেল। দেওয়ানজি হেঁকে বলল, রানীমা এসেছেন, তোমাদের কি আরজি তাঁকে বলো।

তখন এক কাণ্ড হল। চাদরের খুঁট থেকে, আঁচলের গিঁট থেকে, কারও বা ট্যাক থেকে টাকা বের হতে লাগল, জমা হতে লাগল ইন্দ্রাণীর পায়ের কাছে। সেই বৃদ্ধটি কপাল চাপড়ে বলে উঠল, যাঁকে মোহর দিলেও মন সন্তুষ্ট হয় না, আজ তাঁকে রুপোর টাকা দিতে হচ্ছে। নসিব, নসিব।

দেওয়ানজি বলল, তোমাদের কি নালিশ পেশ করো রানীমায়ের কাছে।

তখন সকলে একসঙ্গে আরম্ভ করল কথা বলতে, ফলে একজনের কথা অপরের কথায় চাপা পড়তে লাগল। কারও কথাই বোধগম্য হয় না। দেওয়ানজি বলল, তোমাদের মুরুব্বী কে, সে বলুক।

সকলেই মুরুব্বী, কাজেই বোধগম্যতার সমাধান হল না। তখন একটি চেনা লোকের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী বললেন, চমরু, তুমি এগিয়ে এসে বলো কি হয়েছে।

চমরু জমিদারবাড়িতে অনেকদিন কাজ করেছে। অনেক কঠিন কাজ, কিন্তু কখনও এমন কঠিন কাজের সম্মুখীন হয়নি। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সঙ্কট বুঝে তাকে কথা বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাণী বললেন, তোমাদের গাঁ পুড়ে গিয়েছে, কি বলো?

অকূলে কূল পেল চমরু সর্দার, বলল, মা-ঠাগরুন উমি লোকের গাঁ তো পুড়বার জন্যেই হয়েছে। কই রাজবাড়ি তো পোড়ে না।

ইন্দ্রাণী বলল, তেমন তেমন আগুন হলে পোড়ে বইকি, তাছাড়া ভূমিকম্পের কথাটা ভেবে দেখ।

ইন্দ্রাণীর কথায় উপস্থিত সকলের মাথা সায় দিল।

বাঙালী প্রজা জন্ম-পারিষদ, কোন্ কথায় মাথা কোন্ দিকে নাড়তে হবে তার ধাতস্থ।

চমরু আবার আরম্ভ করল, মা-ঠাগরুন, ঘরপুড়ির জন্যে প্রার্থনা ও তো বছরে একবার হয়েই থাকে। তখন জমিদারে খাজনা মাপ দেয়, নূতন ঘর তুলবার

জন্যে খরচ দেয়। প্রজার লাভের মধ্যে চিরকাল নূতন ঘরে বাস করে। ওর জন্যে আবার নূতন করে দরবার কি!

তবে দরবারটা কিসের জন্যে?

একজন অসহিষ্ণু শ্রোতা বলে উঠল, চমরু ভাই, তোমার আবোলতাবোল কথা কতক্ষণ শুনবেন রানীমা! না পারো তো বসো না, আমাকে বলতে দাও।

বেশ তো, তুমিই বলো। তা তোমার নামটি কি?

রানীমা আমার নাম তপন মাঝি।

তুমি বুঝি নৌকো বও?

বই আবার ঠেলিঙ ধরার সময়ে, আবার শীতকালে নৌকো তৈরি করি।

তবে তুমি খুব চৌকস লোক।

তপনের ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশী বলে উঠল, না রানীমা, ওর চেয়ে ভালো নৌকো বানায় বসন্ত মিস্ত্রি।

আরে সে তো শুধু বানাতেই পারে, না পারে নৌকো বাইতে না পারে নৌকো ঠেলতে।

আচ্ছা সব বুঝলাম, কিন্তু পলোওয়ানার দল যে বলছিলে সেটা কি বুঝিয়ে বলো।

ইন্দ্রাণীর প্রশ্ন শুনে সভা নিস্তব্ধ।

কি হল?

পলোওয়ানার দলের কথা শুনলে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়।

তবে লড়াই করবে কি করে?

অনেকে বলে উঠল, কে বলল লড়াই করব, নিশ্চয়ই কোনো দুশমনের কারসাজি!

তবে?

তবে আর কি, যা চিরকাল করে আসছি তাই করব, পালাব।

পালাবেই যদি, তবে আরজি করতে এসেছ কেন?

জানেন কি রানীমা, পালাই আর যাই করি একটা আরজি করলে মনে জোর পাওয়া যায়।

এতক্ষণে গাঁয়ের লোকের সম্বিৎ হল যে, নির্বোধ তপন মাঝি গাঁয়ের কুৎসা করছে। তারা বলে উঠল, রানীমা, ওকে থামতে আজ্ঞা করুন, ও লোকটা চিরকাল এইরকম গাঁয়ের নিন্দামন্দ করে থাকে।

ইন্দ্রাণী বলল, কয়েকজন লোক এসে তোমাদের বেবাক গাঁখানা পুড়িয়ে দিয়ে গেল, তোমাদের মধ্যে কি মরদ কেউ নেই?

মরদ নেই! কি বলছেন রানীমা? এ আত্রাসে (অঞ্চলে) যত যাত্রা-দল আছে ভীমসেন সাজবার জন্যে সকলে আমাদের গাঁ থেকে জোয়ান মরদ লোক নিয়ে যায়।

তবে তারা কি করছিল?

সাজা ভীম কি কাজের ভীম, তারা তুলোর গদা নিয়ে এ ওর মাথায় মারে, পলোওয়ানাদের সঙ্গে তারা পারবে কেন।

তাই বলে কি গাঁ-সুদ্ধ লোক পালাবে!

তাই তো দেখছি, শুধু আমাদের গাঁয়ের নয়, এ আত্রাসের সব গাঁয়ে—তবে দয়া করে একটা শোলোক শোনেন মা-ঠাকরু, গোপালনগর মস্ত গাঁ, জমিদার মহমদাররা। সে গাঁয়ের হাল লিখেছে কবিয়াল—

গোপালনগরের মজুমদাররা তারা কেঁদে ম'ল,
ডেমরা হতে বাজু সরদার বাড়ি লুটে নিল।
কাশী কাঁদে, মহেশ কাঁদে, কাঁদে তাহার খুড়ী
গোলাপের বেটা বিক্রু এসে লুটলো সকল বাড়ি
বিক্রু এসে লুটে নিল গাছে নাইকো পাতা।
জঙ্গলের মধ্যে লুঁকায়ে থাকি ফুচকি পারে (উঁকিমারা) মাথা।

ডেমরা তো বুঝলাম, বাজু সরদারটা আবার কে?

বাজু সরদার হচ্ছে মা-ঠাকরুন নিশান রায়ের সেনাপতি।

নিশান রায় আবার এলো কোথা থেকে?

ইন্দ্রাণীর প্রশ্নের উত্তর প্রজাদের না-জানবার সম্ভাবনায় দেওয়ানজি কাছে গিয়ে জানাল, লোকটার আসল নাম ঈশান রায়। লোকটি ছোটখাটো একজন জমিদার, আমাদেরও একটা পত্তনি রাখে। লোকটা অসাধারণ ধূর্ত, পাছে পলোওয়ানারা তার বিরুদ্ধেও বিক্রু করে তাই তাদের দলে যোগ দিয়েছে, প্রজারাও স্বীকার করে নিয়েছে। আর রুদ্রগাঁতি গাঁয়ের বিখ্যাত ঘোড়সোয়ার গঙ্গাপাল তার দলে যোগ দিয়েছে। লোকে বলে বিক্রু রাজার দেওয়ান।

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, বাঃ, বেশ জমে উঠেছে। রাজা হয়েছে, দেওয়ান হয়েছে, আবার সেনাপতিও হয়েছে, তা রাজধানীটি কোথায়? না, এখনো স্থির হয়নি!

এতক্ষণ নাতুড়ে গ্রামের লোকেরা কথা বলবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছিল,

তবে যেখানে মনিব ও দেওয়ানের মধ্যে কথা হচ্ছে সেখানে কথা বলতে সাহস পায়নি। এবারে ইন্দ্রাণীর বাক্যটা উত্তরের অপেক্ষা রাখে দেখে সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, রাজ্য নাই তার রাজধানী। যেদিন যে গাঁয়ে লুটিশ দেয় সে-ই রাজধানী।

লুটিশ দেয় তবে পাকড়াও করলে না কেন?

ওদের লুটিশ দেওয়ার ধরন আলাদা।

কি রকম?

একদিন সকালে উঠে বারুই সর্দারের গোয়ালঘরের কাছে দেখতে পাওয়া গেল একখানা ঘুড়ি পড়ে আছে। আছে তো আছে। বাপ লেখাপড়া জানে না, তবে তার ছোট ছেলেটা পাঠশালায় গিয়ে ক, খ, ঠ, শিখেছে। ঘুড়িখানা তুলে নিয়ে বাপের কাছে ছুটতে ছুটতে এলো, বলল, বাবা পড়ে দেখ : বাপ বলল, আরে আমি কি পড়তে জানি, তুই পড়, তোর ইস্কুলের কড়ি যোগাচ্ছি কেন?

ছেলে পড়ল—

শোনো শোনো নাতুড়ের লোক
এখনো সুবুদ্ধি হোক
নিশান রাজার হুকুম ধরো
রাজার খাজনা বন্ধ করো
নইলে ছুটবে লাল ঘোড়া
কুছ নয় তো খোড়া থোড়া।

বাপ বলল, ছাড়ান দে, পোলাপানের দল মশকরা করছে।

ততক্ষণে আমি কাছে এসে পড়েছি। সব দেখেশুনে বললাম, ও বারুই সর্দার, প্রাণে কি ভয়ডর নাই, দেখো কি! পোলাপানের দল নয়, পলোওয়ানার দল। চলো চলো, এখনি প্রাণরক্ষার বন্দোবস্ত করিগে। খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল গাঁয়ে যে ক'জন জোয়ান মরদ ছিল সব যাত্রার বায়না নিয়ে অন্য গাঁয়ে গিয়েছে, কেউ ভীম, কেউ দুর্জ্যধন, কেউ ঘটোৎকচ, কেউ কীচক। তখন আর কি, নিরুপায় হয়ে গাঁয়ের কালীতলায় গ্রামরক্ষার জন্য মানত করলাম। সেই রাত্রেই আগুন লাগল, আর লাগল তো কালীতলাতেই সর্বপ্রথম।

কালীমাতার শক্তিহীনতায় পরম বৈষ্ণব ভাদুড়ী নিতান্ত অখুশী হল না, বলল, তোমাদের গাঁয়ে তো হরিবাড়ি আছে, সেখানে মানত করলেই পারতে।

পরম শাক্ত দেওয়ানজিকে পাছে আবার ইষ্টদেবতার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে

হয়, তাই তাড়াতাড়ি বিষয়টা চাপা দিয়ে বলল, এখন কি হুকুম হয় রানীমার ?

প্রকাশ্য দরবারে দেওয়ানজি ইন্দ্রাণীকে রানীমাতা বলত।

ইন্দ্রাণী প্রসঙ্গটা লুফে নিল, পাছে আবার রাহু কেতুর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—বলল, দেওয়ান জেঠা এদের ভালো করে চিড়ে দই দিয়ে ফলারের ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপরে বিকালবেলায় পরামর্শ অন্তে কর্তব্য স্থির করা যাবে।

বিকালের দিকে আঙিনায় আবার দরবার বসল, তবে এবার লোকে উঠোন ভরেনি। ভরপেট ফলার খেয়ে অনেকেই ফিরে গিয়েছিল। দেওয়ানজি ও ভাদুড়ী মিলে নাতুড়ে গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বী গোছের লোককে রেখে দিয়েছিল, তবু সংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশের মাঝামাঝি। যে সমাজে মুরুব্বীর সংখ্যা বেশি তার সঙ্কট কখনো ঘোচে না।

ইতিমধ্যে বিশ্রামের সময়ে পলোওয়ানার রহস্যটা দেওয়ানজির কাছে জেনে নিয়েছে ইন্দ্রাণী। দেওয়ানজি বলেছিল জমিদারদের অত্যাচারে প্রজারা ক্ষেপে উঠে জোট বেঁধেছে, দিনের বেলায় নিজ নিজ কাজে তারা নিযুক্ত থাকে, কেউ চাষ করে কেউ ফসল কাটে কেউ মজুরী করে। রাতের বেলায় অন্য মূর্তি। মাছ ধরবার নাম করে পলো হাতে করে সবাই বেরিয়ে পড়ে, লোক জড়ো করবার সঙ্কেত হচ্ছে মহিষের শিঙের শিঙা বাজানো। সেই শব্দ শুনে দলে দলে লোক এসে জমায়েৎ হয়।

ইন্দ্রাণী বলল, মাছ ধরা তাদের ছল মাত্র !

তা ছাড়া আর কি। আর পলো দিয়ে কি নদীতে মাছ ধরে ? গ্রীষ্মকালে যখন খাল বিল জলা শুকোয় তখন পলো দিয়ে কই মাগুর ধরে, ভরা বরষায় বেড়াজালে মাছ ধরা পড়ে না, পলোতে কি হবে !

তবে তারা পলো হাতে বের হয়ে পড়ে কেন ?

শুধু পলো নয়, লাঠিও আছে। প্রত্যেকের হাতে মস্ত একখানা লাঠি, সেই লাঠির আগায় বাঁধা একটা করে পলো।

তাই বুঝি ওদের নাম পলোওয়ানা !

ঠিক ধরেছ বউমা।

এখন নিভৃতে কথা হচ্ছিল, তাই অভ্যস্ত বউমা নামটি ব্যবহার করল দেওয়ানজি।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না দেওয়ান জেঠা, ঢাল নয় তলোয়ার নয় বন্দুক সড়কি নয়, পলোর ভয়ে লোক অস্থির !

ভাদুড়ী একসময়ে টোলে পড়েছিল তারই চিহ্নস্বরূপ কয়েক টুকরো সংস্কৃত শ্লোক সুযোগ পেলেই ঠেলে ওঠে, ঐ যে বেদান্তে বলেছে না "তৃণৈকগুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্ত হস্তিনম্"—অস্যার্থ।

বাধা দিয়ে দেওয়ানজি বলল, অস্যার্থ এখন থাক। তারপরে পূর্ব প্রসঙ্গ অনুসরণ করে বলল, শুধু পলো নয়, সঙ্গে পাকা বাঁশের লাঠি আছে, আর আছে দলে লোকের সংখ্যা, আর সবার উপরে আছে রুদ্রগাতি গাঁয়ের গঙ্গাপাল, লোকটা যেমন পাকা ঘোড়সোয়ার তেমনি সাহসী আর খুনখারাপিতে সিদ্ধহস্ত।

তাকেই বুঝি পলোওয়ানাদের সেনাপতি বলে, আর রাজাটির নাম যেন কি বলেছিল মনে পড়ছে না!

ঈশান রায়।

ভাদুড়ী বলল, লোকের মুখে মুখে দাড়িয়েছে নিশান রায়।

লোকের মুখে না ভাদুড়ী, ও যখন পথে চলে ওর সামনে একজন চলে নিশান নিয়ে—তাই নিশান রায়।

এসব লোকের নাম তো আগে শুনিনি।

তখন বাবুজি ছিলেন, তাই সকলে মাথা নীচু করে ছিল, এখন দিন পেয়েছে।

তা লোকটি কেমন?

সচ্চ শয়তান বউমা, সচ্চ শয়তান, প্রজার রক্ত শুষতে, বাজে জমা আদায় করতে, বৃদ্ধি সময়ে জোর করে কবুলিয়ত আদায় করতে ওর জুড়ি নাই।

আর তাকেই কিনা পলোওয়ানারা রাজা স্বীকার করল!

তবে আর শয়তান বললাম কেন? লোকটা যখন দেখল বিক্ষুব্ধ দল তার উপরে এসে পড়বে, তখন সে আগ বাড়িয়ে গিয়ে তাদের মুরুব্বী হল, বলল, তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমি আছি তোমাদের পিছনে, তারা তো মহাখুশী। তখন লোকটা প্রজাদের বোঝালো, দেখো কলকাতায় রাজত্ব করে ইংরেজ কোম্পানী আর এই অঞ্চলের রাজত্ব তোমাদের। তোমরা হলে পলোনাথ কোম্পানী। তারা নামটা পেয়ে নিশান রায়ের জয়ধ্বনি করে উঠল, আর গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঈশান রায়ের নামে গান বেঁধে গাইতে শুরু করল।

দু'একটা মনে থাকে তো বলুন দেওয়ান জেঠা।

বউমা আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, সব কি মনে থাকে, আর ছড়াও তো একটা-আধটা নয়, এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

হতাশ হয়ে ইন্দ্রাণী বলল, তাহলে আর শোনা হল না।

কেন হল না? রাজবাড়ির সেরেস্তায় সম্প্রতি একটি লোককে নিয়োগ করেছি। তার যেমন স্মৃতিশক্তি, আর বলবার ভঙ্গীও তেমনি। ওরে কে আছিস, দয়ারামকে বল্ রানীমা তাকে দেখতে চেয়েছেন।

ডাক শুনে একটি লোক এসে ইন্দ্রাণীকে প্রণাম করল।

ইন্দ্রাণী তার গলায় পৈতা দেখে বলল, আহাহা করেন কি, আপনি ব্রাহ্মণ তায় বয়সে বড়।

লোকটি বলল, ব্রাহ্মণ আপনিও, আর অন্নদাতার চেয়ে বয়সে আর বড় কে।

এ সেরেস্তায় কতদিন ঢুকেছেন?

দয়ারাম একবার দেওয়ানজির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, দিনক্ষণ তো মনে থাকে না, তবে রানীমার তীর্থযাত্রার পরদিনেই।

কাজকর্ম কেমন লাগছে?

কাজে মন থাকলেই ভালো লাগে।

এর আগে কোথায় কাজ করতেন?

কিছু জমিজমা ছিল মা, কাজ করবার দরকার হত না।

তবে এখানে কাজ নিলেন কেন?

সে দুঃখের কথা শুনে আর কি হবে মা। জমিদার বড় অত্যাচারী ছিলেন। একদিন কাছারীতে ধরিয়ে এনে জমি ইস্তাফা লিখিয়ে নিলেন, বললেন, ভেবো না, ও জমি তোমারই থাকল কেবল নূতন হারে খাজনা স্বীকার করে কবুলিয়ৎ লিখে দিতে হবে। শুনে আমি নমস্কার করে বললাম, বাবু, ও জমি আপনারই থাকুক, দেড় টাকার জায়গায় সাড়ে তিন টাকা খাজনা দিয়ে জমি রাখবার ক্ষ্যামতা আমার নাই।

বাবু হেসে বললেন, জন্মেছ বামুন বংশে, কত আর বুদ্ধি হবে। তোমাদের গাঁয়ের সবাই ঐ নূতন হারে বন্দোবস্তী নিচ্ছে।

বাবু তারা খাজনা দেবে না বলেই নিচ্ছে।

আমার লাঠির জোর আছে।

বললাম, কিছু মনে করবেন না বাবু, পলোওয়ানারা এখন প্রজার দিকে দাঁড়িয়েছে। শুনে তিনি তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসে বলেন, কি এতখানি স্পর্ধা! কে আছিস ধর তো বামনাকে। তখন দু-তিনজন খোট্টা বরকন্দাজ ছুটে এলো। হাতে তাদের লাঠি, আমি বেগতিক গোছ দেখে পৈতা দেখিয়ে বললাম, সাবধান,

ব্রহ্মশাপের ভয় রেখো। আমি শ্রীহর্ষের সন্তান, মহাকুলীন, নিত্য ত্রিসন্ধ্যা করি। খোট্টা বেটাদের আর কত বুদ্ধি হবে, থমকে দাঁড়িয়ে গেল, জানে না যে কলিকালে ব্রহ্মশাপ ফলে না! রানীমা, খোট্টারা তো হটে গেল কিন্তু আমার সমস্যা তো হঠলো না। শ্রীহর্ষের সন্তান হই আর যাই হই, পনেরো বিঘা জমি হাতছাড়া হয়ে গেল। মূল পিতামহ শ্রীহর্ষেরও হর্ষলোপ পেতো।

দয়ারামের দীর্ঘ জীবনকাহিনী শুনে কৌতুক অনুভব করছিল ইন্দ্রাণী। বলল, থামলে কেন, বলে যাও।

বলবার মতোই কথা। মহাকুলীন শ্রীহর্ষের সন্তান বিনা অন্নচিন্তা মরতে পারে, এখনও চন্দ্রসূর্য উঠছে, জোয়ারভাটা খেলছে। দেখা হয়ে গেল পলোয়ানদের সেনাপতি গঙ্গাপালের সঙ্গে। আমার বিমর্ষ ভাব দেখে শুধালো, কি হয়েছে দাদাঠাকুর? সবিস্তারে সব বললাম। শুনে সে লাফ দিয়ে উঠল, বলল, তোমার মতো একজন লোকই আমরা মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম। তাই ভগবান তোমাকে চেলায় করে এনে জুটিয়ে দিলেন। দাদাঠাকুর একসময়ে তো তুমি যাত্রাদলে গান বাঁধতে, এবারে এসো আমাদের দলে ঢুকে ছড়া তৈরি করো।

দেখেছ দেওয়ান জেঠা, এখনও সৎ লোকের অন্নের অভাব হয় না।

দেওয়ানজি মৃদু হেসে বলল, আগে সবটা শোন বউমা।

সেই ভালো। তার পর কি হল দয়ারাম?

ওদের দলে ঢুকে ছড়ার গায়ে ছড়া বাঁধতে লাগলাম, লোকে বিষম খুশী। তা প্রায় চার-পাঁচশ ছড়া রচলাম। ঐ পর্যন্তই আমার কাজ। তবে আমি পলো কাঁধে করে কখনও বের হই নাই।

তবে তো বেশ চলছিল, হঠাৎ আবার জমিদারি সেরেস্তায় কাজ নিতে গেলে কেন?

কি জানেন রানীমা, ভিতরে ঢুকে দেখলাম অনেক জমিদার অত্যাচার করে বটে কিন্তু পলোয়ানরা তাই বলে কম অত্যাচারী নয়। এরা শুধু জমিদারের শত্রু নয়, নিরীহেরও শত্রু। মনে মনে ভাবলাম, তবে জমিদার কি দোষ করল!

এই জন্যেই দল ছাড়লে?

ঠিক তা নয় রানীমা, মুসলমানেরা বলে দুধের জন্য রোজা করা, সেই দুধ যদি না মেলে। একদিন গঙ্গাপালকে বললাম, সেনাপতি সাহেব, ছ'মাস তো হয়ে গেল, এবারে তঙ্খা দেওয়ার হুকুম হোক। সেনাপতি বলল, এখনি কি হয়েছে, আগে আমাদের রাজগী হোক তখন পরগণা লিখে দেব। তা তো দেবেই ভাই,

কিন্তু ততদিন খাই কি! মহাকুলীন শ্রীহর্ষের সন্তানের খাদ্যাভাব হবে, এ কি একটা কথা হল! এখনও চন্দ্রসূর্য উঠছে, জোয়ারভাটা খেলছে।

দেওয়ানজি বলল, ওসব কথা থাক, রানীমা ছড়া শুনতে চান, তারই গোটা কতক শোনাও।

সে-সব কি রানীমাব শুনবার যুগ্যি, তবে যখন শুনতে চাইছেন—এই বলে সবিনয়ে শুরু করল—

"দৌলতপুরের কালী রায়ের ব্যাটা
সকলের আগে চলে মাথায় বাঁধা ফ্যাটা।
আর সবার রাজা নিশান রায় বাবু
ছোট বড সব জমিদার করেছেন কাবু।
তার নামের চোটে গগন ফাটে
আষ্ট (রাষ্ট্র) আছে জগৎময়।
বঙ্গদেশে কলির শেষে ঘটলো বিষম দায়
মনিব লোকের জের হয়েছে
বিদ্রুদের জ্বালায়
যত প্রজালোকে জমিদারকে বেদখল দেয়।
তার রাজা হ'ল নিশান রায় মস্ত জমিদার
গোপালপুরের জমিদারের লুটলো বাড়িঘর।
নিশান রায়ের হুকুমমতো লোকে চলে হাজারে হাজার
অস্থির হল জমিদার আর যত তালুকদার।"

আর একটা ছড়া শোনেন রানীমা—

"কি বিদ্রোহী পরিত্রাহি বাপরে বাপ
মলেম মলেম
কি তামাশা সকল চাষা ভেবেছিল
রাজা হলেম।
হাতে পলো, কাঁধে লাঠি
লোটে যত ঘটিবাটি
মাগনা খাবো রাজার মাটি ভয়ে ভীরু অবাক হলেম।
দেশের যত বামুন ভদ্র
তারা কি আর আছে ভদ্র

বিক্রু দল দেখামাত্র নজর দেয়

আর বাজায় সেলাম।"

আর কত শুনবেন রানীমা, আর একটা শুনুন—

"লাঠি হাতে পলো কাঁধে চলল সারি সারি

সকলের আগে যায়ে লুটলো বিশিদের কাছারী —"*

ইন্দ্রাণী বলল, এ সমস্ত তোমার বানানো?

আর কে বানাবে মা-ঠাকরুন। সবাই প্রশংসা করত, সবচেয়ে বেশি করত বিক্রুকের দল, কিন্তু তন্‌খা চাইলেই বলত আগে আমাদের রাজগী হোক তখন পরগণা লিখে দেব, যে পরগণা চাও। তখন আমি বললাম, তবে ভাই যার রাজগী আছে তার কাছেই যাই। আমার কথা শুনে তারা রুখে উঠে বলল, তাই যা বেটা বেইমান হারামজাদা।

তারপরে দেওয়ানজির দিকে তাকিয়ে বলল, এমন বাক্যি বলে কিনা শ্রীহর্ষের সন্তানকে। তখন চলে এলাম রাজবাড়িতে আর দেওয়ানজির কৃপায় রানীমায়ের চরণে পেলাম আশ্রয়।

ইন্দ্রাণী বলল, বেশ খুশী হলাম দয়ারাম তোমার ছড়া শুনে, মাঝে মাঝে শুনিয়ে যেয়ো। এখন যাও।

মুরুব্বীরা এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিল, এবারে বলল, রানীমা, আমাদের সম্বন্ধে কি হুকুম হল?

সে হুকুম তোমরা দেওয়ানজির মুখ থেকে শুনে নিয়ো, এখন তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গাঁয়ে ফিরে যাও।

মুরুব্বীরা বলল, যতক্ষণ রাজবাড়িতে থাকি ততক্ষণ আমাদের ভয়ভাবনা থাকে না, বিশেষ জানি যে স্বয়ং রানীমা আমাদের পিছনে আছেন, তাই আমরা কাউকে গেরাজ্যি করি না, খোদ যমরাজ এলেও বলব, বাপু এখন বিরক্ত করো না, পলোওয়ানার দল তো তুচ্ছ।

উৎসাহ দিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, এই তো পুরুষলোকের মতো কথা, সাহসের মতো আর অস্ত্র নাই।

গাঁয়ের প্রধান মুরুব্বী বারুই সর্দার বলল, আমার বড়দাদা বলত, মরদের আবার লাঠিসোটায় কি দরকার—বলত, মরদ কি বাৎ...

অন্য একজন বলে উঠল, আর হাতীকা দাঁত।

* এই ছড়াগুলো আর উল্লিখিত ঘটনাসমূহ একখানি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

এমন সময়ে দু'জন লোক দেউড়ি দিয়ে ঢুকল, দরোয়ানরা রোখো রোখো বলতে বলতেই তারা ছুটে এসে ইন্দ্রাণীর পায়ের কাছে 'রক্ষা করো রাণীমা' বলে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দেওয়ানজি ও ভাদুড়ী কি হয়েছে, কি ব্যাপার, তোমরা কোথা থেকে আসছ, বলে ছুটে গেল তাদের কাছে। ইতিমধ্যে মুরুব্বীদের দৃষ্টি তাদের আকস্মিক আগমনের রহস্য ভেদ করেছে, বাক্সই সর্দার বলে উঠল, ওই রে, সেই লাল ঘুড়ি!

অন্য একজন বলল, ঐ রে, পলোওয়ানাদের লুটিস!

মুহূর্তমধ্যে মুরুব্বীর দল চঞ্চল হয়ে উঠল, মুখে তাদের লাল ঘুড়ি, আর পলোওয়ানাদের লুটিস ছাড়া আর কোনো কথা নাই। দেখা গেল বিশ্বের যাবতীয় সমস্যায় তাদের যতই মতভেদ থাকুক—লাল ঘুড়ি ও লুটিস সম্বন্ধে তারা অভিন্ন মত। আর সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো বৃদ্ধ মুরুব্বীর দল অন্তর্হিত হল। ঐ দুটি লোকের আগমন আর এতগুলি লোকের নির্গমন এত খণ্ডিত মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল যে ইন্দ্রাণী ও অন্যান্য সকলের হতভম্ব ভাব কাটবার সময় পেল না।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে এলে দেওয়ানজি তাদের কাছে গিয়ে একজনকে চিনতে পারল, তোমাকে যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে!

হাঁ হুজুর, আমি রানীমায়ের একজন তশীলদার, বাড়ি জুড়ি।

হাতে ওখান কি?

পলোওয়ানাদের লুটিস।

ওখানা তো ঘুড়ি।

আজ্ঞে ঐ ঘুড়ি দিয়েই লুটিস দেয়।

লুটিস দিতে এলো, ধরলে না কেন?

ও তো রাতের বেলায় এসে গাঁয়ে পড়ে থাকে। যে গাঁ যেদিন পোড়াবে সেই দিন ঘুড়ি দিয়ে জানিয়ে দেয়।

তারপরে তারা হাত জোড় করে ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে বলল, আমরা রানীমায়ের পা জড়িয়ে ধরে এখানে পড়ে থাকব।

তাতে তো গাঁয়ের লোক বাঁচবে না।

তারা কি কেউ এতক্ষণ গাঁয়ে আছে!

সব পালিয়েছে?

স—ব। আমাদের বুদ্ধি বেশি তাই ঘুড়িখানা হাতে করে রাজবাড়িতে খবর দিতে এলাম।

তা যেন এলে, কিন্তু গাঁ রক্ষা হবে কি করে, ঘরবাড়ি যে পুড়িয়ে দেবে।

গরীবের ঘরবাড়ি তো পুড়বার জন্যেই হয়েছে মা।

দেওয়ানজি বলল, দেখি ঘুড়িখানা।

কি আর দেখবেন কর্তা!

কি যেন লেখা আছে বলে মনে হচ্ছে!

একজন ঘুড়িখানা এগিয়ে দিল দেওয়ানজির হাতে।

অন্যজন মুখস্থ বলে গেল :

শোনো ওরে কৈজুড়ির লোক
এখনও সুবুদ্ধি হোক,
নিশান রাজার নিশান ধর
রাজার খাজনা বন্ধ কর
নইলে ছুটবে লাল ঘোড়া
পুড়বে গ্রাম আগাগোড়া।

কেউ ঠাট্টা করেছে।

ঠাট্টা বলে ঠাট্টা, একেবারে লাল ঠাট্টা!

গাঁয়ের পরে গাঁ পুড়ছে, নাতুড়ে গিয়েছে, সাঁতালদীঘি গিয়েছে, লক্ষ্মীপুর মানগাছা গিয়েছে, আজকে আমাদের পালা। এখন রক্ষা করা রানীমায়ের হাতে।

ইন্দ্রাণী বলল, আচ্ছা তোমরা এগোও, আমাদের লোকজন লাঠি কিরীচ বন্দুক নিয়ে যাচ্ছে।

অগত্যা তাদের এগোতে হল, তবে বেশি দূর নয়, দেউড়ির কাছে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস করে মন্ত্রণা করল, দেখ ভাই, রাজাই হোক আর জমিদারই হোক, বড়লোক বড়লোক, আমাদের এগিয়ে দিয়ে আর কিছু করবে না, মরতে মরব আমরা।

ইন্দ্রাণী দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের লেঠেল কত হবে?

হাঁ তাদের মাথায় সর্বদা জন পঞ্চাশেক থাকে।

তবে তারা লাঠি সড়কি কিরীচ নিয়ে এগোক, সঙ্গে দু-তিনটে বন্দুকও যেন নেয়, তবে হাঁ্যা, দরকার না হলে যেন না চালায়।

তাই বলে দিচ্ছি।

আপনি যেন লাঠি ধরবেন না বুড়ো বয়সে।

বউমা (তখন অন্য কেউ ছিল না), মানুষে বুড়ো হয় বয়সে নয়, লোকের বিবেচনায়। বুড়ো হয়েছে বুড়ো হয়েছে শুনতে শুনতে মানুষের ধারণা হয় সবাই যখন বলছে তখন হয়ত বুড়ো হয়েই পড়েছি।

ইন্দ্রাণী শুনে নীরবে হাসল। তারপরে বলল, কি, তোমরা গেলে না?

কৈজুড়ির লোকেরা বলল, রাজবাড়ির লোকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি।

বেশ তাই যাও—বলে ইন্দ্রাণী আবার হাসল। তারপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল, এই হতভাগ্যদের রক্ষা করা ভগবানেরও বুঝি অসাধ্য।

৮

এবারে পলোওয়ানাদের আর তেমন সুবিধা হল না, কারণ লুট করা আর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া একতরফা হয়ে উঠল না। এতদিন যে সব গ্রাম লুট করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে যেমন নাতুড়ে, সাঁতালদীঘি, লক্ষ্মীপুর মানগাছা সর্বত্রই পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ হয়েছে পলোওয়ানার দল, তাদের সাড়া পাওয়ামাত্র গাঁয়ের লোক উভয় পক্ষকে শাসিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এবারে তারা এসে দেখল গাঁয়ের লোক তাদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত। দলের প্রধান গঙ্গাপাল ও বাজু সরদার ঘোড়ায় ছিল, আর সকলে পদাতিক। তারা দেখতে অভ্যস্ত পলোওয়ানাদের সাড়া পাওয়ামাত্র গাঁয়ের লোক ছুটে পালায়, এক্ষেত্রে তেমন কিছু দেখা গেল না। বিস্মিত গঙ্গাপাল বলল, সরদার এরা যে পালায় না, শেষে কি রুখে দাঁড়াবে নাকি?

বাজু সরদার বলল, তেমন তো কখনো হয় না, তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে আমাদের নুটিস পৌছায়নি।

তা কি করে সম্ভব! নুটিস জারির লোকের হাত পাকা, তাছাড়া ভোরবেলা আমার লোক গিয়ে দেখে এসেছে গাঁয়ের মুরুব্বীরা নুটিস নিয়ে বলা-কওয়া করছে।

পালমশায় তাহলে মনে হচ্ছে কৈজুড়ির পিছনে কেউ দাঁড়িয়েছে।

কি যে বল সরদার, যে-সব গাঁয়ে এখনো নিশান রায়ের নুটিস পৌছায়নি, তারাও পালাবার জন্যে এক পা বাড়িয়ে আছে—আর কৈজুড়ির এমন কি পৃষ্ঠবল হল যে তারা রুখে দাঁড়াবে।

এখনো দাঁড়ায়নি, তবে আমরা যদি দোমনা হই তবে দাঁড়াতে কতক্ষণ। আর একটা গাঁ যদি রুখে দাঁড়ায় তবে আমাদের ব্যবসা খতম, আর কোনো গ্রাম ভয় করবে না।

দোমনা হব কি সরদার, দোমনা হওয়ার জন্যে তো আসিনি। একটা কথা মনে এলো বললাম। তারপর গর্জন করে উঠল, "শোনো রে কৈজুড়ির লোক, এখনো সুবুদ্ধি হোক, নিশান রায়ের নিশান ধরো, রাজার খাজনা বন্ধ করো।"

সেই নিস্তব্ধ রাত্রে গঙ্গাপালের গভীর গম্ভীর আওয়াজ যুদ্ধারম্ভের ভেরীধ্বনির মতো শ্রুত হল।

শোনো রে ওরে গঙ্গা পাল
এবার তোমার অন্তিম কাল
আজ যে ঘুচবে জাবিজুড়ি
এ গাঁয়ের নাম কৈজুড়ি।

দেওয়ানজি বলল, দয়ারাম এ শোলোক আবার কখন বানালে?

এখনই দেওয়ানজি।

দু'জনে পাশাপাশি ঘোড়ায় ছিল। ঐ ছড়া শুনে গঙ্গাপাল হকচকিয়ে গেল, বুঝল এবার তার জুড়ি জুটেছে, আর তিলার্ধ অপেক্ষা করা উচিত হবে না, কাজেই এবারে সাদা গদ্যে গর্জন করে উঠল, কর্ লুঠ, লাগা আগুন। সাদা গদ্যের জোর কি পদ্যের আছে!

এতক্ষণ পলোওয়ানারা পলো ও লাঠি রেখে দিয়ে দুই পক্ষের উতোর-চাপান শুনছিল, এবারে গঙ্গাপালের হুকুম পেয়ে তৎপর হয়ে উঠল। তাদের তৎপরতা দেখে দেওয়ানজি শুধু বলল, রেকাৎ খাঁ!

রেকাৎ খাঁ মাথায় লাঠিখানা ঠেকিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে লম্ফ দিয়ে উঠল। বলল বল ভাই সব বলো দীন দীন, শুধাব আজকে মনিবের ঋণ। তারপর চল্লিশ পঞ্চাশজন সবল সুঠাম দেহের অধিকারী লাঠিয়াল মাথার উপরে ঘূর্ণ্যমান লাঠি নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হতে লাগল। এতক্ষণ অন্ধকারে তারা প্রচ্ছন্ন ছিল বলে পলোওয়ানাদের খেয়াল হয়নি। এমন দৃশ্য আগে কখনো তাদের চোখে পড়েনি, ঘূর্ণ্যমান লাঠি, চলমান মানুষে মিলে আগুয়ান একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। প্রথম দু-চার মুহূর্ত তারা পালাতেও ভুলে গেল, তারপরে সম্বিৎ হতেই পলো লাঠি ফেলে সকলে পালাতে শুরু করল।

এমন সময়ে দেওয়ানজি ডাক দিয়ে বলল, ওহে নিশান রায়ের দল, তোমরা

পানাও আপত্তি নাই, কেবল পাঁচজন থাকো। পাঁচটি মাথা রানীমাকে ভেট দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। এখন কে সেই পাঁচজন বল।

দয়ারাম বলে উঠল, ঐ লোকটাকে ধর। ওর মাথাটা মস্ত।

না হুজুর, বারো আনাই পাগড়ি, তাই মস্ত দেখাচ্ছে।

তবে ওকে ধর।

সে লোকটা মস্ত সেলাম করে বলল, হুজুর, আমার মাথায় কিছু নেই, প্রত্যেক দিন পাঠশালায় গুরুমশায় বলেন।

তবে ধরো ওই দুই ঘোড়সোয়ারকে। সকলে আবিষ্কার করল তারা অনেকক্ষণ হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

গঙ্গাপাল ও বাজু সরদারকে অনুসরণ করে পলোওয়ানার দল তাদের দেওয়ান ও সেনাপতির সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল, তাদের পলো আর লাঠিগুলো পড়ে না থাকলে মনে হতে পারত আদৌ কেউ আসেনি।

তখন রেকাৎ খাঁ সেলাম বাজিয়ে এসে দাঁড়াল দেওয়ানজির সম্মুখে। বলল, হুজুর, হুকুম হয় তো লাঠিগুলো নিয়ে গিয়ে রানীমাকে ভেট দি।

দেওয়ানজি বলল, মন্দ নয়।

সেই সঙ্গে পলোগুলো, বলল দয়ারাম, বেটারা এমন জব্দ জীবনে হয়নি।

জানো দয়ারাম, আমি বরাবর দেখেছি গুণ্ডারা আসলে ভীরু, রুখে দাঁড়ালেই সরে পড়ে।

আর শুধু রুখে দাঁড়ানো নয়, আপনি যে মন্ত্র ছেড়েছিলেন।

মন্ত্র আবার কোথায় দেখলে ?

ঐ যে পাঁচটি মাত্র মাথা চাই, কারা দেবে এগিয়ে এসো।

দেওয়ানজি হেসে উঠে বলল, তা বটে, তবে এ মন্ত্র শিখেছি কোথায় জানো ?

কোথায় ?

ঐ নীলকুঠির সাহেবগুলোর কাছে। তারা সর্বদাই প্রস্তুত ছিল মানুষ মারতে, তবে হিসেব করে মারতো। যেখানে বুঝত পাঁচজনকে মারলেই চলবে, সেখানে ছ'জনকে মারতো না। তারপর রেকাৎ খাঁয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, সেই কথাই ভালো। পলোগুলো নিয়ে চলো রানীমায়ের দরবারে।

তবে গাড়ির বন্দোবস্ত দেখি গে।

কি হে, তোমাদের গ্রামে পাঁচ-সাতখানা গরুর গাড়ি হবে তো ? তার কমে এত মাল নিয়ে যাওয়া যাবে না।

তার পরে কাউকে দেখতে না পেয়ে বলল, এ কি, কৈজুড়ির লোকেরা সব গেল কোথায় ?

রাজবাড়ির লাঠিয়ালদের একজন বলল, সর্দার, তারা বোধ করি ঘরদোর সামলাতে গিয়েছে।

এখন তো পলোওয়ানার দল পালিয়েছে, ঘরদোর সামলাবার আর দরকার নেই, যাও একজনকে ডেকে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যে একজনকে নিয়ে উপস্থিত হল সেই লাঠিয়াল।

তোমার নাম কি হে ?

আজ্ঞে ছিরু সর্দার।

এবার কথা হচ্ছে দেওয়ানজির সঙ্গে। তা তোমরা সবাই পালিয়েছিলে কেন ?

পালাব কেন, আমরা পিছনে দাঁড়িয়ে রাজবাড়ির লেঠেলদের তারিফ করছিলাম।

না হয় এগিয়ে এসে একটু সাহায্যই করতে।

সেই যুক্তিই করছিলাম, এমন সময়ে বেটারা পালিয়ে গেল, নইলে বুঝত কৈজুড়ির মরদদের মরদানি।

ওরা না বুঝলেও আমরা বুঝেছি, এখন খানকতক গোরুর গাড়ি যোগাড় করতে পারবে কি ? লাঠি আর পলোগুলো রাজবাড়িতে নিয়ে যাব।

ছিরু সর্দার অতিশয় বিচক্ষণ লোক, যে কোনো একটা রাজনৈতিক দলের নেতা হতে পারত। বলল, দেওয়ানজি সাহেব, এত রাতে আর গাড়ি কোথায় পাবো, এগুলো এখানে পড়ে থাক, কাল সকালে গাড়ি ভরে রাজবাড়িতে পৌছে দেব।

ছিরুর কথার মর্ম বোঝে এমন সাধ্য নেই দেওয়ানজির, তাই অখ্যাত এক জমিদারবাড়ির দেওয়ানির বেশি তার আর কিছু জুটলো না।

তাই যেয়ো। রানীমা খুশী হয়ে তোমাদের বকশিশ দেবেন, চাই কি এক বছরের খাজনাও মাপ করতে পারেন।

রাজবাড়ির দলবল চলে গেলে একে একে কৈজুড়ির লোকেরা এসে জুটতে লাগল।

কি, লাঠিগুলো পড়ে থাকল কেন ?

আর পলোগুলো ?

ছিরু বলল, কালকে এইসব রাজবাড়িতে পৌছে দিতে হবে।

যার গরজ পৌঁছে দিক, আমাদের এত আহ্লাদ হয়নি যে ওগুলো তিন ক্রোশ দূরে পৌঁছে দি।

রাণীমা খুশি হলে এক বছরের খাজনা মাপ করতে পারেন।

এক বছরের খাজনা কটা টাকা? আর একখানা ঘর তুলতে কত জানো—এ দুয়ে হিসাব করেছ! করনি বুঝতেই পারছি, তা হলে আর আহ্লাদে দুই পাটি দাঁত বের করে হাসতে না।

আসল কথা, পলোওয়ানাদের আক্রমণ থেকে গ্রাম রক্ষা পাওয়ায় কৈজুড়ির লোকে আদৌ খুশী হয়নি। তারা হিসাব করেছিল গ্রাম পুড়িয়ে দিলে জমিদারের খরচে নূতন ঘর হবে, জিনিসপত্র যা পুড়েছে তার তিন গুণ দাম আদায় করবে, মাঝ থেকে ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট, না পুড়ল গ্রাম, মাঝ থেকে লাঠির বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে পৌঁছে দাও। আরে এক বছরের খাজনা মাপ, সে তো গ্রাম পুড়লেও প্রজায় পেয়ে থাকে। তবে তাদের কি লাভ হল? ছিরু সর্দারের হিসাব অন্য রকম ছিল। এই উপলক্ষে জমিদারের পক্ষে সরফরাজি করলে একটা তশীলদারি জুটতে পারে। সেরাত্রে কৈজুড়ির ঘরে ঘরে বাতি জ্বলল না, কারো উনুনে হাঁড়ি চড়লো না। অদৃষ্ট ও জমিদারকে ধিক্কার দিতে দিতে ছিন্ন শয্যায় শয়ন করে তারা ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পলোওয়ানার দল অদৃশ্য হয়ে গেল—রইল কেবল গঙ্গা-পাল ও বাজু সরদার, দু'জনেই অশ্বারোহী।

কি পাল মশায়, কেমন বোঝেন?

বুঝবার আর কি আছে, সকলেই হারামজাদা।

হারামজাদা হোক আর শাহাজাদা হোক গর্দান দিতে কে চায়!

গর্দান আবার কে চাইল?

বুঝলেন পাল মশায়—ঐ যে রাজবাড়ির দেওয়ান হেঁকে বলল না, আমরা পাঁচটা শির চাই, কে দেবে এসো!

ও একটা কথার কথা।

যে দেবে তার পক্ষে নয়।

না হয় মরতোই।

দেওয়ান সাহেব ভুলে যাচ্ছেন এরা কেউ মরবে বলে আসেনি, এসেছিল লুটের আশায়। দুটো লোটা কলসীর আশায় কে শির দিতে চায়।

তাই তো বললাম। এখন রাজা বাহাদুরকে কি বোঝাব ভাবছি।

ভাবনার আবার কি আছে। বলব--কৈজুড়ির জমিদার আগেই খবর পেয়ে পাঠিয়েছিল তিন-তিনটে হাতী আর পঁচিশ-ত্রিশজন ঘোড়সোয়ার আর—

বাধা দিয়ে গঙ্গাপাল বলল কথাগুলো।

তার বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বলল, কথাগুলো মিথ্যা এই তো ভাবছেন!

এতদিন পরে এই বুঝলে সরদার? ভাবছি কথাগুলো কি বিশ্বাস করবেন রাজা বাহাদুর!

রাজারা কবে বুদ্ধি রাখে পাল মশায়!

সত্যি রাজারা রাখে না, এ যে সাজানো রাজা।

বাজ সরদার বলল, সাজানো রাজা সাজানো কথায় বিশ্বাস করবে, নইলে তার রাজগী যেতে কতক্ষণ!

তা তো বুঝলাম, এখন করবে কি শুনি?

চলুন বাড়ি গিয়ে রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটানো যাক। আমার বাড়িতে তো খাবেন না, নইলে দিব্বি ইলিশ মাছের পাতুড়ি রেঁধেছে—ছরা সাগরের ইলিশ।

তা যাও পাতুড়ি খেয়ে পড়ে ঘুমোও গে, ভোরবেলা উঠে আগেভাগে রাজা বাহাদুরকে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের আগে আর কেউ যদি সংবাদ দেয়, তবে সে নিশ্চয় হাতী আর ঘোড়সোয়ারের কথা বলতে ভুলে যাবে। যত সব হারামজাদা!

গঙ্গাপালের কাছে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে হারামজাদা।

এই বলে দু'জনে দু'দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

মনে থাকে যেন কাল সকালবেলায়—

বাজ সরদার ইশারায় জানালো, ভুলবে না।

বিদ্রুকদের রাজা নিশান রায়ের বাড়ি সাজাদপুর পরগণার দৌলতপুর গ্রামে —সেই গ্রামের সে ইজারাদার। সে যখন বিদ্রুকদের রাজগী স্বীকার করে, তখন শর্ত করে নিয়েছিল সাজাদপুর আর বিরাহিমপুর পরগণায় পলোওয়ানাগিরি চলবে না। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল, এ দুই পরগণা ঠাকুরবাবুদের জমিদারি, তারা কলকাতার ধনী বনেদী জমিদার। একবার প্রজা বিদ্রু হতে না হতে জাহাজ ভরে গোরা সেপাই এনে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল আর মাতব্বরদের ঘরবাড়ি হাতী দিয়ে টেনে ভেঙে একশা করে দিয়েছিল।

এ গল্প অনেকবার শুনেছে বাজু সরদার ও গঙ্গাপাল ; কাজেই কৈজুড়ির জমিদারের হাতী ও ঘোড়সোয়ারের কাহিনী সহজেই বিশ্বাস করবে। যে মিথ্যা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য তাকে আর মিথ্যা বলা উচিত নয়।

ভোরবেলায় গঙ্গাপাল ও বাজু সরদার যখন ঈশান রায়ের "রাজবাড়িতে" এসে পৌছালো তখন প্রসন্ন মনে ঈশান রায় বাড়ির সম্মুখের পথে গুন গুন করে গান করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে প্রসন্নতার যথেষ্ট কারণ ছিল। গতরাত্রে কৈজুড়িতে লুট হয়ে গিয়েছে, এক্ষুনি রাজার প্রাপ্য উপঢৌকন এসে পৌছবে. গ্রামের লোকে বিত্তশালী কাজেই উপঢৌকন সেই মাপে হবে। এমন প্রত্যেকবার লুটতরাজের পরে হয়, এবারে না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না এমত অবস্থায় যদি "আমায় দে মা তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই মা শঙ্করী"—পদটি অজ্ঞাতসারে রসনাগ্রে গুনগুনিয়ে ওঠে তবে বুঝতে হবে ঈশান রায়ের স্বভাব মানবস্বভাববিরুদ্ধ নয়। শঙ্করী অযাচিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিলেন ঈশান রায়ের। পলোওয়ানার দল যত লুটপাট করত তার তবিলদারি ঈশান রায়ের উপরে। বস্তুত এই শর্তেই এই দলটির রাজগী স্বীকার করেছিল সে। এই ক'মাসের অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে যে দৌলতপুর গাঁয়ের ইজারাদারির আয় দারোগাগিরির বেতন ছাড়া আর কিছুই নয় ; এখন তার আসল আয় হচ্ছে ঐ লুটতরাজের ভাগ, যাকে সংস্কৃত শব্দের শান্তিবারি ছিটিয়ে সে বলে থাকে 'উপঢৌকন'। বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার মহিমা অপার। ঘৃণ্য 'চুরি' শব্দটা দেবভাষার কৃপায় যখন 'অপহরণে' পরিণত হয় তখন একটা রাজকীয় মর্যাদা লাভ করে, কারণ প্রয়োজন হলে (এবং না হলেও) কোন্ রাজায় না অপহরণ করে! লুটের ভাগ 'উপঢৌকন' নামান্তরে ঈশান রায়ের 'রাজকোষে' এসে পৌছয়। এ হেন অবস্থায় প্রাতঃসমীরণে তার মনটা উৎফুল্ল হয় আর রাজপ্রাসাদের সাধনালব্ধ প্রসাদকণিকার একটি সঙ্গীতকলি তার কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐ স্বর্গীয় সঙ্গীতের কলিটি যখন গঙ্গাপাল (দেওয়ান) আর বাজু সরদারের (সেনাপতি) কর্ণে প্রবেশ করল তারা ভয়ে একটি সিদ্ধিগাছের ঝোপের আড়ালে কিয়ৎক্ষণের জন্য আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের এই আড়ষ্টতাকে কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা বলা ঠিক হবে না, কারণ কর্তব্য অর্থাৎ বক্তব্য আগেই স্থির করে রেখেছিল। তারা সম্মুখে উপস্থিত হয়ে স্বেদ অশ্রু পুলক কম্প প্রভৃতি যথোচিত ভাব সহাকারে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল।

নাঃ, তোমাদের বরখাস্ত করতে হল দেখছি। কতকগুলো গেঁয়ো ভূতের কাছে হেরে পালিয়ে চলে এলে!

কি করব হুজুর, ওপক্ষে তিন-তিনটে হাতী।

না হয় আমার হাতীটা নিয়ে যেতে।

অন্য সময় হলে নিশান রায়ের দেওয়ান ও সেনাপতি দুজনেই হেসে উঠত। কিন্তু ঐ হাতীর উল্লেখে যে তারা হাসতে সাহস করলে না, তাতেই অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে পারা যাবে। পাঠকেরা হাতীটি দেখেননি কাজেই বুঝিয়ে বলা আবশ্যক।

একবার বনওয়ারি নগরের রাসের মেলায় গিয়ে ঈশান রায় হাতীটি কিনে এনেছিল। গাঁয়ে এসে পৌছলে আবিষ্কৃত হল তার একটি চোখ কানা, আর একটি কান কালা, যতই অঙ্গহানি হোক তবু তো হাতী! ঐ হাতীর গৌরবে ঈশান রায়কে গাঁয়ের লোকে বলতে আরম্ভ করল রাজা আবার রাজার গৌরবে হাতীটি হল পাটহাতী। কিন্তু ক্রমে হাতীটির আরও গুণ প্রকাশিত হতে লাগল। হাতীটির জন্যে পিলখানা উঠল, মাহুত নিযুক্ত হল। কিন্তু পথে চলবার সময়ে উপস্থিত হল সঙ্কট। কানা চোখ আর কালা কান তার মাথার এক দিকে নয়, কাজেই ঘন ঘন তাকে পথের মধ্যে দিক পরিবর্তন করতে হয়। পথিকের পথে চলা দায়। এখানেই শেষ নয়। রাতের বেলায় শেয়ালের ডাক শুনলে হাতীটা ভয় পায়, আর যেহেতু গ্রাম্য শেয়ালের বদ অভ্যাস প্রহরে প্রহরে ডাকা, প্রহরে প্রহরে পাটহস্তী আর্তনাদ করে উঠে গ্রামের নিদ্রাভঙ্গ করে। তখন ঈশান রায় কুশী মাহুতকে বলল, ওকে কি করা যায় বলো তো! সে বলল, হুজুর আমাকে পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম হোক। তোমার মাইনে বাড়লে হাতী শান্ত হবে কেন? সে আমার দায় হুজুর, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। বর্ধিত বেতন মাহুত একখানা চারপায়া নিয়ে পিলখানার মধ্যে শয়ন আরম্ভ করল, আর শেয়াল ডেকে উঠবামাত্র হাতীর উদ্দেশে বলত, ও বাঘ নয় বাবা, বাঘ নয়, ও শেয়াল, শেয়াল। হাতী আশ্বস্ত হয়ে শান্ত হত। গাঁয়ের লোক বলতে শুরু করল হাতী বশ করবার মন্ত্র জানে কুশী মাহুত। কৈজুড়ির তিনটে হাতীর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে এই পাটহাতী নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব যখন করল ঈশান রায়, তখন ন্যায়তঃ ধর্মতঃ স্বভাবতঃ তাঁর দেওয়ান ও সেনাপতির হাসা উচিত ছিল। কিন্তু সে রকম যখন কিছু হল না তখন বুঝতে পারা উচিত ঐ দুই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর ভয়ের মাত্রাটা কত বিরাট!

ঈশান রায় বলল, এখন তোমরা খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম করো, বিকাল বেলায় তখন দেখা যাবে।

সন্ধ্যাবেলায় আবার তিনজনে মিলিত হল (ভূরিভোজনের বিকাল মানেই সন্ধ্যা), গঙ্গাপাল ও বাজু সরদার পরামর্শ করে এসেছিল, বলল, হুজুর রক্তদ'র জমিদারকে একবার শিক্ষা দিন, আপনার অসাধ্য কি ?

ঈশান রায় দুর্বৃত্ত প্রকৃতির হলেও নির্বোধ নয়, বলল, ওহে বাপু, আমার কতদূর সাধ্য বেশ জানি। রক্তদ'র গায়ে হাত তোলা আমার সাধ্য নয়।

কেন হুজুর, তারাও জমিদার আপনিও জমিদার।

বটে! দুজনেই আকাশে ওড়ে বলে কি চামচিকে আর বাদুড় এক। রক্তদ'র জমিদারকে রাজা বললে বেশি বলা হয় না। বাড়িখানা দেখেছ তো! ভিতরে বাইরে মিলিয়ে আট-দশখানা উঠান, তার চারদিকে চকমিলান বাড়ি। তিন দিক আগাগোড়া দুই মানুষ প্রমাণ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—আর একটা দিকে দীঘি। নাও ঢুকবে কোন্ দিক দিয়ে! আর ঢুকলে মাথাগুলো রেখে আসতে হবে। দেউড়িতে দোবে চোবে পাঁড়ে তেওয়ারির ভিড়, তা ছাড়া তো মুসলমান লেঠেল আছেই। ঘুড়ি উড়িয়ে লুটিস দিয়ে ঐ বাড়ি লুট করবে।

কিন্তু হুজুর কিছু তো করতে হয়, কৈজুড়ির ঘটনা তো চাপা থাকবে না।

দেখো, করতে অবশ্যই হবে, তবে কতকগুলো চাষী কৈবর্ত জেলে মাল্লা জুটিয়ে নিয়ে আর লাঠির আগায় পলো বেঁধে ওখানে সুবিধা হবে না।

এ রকম কবুল জবাবের পরে আর উত্তর সম্ভব নয়। দুজনে নিরুত্তর হয়ে থাকল। তাদের বুদ্ধির দৌড় সীমাবদ্ধ দেখে ঈশান রায় নেহাৎ দুঃখিত হল না, বুঝলো যে ওরা তাকে ডিঙিয়ে কিছু করতে সাহস পাবে না।

তবে বলি শোনো, বলে গুড়গুড়ির নলে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে জাঁকিয়ে বসে আরম্ভ করল, দেখো শাস্ত্রে বলেছে—ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। হুঁ হুঁ, পাঁচটি বৎসর টোলে পড়েছি।

শ্রোতা দুইজন আশ্চর্য হল না, কারণ এখনো তারা সকাল সময়ে সন্ধ্যাবেলায় রায়মশায়কে পথঘাটে ট'লে পড়তে দেখেছে।

শোনো রক্তদ'র রাজবাড়ি লুট করতে হবে আর তা অচিরাৎ, নইলে মানমর্যাদা দূরে থাকুক এই ব্যবসাটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

যা বলেছেন হুজুর, কি পালমশায়, পথে আসতে আসতে আমি এই কথা বলছিলাম না ?

পালমশায় নীরবতায় সম্মতি জানাল।

বলি আড়াইকুড়ি আর সোনাগাঁতি পরগণা দুটোর মুরুব্বীদের সঙ্গে তোমাদের ওঠাবসা আলাপপরিচয় আছে কি?

গঙ্গাপাল বলল, যদিচ দুটো পরগণাই মুসলমানপ্রধান তবে কিনা—

তবে কিনা ছেড়ে দাও। প্রজা হিসাবে মুসলমান হিন্দুর চেয়ে ভালো। তারা রাজার খাজনা বোঝে, কিস্তি মোতাবেক কাছারীতে এসে খাজনা আদায় দিয়ে দাখিলা নিয়ে যায়। আর হিন্দু খাজনা চাইলেই বিক্রু। যমুনার জল এক হাত বেড়েছে কি না বেড়েছে সদরে এসে কেঁদে পড়বে, বলবে, হুজুর, এবার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে। যদি বলি যমুনার ধারের জমি রাখো কেন, ইস্তফা দিয়ে দাও, বলে, যা সাতপুরুষের জমি। যাক তাহলে মুরুব্বিদের সঙ্গে আছে তোমাদের ওঠাবসা। এক কাজ করো, আজই ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো।

সেনাপতি ও দেওয়ানের মুখ দেখে ঈশান রায় বুঝতে পারল তারা কিছুই বুঝতে পারেনি।

দেখো শাস্ত্রে বলেছে, বিপদকালে শত্রুর শত্রুই মিত্র। কি এখনো বুঝতে পারলে না! রক্তদ এখন আমাদের শত্রু, আর তার শত্রু ঐ দুই পরগণার প্রজা, কাজেই তারা আমাদের মিত্র। কেমন না? কি, এতক্ষণে বুঝতে পারছ গঙ্গাপাল বাজু সরদার তো সেদিনকার ছেলে, তাদের সেদিনকার কথা মনে থাকবার নয়।

বাজু সরদার তাকালো গঙ্গাপালের মুখের দিকে।

আচ্ছা তুমিই ওকে বুঝিয়ে দাও, আমি বাড়ির ভিতর থেকে আসছি।

ঈশান রায় প্রস্থান করলে গঙ্গাপাল বলল, জোড়াদীঘির ছ'আনির জমিদারের সঙ্গে রক্তদহের কাজিয়া হয়েছিল, লাঠালাঠি মারামারি খুন জখম এসব কথা নিশ্চয় বুড়োদের মুখে শুনেছ?

বাজু সরদার বলল, আমার আজা মশাই জোড়াদীঘির লেঠেলের হাতে জখম হয়েছিলেন। কিন্তু তার বেশি আর জানি না। তখন আমি ছেলেমানুষ। তার পরে কি হল?

তারপরে সে এক মহাভারত। অত কথা বলবার সময় নেই। মামলা মোকদ্দমায় জেরবার হয়ে ছ'আনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে আড়াইকুড়ি আর সোনা-গাঁতি পরগণা দুখানা জলের দরে কিনে নিল রক্তদ'র জমিদার। কিন্তু পরগণা দুখানার প্রজা অসন্তুষ্ট হয়ে রইল। তখন তাদের উপরে আরম্ভ হল উৎপীড়ন

আর অত্যাচার। একে তো তাদের মনটা পড়ে আছে সাত পুরুষের ছ'আনির জমিদারের দিকে, তার উপরে পরন্তপ রায়ের উৎপীড়ন। তাই রায়মশায়ের ধারণা ওরা রক্তদর বিরুদ্ধে আমাদের সহায় হলে হতে পারে।

ঠিক সেই সময় ঈশান রায় ফিরে এল। বলল, ঠিক বুঝিয়েছ পাল, শত্রুর শত্রু মিত্র। এখন তোমরা দুজনে গিয়ে ওদের হাত করো গে। বল যে উপঢৌকনের ন্যায্য ভাগ তাদের দেওয়া হবে। কিন্তু ওদের রাজি করিয়ে আসা চাই। দুই পরগণার দুই মণ্ডলকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর এক কথা। এ পরামর্শ যেন কাক-পক্ষীটি না জানতে পারে! তোমার বড় মুখ আলগা বাজু সরদার, সাবধান।

গঙ্গাপাল সমর্থন করে বলল, হাঁ সরদার, হুজুরের আদেশটা মনে রেখো। দৈবাৎ জানাজানি হয়ে গেলে রক্তদ পাঁচখান। পরগণার লোক জুটিয়ে ফেলবে। তখন পালাতে পথ পাওয়া যাবে না। রক্তদ'র দেওয়ানজি বড় সর্বনেশে লোক, তার অসাধ্য কিছু নেই। আচ্ছা হুজুর, আজ তাহলে আমরা উঠি, কালকে ভোর বেলাতেই আমরা দুজনে রওনা হয়ে যাব। এই বলে ঈশান রায়কে প্রণাম করে তারা উঠতে যাবে, এমন সময়ে গঙ্গাপাল বলল, হুজুর, তাহলে কি এখন পলোওয়ানগিরি বন্ধ থাকবে?

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঈশান রায় বলে উঠল, না, না, কখ্খনো না। তাহলে লোকে ভাববে পালোওয়ানদের হার হয়ে গিয়েছে, তাদের সাহস বেড়ে যাবে আর তারা সব জুটবে গিয়ে রক্তদ'র সঙ্গে। গঙ্গাপাল, আমাদের তালিকায় কৈজুড়ির পরে কোন্ গাঁয়ের নাম যেন ছিল?

আজ্ঞে কৈজুড়ির পরে ছিল কৈডিমি।

বাঃ বাঃ বেশ, কৈজুড়ির পরে কৈডিমি। খাসা। তাহলে আজই নুটিস পাঠিয়ে দাও।

আজ্ঞে তাই হবে।

তবে এবার নুটিসের ছড়াটা একটু বদলে লিখো। কি লেখা আছে বল তো? গঙ্গাপাল বলল,

ঈশান রায়ের নিশান ধরো
রাজার খাজনা বন্ধ করো।

মাত্র এই দুটো ছত্র?

আরো ছিল, মনে নাই।

নাই থাক, এ দুটোই যথেষ্ট, কিন্তু আর দুটো নতুন ছত্র জুড়ে দিয়ো।

হঠাৎ পাই কোথায় ?

এই তো লিখে নাও, "মরেছে কৈজুড়ির লোক / তা দেখে এখন শিক্ষা হোক।"

হুজুরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে তারা বিস্মিত হল, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—শুধু লাঠি নয়—হুজুর আবার এদিকেও আছেন।

হাঁ, হুজুর সব দিকেই আছেন, দরকার হলে দেওয়ান ও সেনাপতির গর্দান নিতেও পারেন। কৈডিমি থেকে যেন দুঃসংবাদ না আসে। আর উপঢৌকনটা— ঈশান রায় তাকিয়ে দেখল তার বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয় ততক্ষণ শ্রুতিগোচরতার বাইরে গিয়ে পড়েছে।

ঈশান রায় মনের আসল কথাটা তার সেনাপতি আর দেওয়ানের কাছে প্রকাশ করেনি। কৈডিমির নামে নুটিস যাবে তবে আসল আক্রমণটা হবে রক্তদ'র রাজবাড়ির উপরে। সতর্ক হবে কৈডিমির লোকে, রক্তদ থাকবে নিশ্চিন্ত, তাই সেখানে আক্রমণ করতে আর তেমন বেগ পেতে হবে না। ঈশান রায়ের রাজ্য না থাকলেও রাজকীয় বুদ্ধির অভাব ছিল না। কোনো কর্মচারীকে কখনো বিশ্বাস করতেন না, তা যতই তারা বিশ্বস্ত হোক। ঈশান রায় মনে মনে স্থির করে রাখল কার্যকালে বাঁ দিকে না গিয়ে ডান দিকে গেলেই চলবে। এবারে সঙ্গে সে নিজে যাবে।

৯

কাজটি অত সোজা হল না। গঙ্গাপাল ও বাজু সরদার আভূমি প্রণত হয়ে ঈশান রায়কে জানিয়েছিল হুজুরের নাম শুনলেই আড়াইজুড়ি ও সোনাগাঁতি পরগণার লোক লাফিয়ে খাড়া হবে, তখন আর তাদের সাহায্য পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল পরগণা দুটির লোক আভূমি নত হয়ে শুয়ে পড়ল। এ দুটি পরগণা পাশাপাশি এমন কি অনেক জায়গায় সীমানাও সুনির্দিষ্ট নয়। দুই পরগণার দু'জন প্রধান, আড়াইজুড়ির বদন মণ্ডল, সোনাগাঁতির কলিমুদ্দিন সরকার। প্রজারা তাদের কথা বেদবাক্য মনে করত, কেউ কখনো অগ্রাহ্য করবার কথা ভাবতে পারত না। ঈশান রায় ধরেছিল ঠিক, এরা দুজনে রাজি হলেই দুই পরগণা রাজি হবে। এ পর্যন্ত ঠিক। এই পরগণাদ্বয় আবহমান

কাল থেকে জোড়াদীঘির ছ'আনির জমিদারিভুক্ত ছিল কিন্তু তারপরে কি ভাবে রক্তদহর জমিদারভুক্ত হল আগে তা বলা হয়েছে তবু তাদের চিরাগত আনুগত্যের ভাব ছিল জোড়াদীঘির প্রতি। সকলেই নিজেদের মধ্যে বলা-কওয়া করত যে তাদের আসল জমিদার জোড়াদীঘি তবে এখন পড়েছি শয়তানের হাতে—কাজেই। শয়তানই বটে! পরন্তপ রায় সাক্ষাৎ শয়তান। এমন প্রজাপীড়ক জমিদার কদাচিৎ দেখা যায়। লোকটা জমিদারির আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্ভব অসম্ভব আবওয়াব বা খাজনা ধার্য করে লাঠির জোরে আদায় করতে শুরু করল, এবং সেই মোতাবেক প্রজাদের কাছ থেকে কবুলিয়ত আদায় করতে লাগল, সেও লাঠির জোরে। আর তাছাড়া আর একটি বিচিত্র উপায় অবলম্বন করত। জমি মাপবার মাপকাঠিকে ঐ অঞ্চলে বলত 'নল', তার একটা আইন স্বীকৃত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ছিল। পরন্তপ রায় ছোট মাপের 'নল' আমদানি করে নূতন হারে প্রণালী চালু করল। তার ফলে যে-প্রজা পাঁচ বিঘা জমি ভোগ করত দেখা গেল সেটা পাঁচ নয় সাত বিঘা। তখন সেই হতভাগ্য প্রজাটিকে কাছারীতে ধরে এনে নিম্নরূপ সওয়াল জবাব আরম্ভ হত।

কি মিঞা, ফাঁকি দিয়ে সরকারি জমি ভোগদখল করছ, খাজনা দিচ্ছ পাঁচ বিঘার ভোগ করছ সাত বিঘা, এন্তেকাল হলে দোজখে যাবে যে।

(মনে মনে) সেখানেই তো আছি। (প্রকাশ্যে) হুজুর, জোড়াদীঘির জমিদার তো পাঁচ বিঘার খাজনা নিতেন।

জোড়াদীঘির বাবু মদো মাতাল ছিল, তার কি কোনো কাণ্ড ছিল।

(মনে মনে) তুমি বড় সাধু পুরুষ। (প্রকাশ্যে) হুজুর, আমার কাছে আপনিও যেমন, জোড়াদীঘির বাবুও তেমনি।

কি এতবড় আস্পর্দা, আমার সঙ্গে সেই পাজি বেটার তুলনা। চোবে—

হুজোর—

এই হারামজাদাকে ধরে নিয়ে যাও। সাত বিঘা মোতাবেক খাজনা আদায় করে নিতে বল। গোলমাল করলে কয়েদঘরে নিয়ে যাবে, তার পরে কি করতে হবে সে তো জানো।

জী হুজোর।

লোকটা পাঁচ বিঘার জায়গায় সাত বিঘার খাজনা দিয়েই নিষ্কৃতি পেলো না। জোড়াদীঘির হাত থেকে রক্তদ'র হাতে আসবার পরে যত বছর হয়েছে সুদে আসলে মিটিয়ে দিতে হল, তার মধ্যে তামাদি উসুল নাই।

প্রজাদের প্রতি এই রকম ব্যবহারে সকলের মন বিষিয়ে উঠেছিল কাজেই ঈশান রায়ের প্ররোচনায় আর লুটের মালের ভাগের আশায় পলোওয়ানাদের দলে যোগ দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে বিধাতা বাদ সাধলেন। পরন্তপ রায় মারা গেল। এই সংবাদে এই দুই পরগণার প্রজাদের কি আনন্দ। তারা সকলে মকতুম সাহেবের দরগায় গিয়ে নামাজ পড়ল, শিন্নি দিল —আর বড় দীঘির পাড়ে প্রকাণ্ড জিয়াফতের (নিমন্ত্রণ) ব্যবস্থা করে দশ-বিশটা খাসি মেরে আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে সারারাত গাওনা করে আনন্দে কাটিয়ে দিল। পরন্তপ রায় জীবিত থাকলে হয়তো তারা লুঠতরাজে রাজি হত কিন্তু এসব পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের আর সে আগ্রহ ছিল না। আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, এবারে পিছিয়ে যাওয়া আবশ্যক। গঙ্গাপাল ও বাজু সরদার সাদরে অভ্যর্থিত হল বদন মণ্ডল ও কলিমুদ্দিন সরকারের দ্বারা, ঘটনাচক্রে তারা এক জায়গাতেই ছিল।

তারা গঙ্গাপাল ও বাজু সরদারকে সাদরে নিয়ে গিয়ে মক্তবঘরে বসাল। গঙ্গাপাল বলল, এ যে পাকা দালান, এমন ক'টা গাঁয়ে আছে ?

আপনাদের দয়াতেই রাজা বাহাদুর জমিটা দিয়েছিলেন, দরাজ মন বটে রাজা বাহাদুরের।

ঘরের মধ্যে প্রশস্ত ফরাস তাকিয়া হাতপাখা নিয়ে বসাল গঙ্গাপালদের।

আপনারা রাজা বাহাদুরের খাস দপ্তরের লোক, সেনাপতি আর দেওয়ান। দয়া করে আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন।

এমন সময়ে দু'জন লোক প্রচুর পরিমাণে চাল কাঁচা ছোলা ভাজা কাঠালের বীচি ভাজা নিয়ে এলো, সঙ্গে দুই বোতল দেশী মদ।

সবিনয়ে কলিমুদ্দিন বলল, আপনারা তো আমাদের সঙ্গে খাবেন না, তাই গোস্ত পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। আপনাদের মতো লোকের জন্ত শেষে কিনা ভাজাভুজি।

বাধা দিয়ে গঙ্গাপাল বলল, সব ত্রুটি পূরণ করে দিয়েছে এই মা ধান্তেশ্বরী।

আগে খবর পেলে পাবনা শহর থেকে বিলাতির আমদানী করতাম।

দেশী থাকতে আবার বিলাতী, এসো হে সরদার।

তাহলে আপনারা আরম্ভ করুন, আমরা ততক্ষণে লোকজন জড়ো করে রাজা বাহাদুরের হুকুম জানিয়ে দি।

সেই ভালো। আজ রাতের মধ্যেই কৈডিমির দখল নিতে হবে।

সে আর বলতে।

তখন বদন মণ্ডল ও কুলিমুদ্দিন সরদার দীঘির পাড়ে গিয়ে উপস্থিত হল, .পখন দুই পরগণার প্রধানদের মধ্যে অনেকেই এসে উপস্থিত হয়েছে। আগেই সংবাদ পাঠিয়েছিল আর সেই সঙ্গে বিষয়টাও জানিয়ে দিয়েছিল।

দুই মুরুব্বীকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়াল।

আহা বসো বসো। এই যে তোমরা সবাই এসেছ, বিষয়টা কি শুনেছ তো। কি অছিমদ্দি, সব বুঝিয়ে বলেছ তো?

মণ্ডল মশাই, বলা বলে বলা, একেবারে আঁঠি ভেঙে শাঁস দেখিয়ে দিয়েছি।

হাঃ হাঃ, অছিমুদ্দি আমাদের বেশ কথা বলে।

হাসলে বদন মণ্ডলের গালে অনেকগুলি রেখা পড়ে।

তাহলে সব শুনেছ, এখন কি করবে বলো।

আপনারা দুই প্রধান থাকতে আমরা বলবার কে, আমরা তো নাবালক।

সমাগত প্রজাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, হা আল্লা, তুমি কত না শয়তান পয়দা করেছ, এক শয়তান মরে তো আর একজন গজিয়ে ওঠে।

আরে কে মরলো আর কে গজালো।

মরলো পরন্তপ রায়, গজালো ঈশান রায়. এখন বুঝি নাম ধরেছে নিশান রায়।

তা যদি বললে হায়তুল্লা, তবে বড় শয়তান পরন্তপ রায়ের বাড়ি লুটতে আপত্তি কি।

দেখ কারিগর শয়তানের ছোট বড় নাই, আর তাছাড়া এক শয়তানের সঙ্গে আপোস করে আর এক শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেই। ওতে আখেরে দুইজনের হাতেই পড়তে হয়।

ঈশান রায় ছোট শয়তান কিনা জানি না, কিন্তু বাব্বা, পরন্তপ রায়ের জুড়ি নাই। খোদা ওরকম আর একটি গড়তে পারবে না।

জব্বর বলেছে ছোকরা।

বিশ্বাস হল না বুঝি, তবে এই দেখো—বলে গায়ের চাদরখানা খুলে ফেলল; বলল, একবার পিঠের দিকে তাকাও।

সবাই বিস্ময়ে বলে উঠল, ওগুলো কিসের দাগ? ভালুকের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলে নাকি?

কি করে কি হল বলো তো কারিগর?

জানো সবাই মাঝখানে ক'টা বছর গিয়েছে বলে ভুলে গিয়েছ। এ হচ্ছে 'আস্পাতালীর' চিহ্ন।

আস্পাতালী আবার কি? ওহো, মনে পড়েছে। অনেকেই বলে উঠল।

তোমাদের মনে পড়েছে, আমার পড়েছে পিঠে।

আস্পাতালী ব্যাপারটা পাঠককে একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক, কারণ সেটা তাদের পিঠে পড়েনি।

একবার এক ছোকরা জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট গ্রামাঞ্চলে 'টুরে' বেরিয়ে লক্ষ্য করল, এ কি একটাও হাসপাতাল নেই কেন? তবে কি রায়তরা বিনা চিকিৎসায় মারা পড়ে! এতে সরকারের বদনাম। তখনি জরুরী হুকুম প্রচার হল মফঃস্বলের বড় বড় গ্রামে হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে, জমিদারে ও রায়তে ভাগাভাগি করে খরচটা দেবে, সরকারের ভাগে পড়বে সুনাম। কিছুদিন পরেই জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হয়ে গেল, তবে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। হাসপাতালের খরচা বাবদ ট্যাক্স আদায় হতে লাগল - অবশ্য হাসপাতাল কোনো গ্রামে স্থাপিত হল না। সাহেব বদলি হয়ে যেতেই অধিকাংশ জমিদার পাশ ফিরে শুলো, তবে পরন্তপের মতো জমিদার টাকায় চার আনা করে ট্যাক্স চাপিয়ে দিল প্রজাদের উপরে। এই ট্যাক্সের জমিদারি সেরেস্তায় নাম পড়লো 'আস্পাতালী।'

অনেকেই পরন্তপের ভয়ে আস্পাতালী দিয়ে ফেলল, এই হতভাগ্য নিয়ামুদ্দি যার ডাকনাম কারিগর দিতে অস্বীকার করল। বলল, হুজুর, আস্পাতাল কি জানি না, ঐ আব্ওয়াব দেব না।

কি দেবে না—এত বড় কথা, চোবে—

হুজৌর বলে চোবে এসে উপস্থিত হয়ে সেলাম করে দাঁড়াল।

নিয়ে যাও হারামজাদাকে কয়েদঘরে।

পরন্তপ রায় যখন বসে আপনমনে আলবোলার নলে ধূমপান করছে কয়েদঘর থেকে শোনা যেতে লাগল ছাপরাই নাগরা জুতোর চটাপট শব্দ আর তার প্রতিক্রিয়ায় করুণ কান্না। এমন কিছুক্ষণ চলল, কিন্তু তাতে আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় আরম্ভ হয়ে গেল তীব্র আর্তনাদ। বুঝতে পারা গেল এবারে লোকটার পিঠের উপরে পড়ছে শঙ্করমাছের কাঁটাওয়ালা লেজের চাবুকের শব্দ। এবারে ফল হল অপ্রত্যাশিত, হঠাৎ চোবেজি চিৎকার করে উঠল, শালে লোক হামকো মার দিয়া—অসহায় প্রহৃত ব্যক্তি প্রহারকর্তার বাম বাহুতে বাঙালীর শেষ অস্ত্র দন্তাস্ত্র প্রয়োগ করেছে। চোবের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কয়েদ

ঘর থেকে বেরিয়ে দেউড়ির দিকে ছুটলো আর পিছু পিছু চোবে পাকড়ো পাকড়ো বলে তাড়া করল, কিন্তু পাকড়াবে কে, দোবে পাঁড়ে তেওয়ারির দল উদ্যোগ করতে করতেই রক্তঝরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ছুটে বেরিয়ে গেল একেবারে সোজা দুই মাইল দূরবর্তী পুলিসের থানায়। দারোগা এনাম আলি পিঠের অবস্থা দেখে বলল, এখানে কি হবে, হাসপাতালে যাও। তখন একবার কারিগরের (লোকটার নাম) মনে হল হাসপাতাল কোথায়, ভাবল তবে বোধ হয় 'আস্পাতালী' দেওয়াই ভালো ছিল। আমরা বিষয়টি কিছু বিস্তারিত ভাবেই বর্ণনা করলাম কারণ ব্যাপারটা চারদিকে জানাজানি হয়ে যাওয়ার ফলে কয়েদ-খানায় শঙ্করমাছের লেজের চাবুক প্রয়োগ বন্ধ হয়ে গেল। সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা।

মীমাংসা আর কিছুতেই হয় না। কথায় কথা বেড়ে যায়, আবার এদিকে দুপুর গড়িয়ে যায়। তখন একজন বলে উঠল, নিশান রায়ের লোক দুটো কি করছে দেখা দরকার। তখন মনে পড়ল লোক দুটোকে মক্তবঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

যাও তো হায়তুল্লা, দরজার বাইরে কান পেতে শুনে এসো তারা কি করছে।

হায়তুল্লা ফিরে এসে বলল, তারা নাকের ডাকে 'বামে পানি' মাপছে।

সে আবার কি রে!

কেন শোননি মণ্ডল, নদী দিয়ে কলের জাহাজ যখন যায় সারেঙ হাঁকতে থাকে, বামে বাম, বামে দুই বাম, বামে চার বাম, বামে পানি মেলে না। লোক দুটোও তেমনি নাক ডাকিয়ে বামে পানি মাপছে।

সকলে হেসে উঠল। ছোকরা বেশ বলেছে।

একজন বলল, নিশান রায়ের লোক দুটোকে এই সময়ে নিকেশ করে দিলে হয় না। একবার ওপারে চলে গিয়ে দেখুক বামে পানি মেলে কিনা।

বদন মণ্ডল বলল, ছিঃ ছিঃ, এমন কথা বলতে নাই, দূতকে প্রাণে মারতে নাই।

তবে ও দুটোকে নিয়ে কি করা যায়।

ওরা যেমন ঘুমোচ্ছে ঘুমোক, ওদের নিয়ে তো সমিস্যে নয়।

এমন সময়ে সেই কারিগর নামে পরিচিত লোকটা বলে উঠল, আমার একটা কথা শুনুন। পরন্তপ রায় মরেছে রাজ্যের লোকের হাড় জুড়িয়েছে, এখন তার বাড়ি লুট করতে যাব কেন। রানীমা তো কোনো দিন কোনো [illegible] ক্ষতি

করেনি। খাজনা মাপ, ঘরপুড়ি, বানভাসি সব বিপদে সাহায্য করেন। না মণ্ডলমশাই, না সরকারমশাই, তাঁর বাড়ি লুট করা বেইমানি হবে তা আমরা পারবো না।

কারিগরের কথায় সকলেই খুশি হল, সবচেয়ে বেশি খুশি হল বদন মণ্ডল আর কলিমুদ্দি সরদার। তারা এই কথাটাই ওদের মুখ দিয়ে বের করে নিতে চাইছিল।

তারা দু'জন বলল, বেশ, তোমাদের যখন তাই ইচ্ছে তবে তাই হোক।

এবারে আরম্ভ করল অছিমুদ্দি: কারিগর ভাই যা বলল আমাদের সকলেরই তা মনের কথা। ঐ সঙ্গে আমি একটা কথা জুড়ে দিতে চাই। আমরা সকলে এখনো মনে মনে জোড়াদীঘিকে জমিদার বলে মানি, খাজনা যাকেই দিই না কেন মনে করি জোড়াদীঘির বাবুকেই দিলাম।

মনে মনে দেওয়ার কোনো দায় নাই কিন্তু জমিদার যদি অনাদায় বাবদ নালিশ করে তখন কি জবাব দেবে?

সবাই মিলে খাজনা দেওয়া বন্ধ করলে তখন কে বা জবাব চাইবে আর কে বা জবাব দেবে!

এ তো লড়াই-এর মতো মনে হচ্ছে, দু'চার জনের বিরুদ্ধে লড়াই চলে কিন্তু দুটো পরগণার বিরুদ্ধে লড়াই করবে কে?

বেশ, এই যদি তোমাদের মনের কথা হয় তবে একদিন মজলিশ ডাকো, দুই পরগণার লোক আসুক।

মজলিশ আবার কেন! তোমরা দুই পরগণার দুই প্রধান এখানে আছ, তোমরা যা বলবে তাই লোকে মেনে নেবে।

তাহলে নিশান রায়ের লোক দুটোকে কি বলা?

কিছুই বলা নয়, জেগে উঠতেই আরো দু'বোতল দেশী যুগিয়ে দাও। ওরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোয়াব দেখুক।

এতক্ষণ মজলিশের এক কোণে একজন বিপুলকায় ব্যক্তি তার বিপুলতর উদর নিয়ে বসেছিল। এতক্ষণের মধ্যে একবারও মুখ খোলেনি, এবারে বলল, আমি তো দেখছি আপনারাই খোয়াব দেখছেন।

সকলে সচকিত হয়ে দেখল কেদার মণ্ডল মুখ খুলেছে। বৈদ্যরা বলেছিল বিপুল একটি প্লীহা তার উদরের বিপুলতার কারণ, কিন্তু গাঁয়ের লোকে জানতো ঐ উদর পাটোয়ারী বুদ্ধিতে ঠাসা। গাঁয়ের যাবতীয় জটিল সমস্যার সমাধান করে দেয়। সে বলল, মণ্ডলমশাই আর সরকারমশাই শুনুন।

মণ্ডলরা বলে উঠল, তোমরা সবাই চুপ করো, দেখা যাক কেদার ভাই কি পরামর্শ দেয়।

কেদার বলল, আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তবে লোক দুটোকে ছেড়ে দিন।

তার পরে ?

তার পরে তাদের বলে দিন তোমরা গিয়ে নিশান রায়কে জানাও যে আমরা যথাসময়ে যাব।

কি বলছ কেদার ভাই, গিয়ে রক্তুদ'র রাজবাড়ি লুট করবে।

আগে সবটা শুনুন। আমরা গিয়ে নিশান রায়ের দলকে আক্রমণ করে লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে হাত পা ভেঙে তাড়িয়ে দেব।

একজন প্রশ্ন করল, তাতে আমাদের কি লাভ হবে, বরঞ্চ নিশান রায়ের দলে যোগ দিলে লুটের ভাগ পাওয়া যেত।

কেদার বলল, এই না তোমরা বলছিলে মনে মনে এখনো তোমরা জোড়াদীঘির বাবুদের প্রজা।

মনে মনে কেন, দরকার হলে সকলের সম্মুখে চিৎকার করে বলতে পারি—এই বলে কারিগর বলে পরিচিত সেই লোকটা সজোরে বুকের উপরে চাপড় মারল কিন্তু আমার পিঠের উপরে যখন শঙ্করমাছের চাবুক পড়ছিল তখন কি জোড়াদীঘির বাবু রক্ষা করেছিলেন!

তখন তিনি ছিলেন না।

এখনো নাই।

যাতে থাকেন তার চেষ্টা করো।

তাঁর তো এন্তেকাল হয়েছে।

কিন্তু তাঁর ছেলে আছে, এখন তিনিই আমাদের জমিদার।

কেদারের উক্তিতে সমস্ত মজলিশ যেন এতক্ষণের চটকা ভেঙে সজাগ হয়ে উঠল।

মণ্ডল দু'জন আর ছোট বড় সকলকে স্বীকার করতে হল কেদারের উদরের স্ফীতি কেবল পিলে লিভারের কৃপায় নয়।

এতক্ষণ এই সহজ কথাটা আমাদের মনে হয়নি।

বৃদ্ধেরা বলল, আমরা শুনেছি দর্পনারায়ণ বাবুজি তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

দলের মধ্যে একজন হিসেবী লোক ছিল, সে পাটের দালাল, বলল, কাজটা অত সোজা নয়। মনে মনে স্বীকার করার যে কোনো দায় নাই কিন্তু এখন তাঁকে জমিদার সাজাতে গেলে অনেক বাধা।

কেমন ?

পয়লা কথা দর্পনারায়ণ বাবুজি এখনো বেঁচে আছেন কি না কেউ জানে না। তার পরে—

দাঁড়াও দাঁড়াও, তিনি না থাকেন তাঁর ছেলে আছে।

আমার কথাটা শেষ করতে দাও, কোথায় আছেন কে বলতে পারে ?

সেটা তদন্তের বিষয়, এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

কেদার ভাই আরও আছে। তাঁর হাতে নিশ্চয় টাকাপয়সা নাই, মামলায় সর্বস্বান্ত না হলে কেউ গ্রাম ছেড়ে বেগানা হয়ে যায় না।

মণ্ডল মশাই, এই পাটের দালালের সঙ্গে কথা বলা আর পাট বেচা প্রায় এক কথা।

বদন বলল, কেদার ভাই, আমি ওকে জানি ওঁর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে পাট বেচা অনেক সহজ। আমি বুঝিয়ে বলি শোনো ইমারৎ পরামানিক (ওটাই তার নাম), আমাদের দুই পরগণার খাজনা যদি জোড়াদীঘির বাবুকে ইরসাদ করি তবে টাকার অভাবের আপত্তি মিটে গেল।

তা কি সবাই দিতে রাজি হবে ?

কেন হবে না। এই মজলিশে ছোট বড় প্রধান পরামানিক সবাই আছে, তোমরা মনের কথা খুলে বলো।

ইমারৎ পরামানিক বলল, এখনো আমার কথা শেষ হয়নি।

কেদার বলল, ভাই এ পাটের আড়ত নয়, দালালি করো না, যা বলবার আছে চটপট বলে ফেলো।

ধরো যদি মামলা বেধে ওঠে ?

খুবই সম্ভব।

কাজিয়া করতে যাচ্ছ আর মামলা চালাতে পারবে না, তাছাড়া রানীমার ওয়ারিশ নাই, কার জন্যে এত কৈফেৎ করতে যাবেন। এ দুটো পরগণা গেলেও তাঁর যথেষ্ট থাকবে।

যদি দত্তক নিয়ে থাকেন ?

নিলে কি শোনা যেত না ?

ইমারতের কথার দালালিতে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কেউ কেউ বলে উঠল, আর কিছু থাকে তো বলে ফেলো।

ইমারতের আর কিছু বক্তব্য ছিল না। তখন আবার কেদার আরম্ভ করল, শোনো তোমরা সবাই। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি, মোল্লার এই মেহেরবানি।

বাঃ বাঃ, কেদার ভাই এতও জানে। ওর পেটটি আমাদের পরগণার বুদ্ধির সিন্দুক। এবার মেহেরবানিটা বুঝিয়ে বল।

ঈশান রায়ের ইচ্ছা আমরা তার সহায় হয়ে কৈডিমি লুটতে যাই। এটা হল শয়তানি।

আর শয়তানের উপরে শয়তানি বলতে কি বুঝছ ভাই?

ঈশান রায়ের দল যখন কৈডিমি লুটতে যাবে আমরা তখন অন্য পথে গিয়ে লুট করবো নিশান রায়ের বাড়ি, আবার বেটা বলে কিনা রাজবাড়ি। দেখা যাবে দেউড়িতে ক'টা দোবে চোবে তেওয়ারি আছে।

সকলে সমস্বরে বাহা বাহা করে উঠল। মফিজুদ্দিন বলল, আর ভাই তোমার ঐ সিন্দুকে আর কি কি আছে বের করো।

সিন্দুক বল সিন্দুক, জালা বল জালা, একেবারে ঢাকাই জালা। শোনো সরকারমশাই আর মণ্ডলমশাই, এখন ঈশান রায়ের লোক দুটোকে ছেড়ে দাও। বলো যে আমরা ঠিক সময়ে দলবল নিয়ে কৈডিমিতে যাব, এখন তোমরা এগোও।

আরে ভাই ওদের কি আর আগু-পাছু করবার ক্ষমতা আছে, চার বোতল ধান্যেশ্বরীর কৃপায় ওরা অচৈতন্য।

তবে এক কাজ করো, একখানা গোরুর গাড়িতে করে পাঠিয়ে দাও, ওরা গিয়ে ওদের রাজাবাহাদুরকে দণ্ডবৎ করুক গে।

ওরা দণ্ডবৎ হয়েই পড়ে আছে।

তবে আর ভাবনা কি, দণ্ডবৎ করতে করতেই গিয়ে পৌঁছাক।

অনেকে বলে উঠল, তারপরে তো ঈশান রায়ের দণ্ড আছেই।

কিন্তু আসল কথা মনে রেখো, আমাদের মতলবখানা যেন ঘুণাক্ষরে না বুঝতে পারে।

বদন মণ্ডল আশ্বাস দিল, না, তা পারবে না।

এখনি উঠো না মণ্ডল, আসল কথাটাই এখনো বলা হয়নি। দর্পনারায়ণ বাবুজির ছাওয়ালকে খুঁজে বের করতে হবে।

মণ্ডল বলল, এ কাজ কেদার ভাই তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

বেশ, তোমাদের যদি তাই ইচ্ছা তবে তাই হবে।

সে মনে মনে আগেই স্থির করে রেখেছিল জোড়াদীঘি গাঁয়ে যাবে—আর সেখানে কেউ না কেউ নিশ্চয় জানবে দর্পনারায়ণের খোঁজ।

প্রকাশ্যে বলল, জোড়াদীঘির বাবুদের পক্ষে মহাল দখল নিতে গেলে রক্তদ'র পক্ষ থেকে মামলা গিয়ে রুজু হবে, তখন বাদীকে হাজির না করতে পারলে হাকিম কলমের এক আঁচড়ে মামলা খারিজ করে দেবে।

মফিজুদ্দি বলে উঠল, কেদার ভাই, আমার জমিদারি থাকলে তোমাকে নিশ্চয় দেওয়ান করে দিতাম।

আর আমি নিশ্চয় নিতাম না।

কেন ?

কারণ তোমার জমিদারি নাই।

এবারে খাজনা কোন্ জমিদারকে দেবে বল ?

সে তো ঠিক হয়েই আছে।

ওরকম ঠিক শেষ পর্যন্ত বেঠিক হয়ে যায়।

ঐ যে ইমারত নামে লোকটা যার কথার দালালিতে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল এখন হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠল, খোদার কসম, এই হাতে রক্তদ'র জমিদারকে খাজনা দেবো না।

সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল তার দোনোমনো ভাব দেখে—এখন দেখলে সে সর্বাগ্রে খোদার নামে কসম করল, তখন সমস্ত জনতা সমবেত কণ্ঠে গগনভেদী রবে বলল, খোদার কসম, এ হাতে রক্তদ'র জমিদারকে খাজনা দেবো না।

ঠিক সেই সময়ে গোরুর গাড়ির উপরে দণ্ডবৎ শয়ান গঙ্গাপাল ও বাজু সরদার সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, ঐ বজ্র রবে তাদের খোয়াবের একটা দিক একটু আলগা হয়ে গেল, স্বরটা শুনলো কানে কিন্তু অর্থটা ঠিক মগজে গিয়ে পৌঁছল না। তারা নেশাজড়িত কণ্ঠে শুধাল, ও কিসের হল্লাবাজী !

বদন মণ্ডল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল, এরা সকলে খোদার নামে কসম নিচ্ছে যে রক্তদ'র জমিদারকে আর খাজনা দেবে না। রাজাবাহাদুরকে গিয়ে জানাবেন, ইনাম মিলবে, আর তাঁকে আমাদের বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাবেন।

নিশ্চিন্ত হয়ে দু'জনে ফিরে শয়ন করল। সঙ্কটকালে এ দেশ সর্বদা পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করে।

বদন মণ্ডল মনে মনে হাসতে হাসতে মজলিশের মধ্যে ফিরে এসে সব কথা অবগত করালো। সে তখন স্বগত ভাবে উচ্চারণ করছিল—

মোল্লার মেহেরবানি,
শয়তানের শয়তানি।

১০

'দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ'—এই শব্দ কয়েকটি মধুক্ষরা মৌমাছির মতো অনেক দিন দীপ্তিনারায়ণের মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেক দিন অনেক দিন. গুণতে গেলে বেশি নয় কিন্তু গণিতের চাল আর মনের তান তো এক নয়, দুয়ে মিলতে চায় না। সে যখন কর্তা মায়ের মুখে শুনলে সে রক্তদহর জমিদারগৃহিণী কাজেই ঐ চন্দনী তার মেয়ে, দীপ্তিনারায়ণের সুখস্বপ্ন বজরার ছাদ ফুটো করে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল আর সে নিজে বজরার পাটাতন বিদীর্ণ করে পড়ে গেল অতল জলে। স্বপ্নের অলীক জগৎ থেকে নিজেকে সবলে ছিন্ন করে নিয়ে যখন বজরার বাইরে আসছিল এমন সময়ে কোমল একখানি হাত জড়িয়ে ধরলো ওর প্রকোষ্ঠ, আর কোমলতর কণ্ঠে শুনতে পেলো 'দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ।' তার জীবনে এই প্রথম কিশোরী নারীর স্পর্শ, এই জীবনে প্রথম তার কিশোরী নারীর 'তুমি' সম্বোধন, এ যে অভাবিত। ঐ স্পর্শ ঐ সম্বোধনে সহসা তার কৈশোর অবসিত হয়ে জাগিয়ে দিল যৌবনের প্রথম উষা। এমন শুভ যোগাযোগ জীবনে মাত্র একবারই আসে, তাও আবার সকলের জীবনে নয়।

অধিকাংশ পুরুষের জীবনেই কৈশোর থেকে যৌবনে কখন পদার্পণ হয় কেমন করে হয় হতভাগ্যের দল জানতেও পারে না। সে যখন চন্দনীর হাতের স্পর্শের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে 'দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ'-এর গুঞ্জন কানে না তুলে চলে এলো তখনো সে জানতো না কি পরিবর্তন ঘটে গেল তার জীবনে। অবশ্য জেনেছে তবে অনেক পরে, অনেক বড় জানারই এই প্রকৃতি। আদি দম্পতি নন্দন কাননের বাইরে পদার্পণ করবার সময়ে কি জানতে পেরেছিল কি মহৎ বিপর্যয় ঘটে গেল তাদের জীবনে। দীপ্তিনারায়ণ জেনেছে অনেক পরে।

চন্দনীর সুখময় স্পর্শ, চন্দনীর মোহময় কণ্ঠস্বর আর ঐ অর্থগূঢ় সম্বোধন 'দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ' আজ এই ক'মাস (ক'মাস গণনায় বারে বারে ভুল হয়ে যায়) তার সঙ্গ ছাড়েনি, না নিদ্রায় না স্বপ্নে, না জাগরণে। যে ক'দিন কর্তা-

মায়ের বজরা সঙ্গে ছিল (ক'দিন গণিতের তালে আর কালের তালে মেলে না) আর যতদিন চন্দনীর বাড়ির দোতলায় ছিল তাকে জড়িয়ে যে বল্লরী উঠেছিল সে কি জানতো সেটা আলোকলতা, মাটির সঙ্গে যার যোগ নাই।

চন্দনীকে যতদিন দেখেছে মনে হয়েছে অসাধারণ সুন্দরী কিছু নয়, বিশেষ ঐ মায়ের এই মেয়ে। কর্তামায়ের চোখ দুটি টানাটানা প্রতিমার মূর্তির চোখের মতো, সে চোখ স্থির অচঞ্চল স্নিগ্ধ। আর চন্দনীর চোখ দুটি অত বড় নয়, আর স্থির অচঞ্চল স্নিগ্ধ তো নয়ই, তারা যেন নাড়াখাওয়া হীরকখণ্ডের মতো, নানা দিকে রশ্মি বিকিরণ করে নড়ছেই। ওষ্ঠাধর রাঙা পাতলা আর এমন একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয় দীপ্তিনারায়ণের মনে নিজের কাছে স্বীকার করতেও তার লজ্জা বোধ করে। আর তার গায়ের রঙে কর্তামায়ের মাতৃত্বকে অস্বীকার করে। পাথরের, চন্দনীর, না এ পর্যন্ত কোনো মহাকবি নারীর গায়ের রঙের যথাযথ বর্ণনা করতে পারেননি, না, সে চেষ্টা করব না। নাকটা ঈষৎ চাপা। অনেক পুরুষেই বলবে চন্দনীকে সুন্দরী বলা যায় না। তাদের কাছে 'রূপের দৌড় চামড়া পর্যন্ত'। দীপ্তিনারায়ণের কাছে চন্দনী রূপসী, কারণ সে ভালোবেসে জেনেছে তাকে। এর উপরে আর কথা নাই।

সেদিন ডাকাতে কালীর ভিটেয় গিয়ে সে মানৎ করেছিল মা চন্দনীর সঙ্গে যেন আমার বিয়ে হয়, চন্দনী কি মানৎ করেছিল বলেনি কিন্তু সে গোপন শপথ প্রকাশ হয়ে গেল 'দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ' সম্ভাষণে আর ঐ মিনতি-মৃদু করস্পর্শে। আরও বুঝেছিল মেয়ের শপথ আর তার মায়ের শপথ এক বই নয়।

দীপ্তিনারায়ণ ভাবে আচ্ছা স্বপ্নদর্শন কি ইচ্ছাধীন? চেষ্টা করলে কি ঈপ্সিত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখতে পাওয়া যায়। শুনেছিল চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই, তবে স্বপ্ন কেন চেষ্টাসাধ্য না হবে। এই স্থির করবার পরে প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময়ে চন্দনীর কথা ভাবত, চন্দনীর সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল মনে আনবার চেষ্টা করত, ঐ চেষ্টার টানে স্বপ্ন না এসে ঘুম এসে পড়ত, ঘুমের মধ্যে কত অবাঞ্ছিত লোক, কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখেছে, কিন্তু চন্দনীকে কখনো চোখে পড়েনি। একবার দেখেছিল বাস্তবের চেয়েও স্পষ্টতর ভাবে দেখেছিল তার বাবা ও সে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে জোড়াদীঘির গ্রামে। আর একদিন দেখেছিল বাবা আর সে ডাকাতে কালীর ভিটেয় এসে শপথ গ্রহণ করছে। রক্তদহের বিরুদ্ধে জীবনে মরণে প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ। সে যখন পিতাকে অনুসরণ করে ঐ শপথবাক্য উচ্চারণ করল, সে স্পষ্ট দেখতে পেল তাঁর চোখ

দিয়ে জল গড়াচ্ছে। এ জল দুঃখের নয়, সুখের আগাম দাদন কড়ি। তার মনে হয় একদিন বুঝি চন্দনীকে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিল একদল লোকের মধ্যে মিলিয়ে বসে আছে, তার মুখের কতক দৃশ্য কতক অদৃশ্য, দৃশ্যে অদৃশ্যে সে এক আলো-আঁধারির ব্যাপার। এক একদিন সঙ্কল্প করেছে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়বে, যাবে তাদের গ্রামে তার পরে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দেবে ঘটনাচক্রের হাতে। চন্দনী যদি রাজি থাকে তবে তাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে চলে আসবে, হাঁ, মায়ের অমতেই যদি মেয়ে রাজি হয়। মেয়ে রাজি হবে বলেই ধারণা, তাহলে তো সমস্ত বাধা অপসারিত হবে, চন্দনীর সঙ্গে হবে তার বিয়ে। কিন্তু কোথায় কোন্ গ্রামে তার বাড়ি। ভেবেছিল বজরাগুলি নিয়ে রওনা হওয়ার আগে মিনতি করে জেনে নেবে, জানতো কর্তামা নিশ্চয় জানাবেন। সেই জানাই জানলো, সেই জানানোই জানালেন তবে কি মর্মান্তিক জানা। নির্দয় নিয়তি কি অন্তিম দান নিক্ষেপের জন্য শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে ছিল? দীপ্তিনারায়ণ যখন ভাবছিল তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার এতদিনের জল্পনা-কল্পনা, এত রাত্রের স্বপ্নমৃগয়ায় শরসন্ধান শেষ পর্যন্ত একদিন বিবাহের হোমানলে উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তখন এ কি দারুণ অশনিসম্পাত। কর্তামা নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, বাবা আমরা তো চললাম, আমাদের মনে রেখো, ভুলে যেয়ো না। দীপ্তি হেসে বলেছিল, এ তো বেশ রহস্যে ফেললেন, আপনাদের নামধাম কিছুই জানালেন না। ফলটাকে ধরে রাখতেও একটু বোঁটার দরকার হয় সেটুকুও দিলেন না, কি ধরে মনের মধ্যে টাঙিয়ে রাখব।

সেই কথা বলবার জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে এলাম এখানে। আমাদের পরিচয় জানলে বুঝতে পারবে কেন জানাইনি এতদিন আমাদের পরিচয়। তুমি নিশ্চয় শুনেছ এই চলনবিলের অপরদিকে রক্তদহ নামে এক ঘর জমিদার আছে, অনেকে তাদের রাজা বলে থাকে। রাজা না হোক বড় জমিদার বটে—

এই পর্যন্ত যতক্ষণ সে শুনছিল পিতৃসত্যের তাপে তার শরীর কাঁপছিল, তার পরে যখন কর্ত্রী বললেন আমি সেই জমিদারবাড়ির গৃহিণী, অকস্মাৎ বজরার ছাদ ভেঙে গিয়ে তার সমস্ত আশাভরসা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল, আর বজরার পাটাতন খসে গিয়ে অতলে তলিয়ে গেল সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। কি করছে ভাববার অবকাশ হল না, উল্কার মতো কামরা পরিত্যাগ করে ছুটে বেরিয়ে এলো, জানতো না সেই কামরাটায় আবার চন্দনী তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে ত্বরিতে তার হাত ধরল। কিশোরী কুমারীর একাকী

অন্ধকারে অনাত্মীয় যুবকের হাত ধরা এ প্রায় পাণিগ্রহণ। হাত টেনে নিয়ে বেরিয়ে যেতে দীপ্তি যখন উদ্যত চন্দনীর মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল—'দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ', তাতেও যখন দীপ্তিনারায়ণ ধরা দিল না, ধরা দিতেই গিয়েছিল চন্দনী, তখন তার অভিমান এক মোচড়ে সপ্তমে গিয়ে পৌছল। সে ছুটে এসে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়, তখন পাশের কামরায় বৃন্দাবনী মাসী মন্দিরায় মৃদু নিক্কণে আপন মনে গান করছিল—

'তুয়া পথ ধ্যেই
রোই দিন যামিনী
অতি দুবার ভেল বালা।
কি রসে বুঝায়ব
ঐছে নিবারব,
বিষম কুসুম শর জ্বালা।'

গানের বয়ান শুনে চন্দনীর অভিমান ক্রোধে পরিণত হল আর সে ক্রোধের লক্ষ্য বৃন্দাবনী মাসীকে ছাড়িয়ে বৃন্দাবনে শ্বশুরের উপরে গিয়ে পড়ল, সে চিৎকার করে বলে উঠল, মাসী, তোমার ঘ্যানঘ্যানানি রাখো তো, রাধা ছিল প্যানপেনে মেয়ে, তেমন তেমন রাধার পাল্লায় পড়লে ব্রজরাজ জব্দ হয়ে যেত।

মাসী আপনার কামরায় বসে চন্দনীর প্রত্যুত্তর আছে এমন পদের সন্ধান করতে লাগল।

এতদিন দীপ্তিনারায়ণ নিজের মনটা নিয়েই ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত ছিল তার বিশেষণ আর অনুসরণে, একবারের জন্যও চিন্তা করেনি তার যদি এত দুঃখ হয়ে থাকে তবে না-জানি চন্দনীর দুঃখ কত হবে, আদৌ হবে কি, সে কি এমনই ভাবে তন্নতন্ন করে নিজের মনটা নিয়ে বিচার করে দেখছে। তখনি মনে হল ও ছেলেমানুষ, ওর আবার দুঃখ কি, ওর দুঃখ হতে যাবে কেন। এতেই বুঝতে পারা যায় দীপ্তি-নারায়ণও ছেলেমানুষ নইলে বুঝতে পারত দুঃখ কখনও একতরফা হয় না। যে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয় সে লাঠিও যে আহত হয়। চন্দনী দুঃখ পাচ্ছে জানলে মনে একপ্রকার সান্ত্বনা পেত, হয়ত পাচ্ছে তবে জানবার উপায় নাই। পিতার নিষেধ তার পক্ষে দুর্বহ বাধাসৃষ্টি করেছিল, ওপক্ষে নিশ্চয় তেমন নিষেধ নাই। যদি এ নিষেধ না থাকত তবে কোন দিন সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়ে হাজির হত তাদের বাড়িতে, কর্তামাকে বলত আর কিছু নয় পান্টা সাক্ষাৎ করতে এলাম। বেশ করেছ বাবা বলে ডেকে পাঠাতেন চন্দনীকে, দেখো

তোমাকে দেখতে কে এসেছে। না মা, আমি আপনাদের সকলকেই দেখতে এসেছি। সকলের মধ্যেও ও-ও তো বটে। বেশ তো আমাকে বাদ দিয়েই না হয় সকলকে দেখুন আমার আপত্তি নাই। এমন সময় কর্তামা কোনো ছুতো করে উঠে যেতেন, ওরা তখন দুজনে একা।

এবারে সত্যি করে বলুন তো হঠাৎ কেন এই শুভাগমন।

যদি বলি তোমাকে দেখতে।

ওটা মিথ্যা হল।

তবে যদি বলি 'দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ কেন বলেছিলে' জানবার জন্যে।

এটাও সত্য হল না।

কেন?

ঐ সামান্য একটা কথার উত্তর জানবার জন্যে কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে বিশ-পঁচিশ ক্রোশ পথ আসে না।

তেমন তেমন গরজ থাকলে আসে বইকি।

গরজটা কি শুনি।

যার গরজ সে বোঝে, অপরে কি বুঝবে।

এই উত্তর দেবার জন্যে এসেছেন।

বেশ আসা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে এখনি ফিরে চললাম।

ফিরে তো যাবেনই, থাকবার জন্যে তো আসেননি, কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। সেদিন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বজরা থেকে নেমে গেলেন কেন?

এমন প্রশ্নের সম্মুখে পড়তে হবে জানলে আসতাম না।

এসেই যখন পড়েছেন উত্তর না পেলে ছাড়ব না।

তবে কি চিরকাল আটকে রাখবে নাকি?

এমন অস্থিরমতি লোককে আটকে রাখতে চায় কে? আর তাছাড়া এসেছেন মায়ের কাছে, রাখবার ছাড়বার মালিক তিনি। আমি কে?

যদি বলি তুমিই সব।

দীপ্তির কথায় হেসে উঠল চন্দনী।

হাসলে কেন?

কাঁদলেই কি সুখী হতেন?

বোধ হয়।

তবে শুনে রাখুন ঐ ঘটনার পর থেকে প্রতিদিন রাতে লুকিয়ে কেঁদেছি। মা যদি জিজ্ঞাসা করতেন চন্দনী কাঁদিস কেন, বলতাম সর্দি লেগেছে। মা নিশ্চিন্ত হতেন, কিন্তু বৃন্দাবনী মাসী যেন বুঝত, গুনগুনিয়ে উঠত 'ধুয়ার ছলনা করে কাঁদি'।

কি, উত্তর পেলেন ?

না সবটা নয়।

বাকি রইল কি ?

আপনি হঠাৎ "তুমি" হতে গেল কেন ?

এর উত্তর তো আপনি দেবেন।

বাঃ বাঃ, তোমার মুখে 'আপনি' হল 'তুমি'—আর উত্তর দেবার দায় আমার।

তবে নিতান্তই শুনতে চান ?

নিশ্চয়।

তবে শুনুন—

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়বার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল দীপ্তিনারায়ণের, ধড়মড় করে জেগে উঠল। প্রথমটা তার বিশ্বাস হতে চায়নি যে এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। আশেপাশে চেয়ে দেখল কোথাও চন্দনীর চিহ্ন নাই, সেই তার খাট পালঙ্ক, আয়নায় সেই পর্দা। মাথায় হাত দিয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকল আর কিছুক্ষণ পরেই সেই পরম উত্তরটা যখন শুনতে পেতো তখন কোন্ নির্দয় বিধাতার হাত নাড়লো দরজার কড়া। কিন্তু বিধাতার চেয়েও নির্দয় মানুষ দরজার কড়া নাড়তেই লাগল।

কে ? কে কড়া নাড়ে ?

আজ্ঞে আমি মোহন। মোহন কুঠিবাড়িতেই থাকে।

এত রাতে কি রে ?

রাত কোথায়, অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গিয়েছে—দরজা খুলুন।

দরজা খুলতেই হল। খোলা দরজা দিয়ে একঝলক ভোরের আলো ঘরে ঢুকে স্বপ্নের শেষ রেশটুকু ধুয়ে মুছে দিল।

মধুর স্বপ্ন ক্ষণিকই হয়।

কি রে, ডাকাডাকি কেন ?

কোথা থেকে দুটি লোক এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আর দু'দণ্ড কি অপেক্ষা করতে পারত না ?

ঘোর থাকতেই এসেছে, বলে তাদের তাড়া আছে।

আচ্ছা যা বৈঠকখানায় নিয়ে যা, আমি আসছি।

হাত মুখ ধুয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে দেখতে পেল দু'জন লোক বসে আছে তাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সসম্ভ্রমে কাছে এসে তার হাঁটু স্পর্শ করে সেলাম জানিয়ে পায়ের কাছে দুটি করে টাকা রাখলো।

দীপ্তিনারায়ণ জমিদারের ছেলে জানতো ওটা নজর। কিন্তু নজর তো জমিদারকেই দেয়। বলুন, আমাকে কেন? আমি তো তোমাদের চিনতে পারছি না।

হুজুর আমরা আপনার সোনাগাঁতি পরগণার প্রজা।

প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারল না, বলল, সোনাগাঁতি পরগণা! সোনাগাঁতি পরগণা—আমার, আমি তো বাপু কিছুই বুঝতে পারছি না।

না পারবারই কথা, হুজুর তখন ছেলেমানুষ ছিলেন। দর্পনারায়ণ বাবুজির সময়ে সোনাগাঁতি আর আড়াইকুড়ি পরগণা দুটো জলের দামে কিনে নেয় রক্ত দহের জমিদার পরন্তপ রায়, তার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

সে তো অনেকদিনের কথা আর পরন্তপ রায় মারা গিয়েছে বলে শুনেছি।

হাঁ, দুশমনটা মারা গিয়েছে বটে তবে তার চিহ্ন রেখে গিয়েছে।

চিহ্ন আর কি হবে, নিশ্চয় চন্দনীর প্রতি ইঙ্গিত করছে, সে খুব সন্তুষ্ট হল না।

এই দেখুন হুজুর আমার পিঠের দশা—এই বলে পিরাণ চাদর খুলে দেখাল। এ সেই কারিগর লোকটা।

কি সর্বনাশ, এ যে ভালুকের আঁচড়!

ভালুকের নয়, হুজুর, দুশমনের—শঙ্কর মাছের চাবুকের দাগ।

কি সর্বনাশ!

এখন আর কি দেখছেন হুজুর, দশ বছরের পুরনো দাগ।

কিন্তু শুনেছি রানীমা তো খুব ভালো লোক।

রানীমা তো দেবী।

তা যদি হয় তবে আবার আমার কাছে কেন?

আমরা আপনাকে জমিদার মানি। দুই পরগণার ছোট বড় প্রধান সকলে মিলে আমরা খোদার কসম নিয়েছি, এ হাতে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে খাজনা দেবো না।

তা এতকাল পরে কেন?

এই তো সেদিন মাত্র আপনার খবর পেলাম।

কে দিল খবর ?

খবর কি কেউ দেয়, খবর সংগ্রহ করতে হয়। আমাদের কেদার মণ্ডল জোড়াদীঘি গিয়ে খোঁজখবর করে জেনে নিয়েছে যে আপনি এখানে অবস্থিতি করছেন।

তার সঙ্গী অছিমুদ্দি কপাল চাপড়ে বলে উঠল, হিঁদুর শাস্তরে আছে এ সেই রামের বনবাস।

দাঁড়াও ভেবে দেখি, বলে দীপ্তিনারায়ণ একখানা চৌকিতে বসল, তোমরাও বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

হুজুর জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখুন আমাদের ঘোড়া দুটোও দাঁড়িয়ে আছে।

তোমরা ঘোড়ায় এসেছ নাকি ? তা এসেছ বেশ করেছ।

ঘোড়াতেই আমাদের ফিরতে হবে।

তাই না হয় ফিরো, দুটো দিন থাকো, সব শুনে বুঝে নিই।

হুজুরের বাড়িতে থাকব এ তো সৌভাগ্যি কিন্তু উপায় নাই।

কেন, এত তাড়া কিসের ?

আমাদের মণ্ডলের হুকুম তুরুক সোয়ারের মতো যাবে তুরুক সোয়ারের মতো ফিরবে।

কারিগর থামতেই অছিমুদ্দি শুরু করল, কাল সন্ধ্যাবেলায় জোড়াদীঘি থেকে ফিরে এসে জানালো যে হুজুর ধুলোউড়িতে আছেন, তখনই বদন মণ্ডল বলল, কারিগর, অছিমুদ্দি ঘোড়া নিয়ে তুরুক সোয়ার হয়ে যাও, ভোররাতে ধুলোউড়িতে পৌঁছে হুজুরকে খবর দিয়ে আবার তুরুক সোয়ার হয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে। কোনো অজুহাতে কোথাও বিশ্রাম করবে না।

কেন আজ রাতে কি আছে ?

অছিমুদ্দি হেসে বলল আজ্ঞে মস্ত জিয়াফৎ।

দীপ্তি জানতো মুসলমানেরা সামাজিক নিমন্ত্রণকে জিয়াফৎ বলে। বলল, তা যদি হয় তোমাদের আর আটকাবো না। তবে ভাবছি কি জানো, রক্তদহ খাজনা অনাদায়ের জন্য যদি মামলা করে।

মামলা তো করবেই, যে নীল গোঁসাই দেওয়ান আছে।

ও দেওয়ানজির নাম নীল গোসাই বুঝি। আর ভাদুড়ীও আছেন।

হুজুর জানেন নাকি তাঁকে? তাঁকে কারও ভয় নাই।

কেন?

তিনি কালীমায়ের ভক্ত, কিন্তু খাঁড়া দেখলেই ভিরমি যান।

আর দেওয়ানজি?

তাঁকে দেওয়ান বলেন দেওয়ান, লাঠিয়াল বলেন লাঠিয়াল, বড় সর্বনেশে লোক হুজুর।

তাহলে নিশ্চয় মামলা করবেন।

নিশ্চয় করবেন, এত বড় পরগণা দুটো বিনা মামলায় কেউ ছেড়ে দেয়।

কিন্তু বাপু মামলা চালাবার মতো টাকা তো আমার নাই।

তারা জিভ কেটে বলল, টাকার দায় আমাদের।

এ তো মন্দ মজা নয়, খরচ তোমাদের লাভ হবে আমার। সে যে অনেক টাকার ব্যাপার।

টাকা তো অনেক লাগবেই, মামলা তো টাকার উপরে।

কিন্তু আমি ভাবছি কি জানো পরন্তপ রায়টা পাষণ্ড ছিল, কিন্তু রানীমা তো তোমরাই বললে দেবী, এখন জমিদারি নিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে দিলে তাঁর উপরে অন্যায় জুলুম হবে না?

তা যদি বলেন হুজুর পরন্তপ রায় এর চেয়ে বেশি—অনেক বেশি অন্যায় করেছে, অনেক বেশি জুলুম করেছে দর্পনারায়ণ রায় বাবুজির উপরে। কদারদাও জোড়াদীঘি গিয়ে শুনে এসেছে পরন্তপ রায়ের সঙ্গে মামলা আর মারামারিতে বাবুজি মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন, দেশছাড়া হলেন, অবশেষে মারা গেলেন, এ সবের দায় কি রানীমাকে স্পর্শ করে না!

ইন্দ্রাণীর পক্ষে যতটা টেনে বলা যায় দীপ্তিনারায়ণ বলতে লাগল, স্বামীর উপরে তিনি কি করবেন?

তাঁর মৃত্যুর পরেও তো কিছু করেননি। পরগণা দুটো ফিরিয়ে দিতে পারতেন, জলের দামে কেনা।

জলেরও তো দাম আছে। আর তাছাড়া কেউ কি স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেয়।

এবারে বাধ্য হয়ে দেবেন।

তা আমাকে কি করতে হবে?

আর কিছুই নয় হুজুর মামলার দিনে আপনাকে আদালতে হাজির হতে হবে। বাদী না থাকলে মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে।

আচ্ছা তোমাদের যখন তাই ইচ্ছা তাই হবে। তারপরে দীপ্তি হাঁক দিল, ওরে মোহন আছিস নাকি?

এখানেই আছি বাবুজি।

দেখ এরা এখনি ফিরে যাবে, কাজেই এদের সঙ্গে কিছু সন্দেশ এনে দেবার ব্যবস্থা করে দে।

মোহন একগাল হেসে বলল, খবর শুনে সন্দেশ আমি আনিয়ে রেখেছি। চলো ভাই বেঁধে দিচ্ছি।

তাই দাও ভাই মোহন, আমরা এখনি রওনা হব।

তোমরা তো রওনা হবে। হেঁটে যাবে নাকি?

তারা বিস্মিত হয়ে বলে, হেঁটে! ঐ যে ঘোড়া দেখতে পাচ্ছ না?

আরে দেখতে পাচ্ছি বলেই তো বলছি, ওদের এখনো নাস্তা শেষ হয়নি।

কি দিলে ভাই নাস্তায়?

ঘোড়ার নাস্তা আবার কি, ছোলা ভিজে আর গুড়।

বেঁচে থাকো ভাই, পরগণা আমাদের হাতে এলে তোমাকে দেওয়ান করে দেবো।

হাতে আসবার আগে সবাই ওরকম বলে থাকে, নাও এখন চলো।

হুজুর আমরা এখন আসি। কয়েক দিনের মধ্যেই দুই পরগণার দুই প্রধান আপনার উপযুক্ত ভেট নিয়ে আসবে। আমরা দূত মাত্র।

আচ্ছা তাদের আসতে বলো।

১১

দীপ্তিনারায়ণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল দুই ঘোড়ার আটখানা পা ক্রমেই দ্রুততর হয়ে উঠছে আর ক্ষুরের শব্দ ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে আসছে। সে দেখল হঠাৎ তারা থামল আর ফিরে রওনা হল কুঠির দিকে। দীপ্তিনারায়ণের কাছে এসে তারা ঘোড়া থেকে নামল।

কি, আবার ফিরলে যে—

হুজুর একটা কথা মনে হল তাই ফিরে এলাম।

কি কথা?

হুজুর একটু সাবধানে থাকবেন।

বিস্মিত দাপ্তি শুধালো, কেন বলো তো ?

না তাই বলছিলাম, একটু সাবধানে থাকা ভালো।

কেন বল তো ?

প্রাণের আশঙ্কা আছে।

কেন মারবে আমাকে ? কেন, এই তো দেখে গেলে আমার টাকাকড়ি ধন বস্তু কিছুই নাই।

বড়লোক বলে খ্যাতি আছে তো। বড়লোকের প্রাণের আশঙ্কা সর্বদা।

কে মারবে ? রক্তদহের লোকে ?

তারা দুই হাত দিয়ে কান স্পর্শ করে বলল, ছিঃ ছিঃ, এমন কাজের মধ্যে তারা নাই।

তবে ?

ঈশান রায় বলে একটা লোক আছে।

হাঁ তার কথা একবার বলেছিলে বটে।

লোকটা শয়তানের জাসু। তার লোভ ঐ পরগণা দু'খানার উপরে। সে যখন দেখবে পরগণার লোকে আপনাকে জমিদার মেনেছে তখন কি করে বসে স্থির নাই।

ওদের একজন বলল, গঙ্গাপাল আর বাজু সরদার নামে দুইজন লোক আছে, তারা শয়তানের চেলা, তাদের অসাধ্য কিছু নাই।

আমি যে এখানে থাকি এতদিন জানতো না তাহলে—

এবারে জানাজানি হয়ে যাবে—ঐ যে বলে শয়তানের কান বাতাস, ওরা বাতাসে খবর পায়।

আচ্ছা তোমরা যাও, আমি সাবধানে থাকব।

আমরা মোহন ভাইকে কথাটা জানিয়েছি, ভাবলাম হুজুরকেও একবার জানিয়ে যাওয়া ভালো।

বেশ করেছ।

তারা আবার সেলাম করে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল।

দীপ্তিনারায়ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ঘোড়া দুটো ক্রমে ক্ষুদ্রতর হতে হতে এক সময়ে ভোরের কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপ্নে আর বাস্তবে দুস্তর প্রভেদ—সারাদিন ধরে মনের মধ্যে এই কথাটা উল্টে-পাল্টে দেখেছে দাপ্তি। স্বপ্নের মোহময় মাধুর্য বাস্তবে অবাঞ্ছিত প্রাখর্য

লাভ করেছে, স্বপ্নের সেই অকথিত বাণী কি চিরকাল অকথিত থেকে যাবে, জানবার কি কোনোই উপায় নাই। ভেবেছে অসমাপ্ত কাহিনী তো একদিন সম্পূর্ণ হয়, স্বপ্নের কি হবে না। একে অনভিজ্ঞ যুবক, কেমন করে জানবে স্বপ্নের অনুবৃত্তি হয় না। সঙ্কল্প করল আজ ঘুমের আগে চন্দনীর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোবে, স্বপ্নে নিশ্চয় তার দর্শন মিলবে। চন্দনীর মুখ ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে দেখল ভোরের আলো জানলা দিয়ে আসছে, এক ঘুমে রাত কেটে গিয়েছে। নিজের উপরে তার ভারি ক্ষোভ হল।

সকালবেলায় বাগানের লিচু গাছতলায় বাঁধানো রোয়াকে গিয়ে বসল, দেখলে অদূরে মোহন দণ্ডায়মান।

এখানে কি করছিস রে?

না, এই দাঁড়িয়ে আছি।

ও বুঝেছি, আমাকে পাহারা দিচ্ছিস। লোক দুটো যা বলে গেল তার উপরে এত বিশ্বাস।

বিশ্বাস নয়, তবু একটু সাবধান হয়ে চলা ভালো।

আজ ভাবছি একবার ডাকাতে কালীর ভিটেয় যাব।

কথাটা তার আগে মনে হয়নি, এখনি মনে হল, বোধ করি মোহনের সতর্কতার মাত্রা পরীক্ষা করবার জন্যে।

বেশ তো, আজ শনিবার, আমি ফুল বেলপাতা নিয়ে যাব।

দীপ্তি হেসে উঠে বলল, তুই কি পুরুতঠাকুর নাকি?

দাদাবাবুর যেমন কথা, মায়ের কাছে ছেলে যাবে তাতে আবার পাণ্ডা পুরুতের কি দরকার।

আচ্ছা যাস, তবে সঙ্গে একখানা লাঠি নিস, ফুল বেলপাতা দিয়ে তো খুনেদের আটকাতে পারবি নে।

নিশান রায়ের গঙ্গাপাল এলে এই লাঠির ঘায়ে তাকে গঙ্গা পাইয়ে ছাড়ব।

বেশ বুঝতে পারা যায় নিশান রায়ের সম্যক বিবরণ সে শুনেছে সোনাগাতির দুই প্রজার কাছে। দীপ্তির মুখ দিয়ে হঠাৎ ডাকাতে কালীর ভিটেয় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ হয়ে পড়ায় ভাবল এর মধ্যে মা-কালীর ইঙ্গিত আছে। এখানেই তার প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল চন্দনীর সঙ্গে, ওখানেই মা-কালীর কাছে কৃপা যাচ্ঞা করেছিল চন্দনীর সঙ্গে যেন তার বিয়ে হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল চন্দনীও অনুরূপ বর যাচ্ঞা করেছিল যদিও মুখে প্রকাশ করেনি। জিজ্ঞাসা

করলে গম্ভীরভাবে বলেছিল, শপথ প্রকাশ করতে নেই। তাছাড়া আপনিও তো বললেন না।

আমারও ঐ উত্তর।

বেশ তবে কাটাকাটি হয়ে গেল, হেসে বলেছিল চন্দনী। চোখ বন্ধ করলেই চন্দনীর হাসি দেখতে পায়—।

ডাকাতে কালীর ভিটেয় মোহনকে নিয়ে উপস্থিত হল দুজনেই। মোহনের হাত থেকে জবাফুল ও বেলপাতা নিয়ে দীপ্তি কালীর থানে এসে জবাফুল ও বেলপাতা নিয়ে অঞ্জলি বদ্ধ করে চন্দনীর মিলনের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প দিতে উদ্যত হলে হঠাৎ তার মনে হল এ কি করছে সে, চন্দনী না রক্তদহ জমিদারের কন্যা, তাকে যাচ্ঞা করবার অধিকার কি তার আছে? সেদিন যখন চন্দনীকে নিয়ে এসে একসঙ্গে দুজনে সঙ্কল্প করেছিল অঞ্জলি দিয়েছিল তখন তো জানত না চন্দনীর পরিচয়—এখন জেনেছে, এখন কি আর চন্দনীকে প্রার্থনা করবার অধিকার তার আছে? মনে পড়ল ক'বছর আগে পিতার সঙ্গে গোপনে জোড়াদীঘি থেকে ফিরবার পথে পিতা-পুত্র একসঙ্গে এখানে অঞ্জলি দিয়েছিল, পিতাকে অনুসরণ করে উচ্চারণ করেছিল রক্তদহর প্রতি আমৃত্যু যুদ্ধ ঘোষণা, উচ্চারণ করেছিল সম্ভব হলে প্রতিশোধস্পৃহা ঘোষণা, আর সম্ভব না হলেও কিছুতেই তাদের ক্ষমা না করবার সঙ্কল্প। তার পরে ও তার আগে কতবার সে পিতার সঙ্গে ঐ সঙ্কল্প উচ্চারণ করেছে। আরও মনে পড়ল জোড়াদীঘির বাড়িতে গিয়ে, নিজেদের বাড়িতে চোরের মতো লুকিয়ে ঢুকে মায়ের পরিত্যক্ত পালঙ্কের জীর্ণ পঞ্জরখানার উপরে লুটিয়ে পড়ে মনে মনে ও সশব্দে ঘোষণা করেছে রক্তদহের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা। তারপরে পিতার চিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনে মনে ঐ সঙ্কল্পের ইঙ্গিতে নিজেকে তৈরি করে তুলেছিল। এমন সময়ে ডুবন্ত বজরা এসে উপস্থিত করল নিয়তির নিষ্ঠুর হাত, আশ্রয় দিল তাদের নিজেদের কুঠিতে, তখনো জানতো না তাদের পরিচয়। মনে মনে চন্দনীকে ভালোবেসে ফেলবার জন্যে আজ শতবার নিজেকে ধিক্কার দিল। আর আজ কিনা স্বপ্নের মোহময় পাশে আবদ্ধ হয়ে তাকে প্রার্থনা করবার আশায় কালীর থানে পুজো দিতে এসেছিল! ধিক, ধিক, ধিক। সঙ্কল্প দেওয়া তার হল না, পুজোর ফুল ফেলে দিয়ে সে উঠে পড়ল। অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল লাঠি হাতে করে মোহন—দীপ্তির চোখ পড়ল ঐ লাঠিখানার উপরে—ফুল নয়, ঐ লাঠিখানাই তার একমাত্র সহায়।

মোহন শুধালো, কি দাদাবাবু, অঞ্জলি দেওয়া হল?

সে সখেদে বলল, হাঁ।

মোহন জানত সঙ্কল্পের বিবরণ জিজ্ঞাসা করতে নাই। বলল, তবে ফিরে চলুন।

মন্ত্রচালিতবৎ দীপ্তিনারায়ণ ফিরে চলল কুঠিবাড়ির দিকে।

সারাটা দিন তার মনে হতে লাগল স্বপ্নে ও বাস্তবে কি দুস্তর প্রভেদ। আজ দিনের মধ্যে হাজারবার ঐ কথাগুলোকে সে উল্টেপাল্টে চিন্তা করেছে। চন্দনীকে প্রার্থনা করবার পরিবর্তে সঙ্কল্প করল চন্দনীর শেষ স্মৃতিটুকু সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে দেবে তার জীবন থেকে।

যখন সে নামমাত্র আহার করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল তখন অনুভব করল তার ধমনীতে রক্তধারার ছন্দ পরিবর্তন হয়েছে। সে যে জোড়াদীঘির জমিদারের সন্তান, রক্তে বাজছে সেই ছন্দ-স্পন্দন। তার মজ্জার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে পুরাতন জমিদারির দাবী। সে কতকালের দাবী, শুধু তার নয়, তার পিতার নয়—সেই আকবরী আমল থেকে যত পিতামহ পর্যায় চলেছে জোড়াদীঘির গদিতে তাদের সকলের দাবী। সেই অগণিত পূর্বপুরুষগণ তার মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে, অদৃষ্টের অদৃশ্য অশ্বারোহণে তারা চালিত করছে তার জীবনকে। এ সম্মিলিত সঙ্কল্পের দাবী লঙ্ঘন করবার না আছে তার অধিকার, না আছে তার শক্তি। অনুভব করল সে অসহায়—একান্ত অসহায়। সে যদি প্রকৃতিস্থ থাকত অতি পুরাতন কার্যধারার দুর্মোচ্য পাশ যদি একটু আলগা হত তবে সে বুঝতে পারত তার রক্তধারায় আরও একটা ছন্দ স্পন্দিত হচ্ছে, অতিশয় শীর্ণভাবে অতিশয় মন্দ তালে, তবে হয়তো বুঝতে পারত তারও একটা দাবী আছে—আর তার সূত্র আকবরী আমলের ঐতিহাসিক সীমানা অতিক্রম করে প্রাগৈতিহাসিক আমল পর্যন্ত প্রসারিত।

দীপ্তিনারায়ণের দেহের দুটি ভিন্নধর্মী বিপরীতমুখী ভাবপ্রবাহের একটি মজ্জাগত অপরটি হৃদ্‌গত, একটি বংশমর্যাদা আর একটি মানবীয় মর্যাদা, সংক্ষেপে একটি শক্তি, অপরটি প্রেম। প্রেম ও শক্তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস চিরপরিচিত আর নাকি তার পরিণামটাও সুবিদিত। প্রথম তিন চার দানে প্রেম পর্যুদস্ত হয় তবে শেষ দান পড়ে তার পক্ষে। প্রেম কোমল ও নমনীয় বলেই শেষ দানে জয়লাভ করে। কোমল লতাটির নমনীয় আলিঙ্গনে সুদৃঢ় ইমারৎ শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে। এত তত্ত্ব দীপ্তিনারায়ণের জানবার নয়, তার মনের মধ্যে তখন বংশ

মর্যাদার শক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, প্রেমের স্বগতপ্রায় মৃদু ভাষণ খুরের শব্দের দাপটের তলে চাপা পড়ে গেল কিন্তু একদিন দেখা যাবে, ভগ্ন ইমারতের স্তূপের তলে আবিষ্কৃত হবে সেই নমনীয় লতাটির একটি পুষ্প যার নাম অপরাজিতা।

সারাদিনের চিন্তাসঙ্কটের ভারে পীড়িত দীপ্তিনারায়ণ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ তার ঘুমের মধ্যে ফুটে উঠল একটি স্বপ্নের চন্দ্রমল্লিকা চন্দনীর সেই হাসিটি। হায় আকবরী আমলের বংশমর্যাদা!

দেওয়ান জেঠা, এই যে কাণ্ডখানা হয়ে গেল, ব্যাপার কি বলুন তো?

হয়ে গেল আমাদের বুঝবার ভুলে

কি রকম?

এই যে সেদিন কৈডিমি গাঁয়ের লোকে এসে কেঁদে পড়েছিল, বলেছিল যে নিশান রায়ের দল তাদের ঘুড়ি দিয়ে লুটিস দিয়েছে, তাদের গ্রাম লুট করবে বলে, আমরা তাদের রক্ষা করবার জন্যে হাতের মাথায় যে ত্রিশ-চল্লিশজন লাঠিয়াল ছিল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখন নিশান রায়ের দল পলোওয়ানদের নিয়ে কৈডিমি গাঁয়ে না গিয়ে রাজবাড়ি লুট করবার জন্যে এসেছিল।

কেন এমন করল?

তারা বুঝেছিল রাজবাড়ি গ্রাম রক্ষার জন্যে লোক পাঠাবে, তখন তারা কৈডিমিতে না গিয়ে রাজবাড়ির উপরে এসে পড়েছিল।

কেন এমন করতে গেল কিছু বুঝতে পারছেন?

আগে আমি বুঝিনি এখন বুঝতে পারছি। তারা বুঝেছিল এখন রাজবাড়ি দাঁড়িয়েছে পলোওয়ানদের বিরুদ্ধে কাজেই রাজবাড়িকে শাসন না করলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কৈডিমির দিকে না গিয়ে এখানে এসেছিল। কিন্তু তেমনি শিক্ষাও পেয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আমাদের সম্ভ্রম তো নষ্ট হয়ে গেল।

বউমা, নষ্ট হয়নি আরও বেড়েছে। প্রথম তো রাজবাড়ির প্রাচীর ডিঙোনো সহজ নয়—আরও কঠিন, দীঘি পার হওয়া।

এ কি তারা জানত না?

জানত তবে তাদের হিসাবে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

ভুলটা কোথায়?

তারা ভুলে গিয়েছিল যে শত্রুরও শত্রু থাকতে পারে, বিশেষ মিত্র যদি শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনি ঐ চৌকিখানায় বসুন।

এতক্ষণ দেওয়ানজি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর দুজনে কথা হচ্ছিল বাহিরমহলে ইন্দ্রাণীর বসবার জন্যে যে খাসকামরা ছিল সেখানে।

তবে শোনো বউমা, সোনাগাঁতি আর আড়াইকুড়ি পরগণার লোকদের বলেছিল ওদের সামিল হতে। ওরা সামিল হল বটে তবে উল্টো রকমে। তার বলে পাঠিয়েছিল আমরা তৈরি থাকব রাজবাড়ির কাছে।

তারপরে ?

তৈরি হয়েই ছিল তবে তাদের লাঠিগুলো ওদের পক্ষে না গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে গেল।

এত কথা জানলেন কি করে ?

পলোওয়ানদের যারা হাত-পা ভেঙে মাথা ফেটে পড়ে ছিল, এখনো অনেকে পড়ে আছে, তারাই সব বলেছে আর বারে বারে বাপান্ত করছে নিশান রায়ের তাদের ধারণা রাজবাড়িব সঙ্গে যোগসাজসে নিশান রায় এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে

আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?

আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম, গণ্ডগোল শুনে দেউড়ির কাছে গেলাম।

দেউড়ি ?

দেউড়ি বন্ধ ছিল, ওরা প্রাচীরের কাছে আসবামাত্র সোনাগাঁতির লোকেরা তাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল। ওরা জিজ্ঞাসা করল, ভাই এ কি করছ, এমন তো কথা ছিল না। তারা বলল, শয়তানের সঙ্গে আবার কথা কি। শয়তান কারা. শুধালো ওরা। শয়তান কারা ? সোনাগাঁতি বলল, শয়তান পলোওয়ানার দল, শয়তান নিশান রায় আর তার দেওয়ান ও সেনাপতি। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি. এই হল মোল্লার মেহেরবানি।

ভাদুড়ী কোথায় ?

কোথাও কোনো তক্তপোশের তলায় হবে হয় তো। এতক্ষণ বেরিয়েছে।

ভাদুড়ীকে তো সাহসী বলে জানতাম। সে যে পরম শাক্ত।

শাক্ত হলেই যে শক্ত হবে এমন কি কথা ? সে খাঁড়ার নাম শুনলে মূর্ছা যায়।

সব তো বুঝলাম, ওরা না হয় হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকল কিন্তু রাজবাড়ির সম্ভ্রম যে নষ্ট হল।

তুমি ভুল বুঝছ বউমা, নষ্ট হয়নি বরঞ্চ সম্ভ্রম আরও বেড়েছে। দেশের লোক পলোওয়ানদের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে পড়েছিল, তারা খুব খুশি হয়েছে. বলছে, নিশান রায়ের দল আচ্ছা শাসিত হয়েছে, আর তারা অত্যাচার করতে সাহস করবে না।

এমন সময় ভাদুড়ী এসে উপস্থিত হল।

দেওয়ানজি শুধালো, এতক্ষণ ছিলে কোন্ তক্তপোশের তলায়?

দেওয়ানজি, বাইরে গোলমাল শুনতে পেয়ে কালীমায়ের কাছে প্রার্থনা কর ছিলাম তক্তপোশের তলায় নিরিবিলিতে বসে।

তা প্রার্থনার ফল কি হল?

বেটারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। জপতপের কাছে কি লাঠি দাঁড়াতে পারে?

ইন্দ্রাণী শুধালো, আর সেই শ্রীহর্ষের সন্তান দয়ারাম চক্রবর্তী কোথায়?

সে গিয়েছিল গাঁয়ের মধ্যে, তার কাছেই তো সংবাদ পেলাম যে গাঁয়ের লোক বেজায় খুশি হয়েছে। সে তো কালীমায়ের ভক্ত নয়, সে জানে জপতপের চেয়ে এরকম ক্ষেত্রে তত্ত্তালাসের দরকার বেশি। এই যে দয়ারাম আসছে। কি দয়ারাম, কি খবর?

খবর তো জবর রানীমা। নিশান রায়ের বাড়িঘর সব লুটপাট হয়ে গিয়েছে।

এ কাজটি আবার করল কে?

ভাদুড়ী মশাই, তক্তপোশের তলায় না থেকে গাঁয়ের মধ্যে বের হলেই সমস্ত জানতে পারতেন। বিবরে ঢুকলে কি বিবরণ জানতে পারা যায়?

শব্দের অনুপ্রাস সৃষ্টি দয়ারামের একটি মুদ্রাদোষ। পরবর্তীকালে জন্মালে সাহিত্যিক হতে পারত।

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠল, দেওয়ান জেঠা, আপনারা এখন যান —এই বলে সে উঠে ভিতরে চলে গিয়ে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অনেক কথা মনে পড়ছিল তার। রাজবাড়ির উপরে আক্রমণ হয়েছে, অবশ্য আক্রমণকারীরা বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়েছে বটে, তবে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা আক্রমণ হয়েছে। গায়ে আঘাত লেগেছে, প্রাণে না মরলেও আঘাতের অপমানটাই না মরার বাড়া। এমন আগে আর হয়নি। না, হয়েছিল বটে, সে অনেককাল আগেকার কথা, তখন সে কিশোরী। সেবার আক্রমণকারী ছিল

জোড়াদীঘির বাবুরা। সেটা সমানে সমানে, তাকে যুদ্ধ বললেই চলে। আর এ কোথাকার একটা বাজে লোক, নামগোত্রহীন, তাতে আবার তারই একজন জোতদার। এ অপমান তো মরলেও যাবে না। কতদিনের চাপা পড়া ভুলে যাওয়া কথা একে একে মনে পড়ে যায়। সেবারে জোড়াদীঘির বাবু রাজবাড়িতে ঢুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার স্বামীকে। সেএক সুদীর্ঘ ইতিহাস, দুঃখের রামায়ণ। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ পরাজিত হয়েছিল। সে পরাজয়টাও অগৌরবের নয়। কিন্তু এ লোকটা কে! বন্দী পরন্তপ রায়কে কি করে উদ্ধার করে এনেছিল, জানবার কথা নয়। সেই পাষণ্ড উৎপীড়ক পরদারনিরত লোকটা ছিল রক্তদহের সম্মানের প্রতীক, সেই সম্মানের উদ্ধার করেছিল সে। তার জন্যেই রক্তদহের আজ এই দুর্দশা। রক্তদহের সর্বনাশের কারণ সে। কিন্তু সংসারে এই সর্বনাশা লোকগুলোই হয় সর্বশক্তিমান। আজ তার সেই শক্তি কোথায়? শক্তি নেই বলেই ঈশান রায়ের এই দুঃসাহস। দুঃখের বিদ্যুতের মতো একবার মনে হল, আজ যদি থাকত সেই লোকটা। না, না, না। রক্তদহর সম্মান রক্ষা কি এই দেওয়ানজি দেউড়ির দোবে চোবে তেওয়ারির কর্ম! তখনি দুঃখের আর এক ঝলকে মনে হল, থাকত যদি আজ দর্পনারায়ণ চৌধুরী, তবে তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে চলে যেত তীর্থবাসে। মুক্তির এই ক্ষীণ আশ্বাস ঝলক মারতেই মনে পড়ে গেল একবার কানাঘুষায় যেন শুনেছিল তার এক পুত্র আছে, সেটা কান কথা না সত্য, মনের ইচ্ছা যে অনেক সময়ে সত্যের মুখোশ পরে দেখা দিয়ে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তখন শুরু হয়ে যায় ভ্রান্তিবিলাসের পালা। ভাবে তার সঙ্গে চন্দনীর বিয়ে দিয়ে বাপের সম্পত্তি ছেলের হাতে ফিরিয়ে দিত। প্রকাণ্ড পূর্ণচ্ছেদ পড়ত জোড়াদীঘি রক্তদহ কুরুক্ষেত্রের পরে। কুরুক্ষেত্রের পরেই তো শান্তি পর্ব। কিন্তু শান্তি পর্বেই তো মহাভারতের সমাপ্তি নয়। যাদের সম্পত্তি লাভের আশায় ভারত নিঃক্ষত্রিয় হল তাদের জন্যে কিনা শেষে স্বর্গবাসের ব্যবস্থা। মহাকবির এ কি মহাভ্রম? না, তারও ভাগ্যে তীর্থবাস নাই। হঠাৎ সে দেখল বালিশ ভিজে গিয়েছে। এ কি, সে কাঁদছিল নাকি? তখনি জাগ্রত হয়ে উঠল তার পৌরুষ, উঠে বসল সে। দ্রৌপদীর অংশে জন্ম ইন্দ্রাণীর।

একজন দাসীকে বলল, যা তো সদর থেকে দয়ারামকে ডেকে নিয়ে আয় তো।

ইন্দ্রাণীর ডাক পেয়ে দয়ারাম বিস্মিত হল, দেওয়ানজি ভিন্ন আর কোনো কর্মচারীর ভিতরে আসবার হুকুম ছিল না।

সে এসে প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

শোনো দয়ারাম, একটা গোপনীয় কাজের জন্য ডেকেছি, সদরে হলে জানা-জানি হয়ে যাবে সেটা আমি চাই না।

রানীমা আদেশ করুন।

দেখো তোমার তো পলোওয়ানদের সঙ্গে পরিচয় আছে?

হাঁ রানীমা, আমি তো তাদের জন্যে ছড়া বাঁধতাম, গঙ্গাপাল, বাজু সরদার সবাই ওদের প্রধান, সকলকেই জানি।

আর ঐ ঈশান রায়?

তাকে না জেনে উপায় আছে, সবাই তাকে রাজা মানতাম।

বেশ তবে তোমাকে দিয়েই হবে।

শ্রীহর্ষের সন্তানের অসাধ্য কাজ নেই, তবে অবশ্য কাজটা সৎ হওয়া চাই।

অসৎ কাজ করতে তোমাকে কেন বলব দয়ারাম!

তা জানি বলেই তো রানীমার আশ্রয়ে পড়ে আছি।

বেশ যা বলছি মন দিয়ে শোনো, দু'কান করো না।

১২

দয়ারাম বিদায় নিলে ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বের হবে ভাবছে এমন সময় একজন দাসী এসে জানালো দেওয়ানবাবু এসেছেন।

তাঁকে নিয়ে এসো।

দেওয়ানজি প্রবেশ করে শুধালো, বউমা, শরীর ভালো তো?

শরীর এক রকম ভালোই—তবে সংসারের খবর, সে আর কি বলব, আপনার কিছুই অজানা নাই।

কথাটা সাধারণ অর্থে বলল ইন্দ্রাণী, দেওয়ান তার উপরে একটু মোচড় দিয়ে অসাধারণ করে তুলল। বলল, সেইজন্যেই তো অসময়ে এলাম, পাঁচজনের সম্মুখে তো বলা যায় না।

ইন্দ্রাণী ভাবেনি এতটা উদ্বেগের কারণ আছে। উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, ভালো করে বসুন, সমস্ত খুলে বলুন কি হয়েছে।

কথাটা আরও দু'একবার তোমার কাছে তুলেছি কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি।

কি বলেছিলেন আমার তো মনে পড়ছে না।

দেওয়ানজি বলল, এই আমাদের চন্দনী সম্বন্ধে কথাটা। তারপরে একটু থেমে বলল, এত বড় সম্পত্তি আর আপনার তো বয়স হয়েছে, আপনার পরে এর মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

ইন্দ্রাণী বলল, কেন, আমরা তো সবাই জানি চন্দনী এর মালিক হবে।

আমরা জানি বটে কিন্তু যদি অন্য দাবীদার ওঠে তখন কি হবে। তবে আরও খুলে বলি। লাঠালাঠিকে ভয় করি না, ভয় করি ইংরেজের আদালতকে। সেখানে নিত্য রামের সম্পত্তি শ্যামের হচ্ছে, চন্দনীর স্বত্ব প্রমাণ করা হবে কি উপায়ে?

এমন ভাবে বিষয়টা কখনো ভাবেনি ইন্দ্রাণী। তাই কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, কেন, আপনারা সবাই সাক্ষ্য দেবেন ইন্দ্রাণী আমার মেয়ে, মায়ের অভাবে মেয়ে সম্পত্তি পাবে, এর মধ্যে বাধাটা কোথায়?

দেখো বউমা, সংসার বড় বিচিত্র স্থান, সকলের জানা কথাও সংকটের মুখে পড়লে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তারপরে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, ও যে আমার মাসীর মেয়ে. ওর জন্মের দশ দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হলে আমি আর চাঁপা গিয়ে ওকে নিয়ে আসি—এ কথা আজ কে-ই বা মনে রেখেছে।

কেন চাঁপা!

শুনেছি তার অনেক কাল আগে মৃত্যু হয়েছে।

আমিও সেই রকম শুনেছি। আরও শুনেছি সেই চাঁপার এক মেয়ে হয়েছিল।

ইন্দ্রাণী বলল, দাসীর মেয়ে তো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। তার উপরে সে মেয়ে এখন কোথায় আছে, আদৌ আছে কিনা কে জানে!

এ সবই সত্য বউমা, কিন্তু সম্পত্তির উপরে যাদের লোভ তারা যদি চাঁপার মেয়েকে দাবিদার রূপে খাড়া করে?

খাড়া করলেই হল, তবে আপনারা আছেন কেন, উকীল মোক্তার আছে কেন।

ইন্দ্রাণীর কথা শুনে দেওয়ানজি ঈষৎ হাসল।

হাসলেন কেন?

ততদিন যে আমি থাকব তার স্থিরতা কি।

উকীল মোক্তার তো সবাই মারা যাবে না।

তা বটে, মামলায় হয়তো আমাদের জিত হবে কিন্তু একটা কলঙ্ক রটবে তো।

বড় বংশে এমন কলঙ্ক থাকেই।

তা অবশ্য থাকে, জোড়াদীঘির বংশে আছে। আমি সে বাইরের লোকের জানাজানির কথা ভাবছি না, ভাবছি চন্দনী মায়ের মনের অবস্থাটা তখন কি রকম হবে।

এবার আসল কথায় এসেছেন দেওয়ান জেঠা। সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিকানার দাবী নিয়ে যে গোলমাল হতে পারে সে কথা কি আমি ভাবিনি। কিন্তু যখনি সমাধান সন্ধান করতে এগিয়েছি সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দনীর মুখ। জ্ঞান হওয়া অবধি যে আমাকে মা বলে জেনেছে হঠাৎ একদিন জানবে যে আমি তার মা নই, সে আমার মেয়ে নয়, রক্তদহের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ নেই—তখন—

এই পর্যন্ত বলে চুপ করল ইন্দ্রাণী। বোধ হয় মুক্তির কোনো পথ চোখে পড়ল না তাই, কিম্বা চন্দনী রাগের মাথায় কি করে বসে তার স্থিরতা নাই তাই।

কি, চুপ করে থাকলে যে বউমা ?

বলবার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছি না, চন্দনী যে একগুঁয়ে মেয়ে কি করে বসবে কে বলতে পারে, হয়তো জলে ঝাঁপ দেবে কিম্বা হয়তো যে দিকে দুই চোখ যায় চলে যাবে।

তার পরে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, দেওয়ান জেঠা, বলুন তো এত কাণ্ড করতে যাব কিসের জন্যে! সম্পত্তি ? ও সম্পত্তি তো আমার নয়।

ও মেয়েও তো তোমার নয়।

এবার ইন্দ্রাণী হাসল, সে হাসি ম্লান, বলল এই সম্পত্তি আর মেয়ে দুই-ই হঠাৎ ভেসে আসা।

দেওয়ানজি কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, তবু দুয়ে প্রভেদ আছে, ও দুটো পরগণা গেলেও আমি অভাবে পড়ব না, কিন্তু চন্দনী যদি যায়—

আর বলতে পারল না, মনের সমস্ত কথা ছাপিয়ে দু'চোখে জল গড়াতে লাগল। চোখের জল মনের আমমোক্তার।

দেওয়ানজি আর দাঁড়াল না, আলগোছে বেরিয়ে এলো। এই প্রথম ইন্দ্রাণীর চোখে জল দেখলে সে।

ইন্দ্রাণী বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। ইন্দ্রাণী কাঁদছে। দরজাটা বন্ধ করে দেবার কথাটাও তার মনে এলো না।

মা তুমি এখানে শুয়ে আছ আর সারা বাড়ি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ও মা, সন্ধ্যাবেলা এখানে শুয়ে কি করছ ?

চন্দনীর ডাকে মা উত্তর দিল না দেখে সে বলে উঠল, তুমি ঘুমোচ্ছ, কখনও তো ভরসন্ধ্যায় তোমাকে ঘুমোতে দেখিনি। অনেক ঘুমিয়েছ এখন জাগো।

তবু মা উত্তর দেয় না।

তোমাকে কি কুম্ভকর্ণে পেয়েছে নাকি! অনেক ঘুমিয়েছ এবারে জাগো।

জাগ্রতকে জাগাবে কার সাধ্য।

তখন চন্দনা গিয়ে মাকে ঠেলা দিল, বুঝল মা জেগেই আছে। তখন মায়ের মুখখানি ফিরিয়ে ধরলো, ফিরিয়ে ধরেই স্তব্ধ বিস্ময়ে চমকে উঠল, এ কি মা, তোমার চোখে জল!

চন্দনী এত বয়স পর্যন্ত কখনও দেখেনি মায়ের চোখে জল—তাই তা স্তম্ভিত বিস্ময়। আর কিছু বলবার না পেয়ে আবার বলল, এ কি মা, তোমার চোখে জল?

এবারে চোখের জলে বন্যা দেখা দিল। এতক্ষণ চলছিল ঝির ঝির ঝরনা, এবারে প্রবল বন্যা। আঁচল দিয়ে জলপ্রবাহ মোছানো সম্ভব নয়, তাই মুখের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে চুমো খেতে শুরু করল। তাতে বন্যার বেগ আরও বাড়লো, ভিজে উঠল চন্দনীর মুখখানিও।

এতক্ষণে ইন্দ্রাণী প্রথম কথা বলল, তুই সর আমি উঠছি।

যতক্ষণ না বলছ কেন কাঁদছ আমি উঠব না, এমনি পড়ে থাকব তোমার মুখের ওপরে।

সর, পাগলামি করিস নে।

হাঁ পাগলামিই করব, আমি তো চিরকালের পাগলা।

ইন্দ্রাণী উঠে বসল, কিন্তু উঠল না চন্দনী, মায়ের কোলে মাথা রেখে সে পড়ে রইল। ততক্ষণে ইন্দ্রাণী আঁচল দিয়ে মুখ মুছে ফেলেছে। চোখের জল থেমেছে। মানুষের দুঃখের সঙ্গে পাল্লা দিতে চোখের জল পারবে কেন। ঝরনা শুকিয়ে গেলেও চিরহিমানা অটল থাকে। চোখের জল ঝরনা। চিরহিমানী দুঃখ।

কি হয়েছে বলো?

বলব না, এখন বাইরে চল। এ কি তুই কাঁদছিস কেন?

তোমার চোখের জলের সঙ্গে দোহারকি করছে আমার চোখের জল।

থাম্ তো, কতকগুলো কথা শিখেছিস তোর বৃন্দাবনী মাসীর কাছ থেকে।

না উঠব না, এমনি পড়ে থাকব।

খাবি নে ?

না খাবো না, তোমার কোলে জন্মেছি, তোমার কোলে শুয়ে না খেয়ে মরবো স্থির করেছি। চন্দনীর চোখে জল গড়াচ্ছে।

'তোমার কোলে জন্মেছি' চন্দনীর এই কথায় ইন্দ্রাণীর চোখে আবার বন্যা নামল। অজান্তে সমূহ সঙ্কটের কাছাকাছি এসে পড়েছে চন্দনী।

কে বলল তুই আমার কোলে জন্মেছিস!

এমন অদ্ভুত কথা কখনও শোনেনি চন্দনী, হেসে উঠল সে। মেঘ ভাঙা সেই হাসি বড় মধুর লাগল ইন্দ্রাণীর চোখে। চন্দনীর মুখখানি টেনে নিয়ে অজস্র চুমোয় চুমোয় ভরে দিল।

চুমো খেয়ে ভোলালে চলবে না। তোমার কান্নার কারণটা শুনতে চাই।

যদি বলি অকারণ!

বেশ বলো সেই অকারণটাই।

আচ্ছা এখন চল, পরে বলব।

তখন মাতা ও কন্যা মুখ মুছে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল।

১৩

আজ তিন-চার দিন মায়ে ও মেয়েতে লুকোচুরি চলছিল। লুকোচুরিটা ভাবের। মা ভাবছে মেয়েকে কি ভাবে কথাটা বলবে। জানেন মেয়ে কথাটা না শুনে ছাড়বে না। আর মেয়ে ভাবে মায়ের কথার নিশ্চয় কোনো গূঢ় রহস্য আছে, তা আদায় না করে নিয়ে সে ছাড়বে না। তাই নানা কাজের অছিলায় দুজনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলেছে। মুহূর্তের জন্যেও দুজনে একত্র হয়নি।

মেয়ে বলে, মা কথাটা কি বলবে না?

মা বলে, কথা এমন কিছু নয়, তবে সব কথাই কি তোর শুনতে হবে।

না, তোমার জমিদারির কথা শুনে আমার কাজ নাই। সে সব কথা বা জিজ্ঞাসা করেছি আর কবে বা বলেছ। ওসব কথা তোমার দেওয়ানজির সঙ্গে ভাদুড়ী মশাইয়ের সঙ্গে আর হয়তো আরদালি দয়ারাম না দয়াময়ের সঙ্গে। ও সবে আমার দরকার নাই।

জমিদারির কথা ছাড়া কি আর অন্য কথা থাকতে নাই!

আছে বই কি। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

যদি বলি মনের কথা।

সব কথাই তো মনের।

তা যদি বুঝিস তবে এ-ও বুঝবি মায়ের মনের সব কথা মেয়ের পুছতে নাই, জানতে নেই।

না মা, এ কেবল কথা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

আচ্ছা পরে এক সময়ে বলব।

সেই সময় আর আসে না।

এই ভাবে মায়ে মেয়েতে মাঝে মাঝে কথাবার্তা হয়। একেই বলে ভাবের লুকোচুরি।

এমন সময়ে একদিন দাসী এসে খবর দিল, মা, বাইরে দয়ারাম ঠাকুর এসে প্রণাম জানিয়েছে। একটা ভাবান্তরের উপায় পেয়ে ইন্দ্রাণী বেঁচে গেল, বলল, যাও তাকে আমার বাইরের খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে বসাও গে, আমি যাচ্ছি।

দয়ারাম ঘরে প্রবেশ করে উপবিষ্ট ইন্দ্রাণীকে একটি প্রশস্ত প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে দেওয়ানজি এসেছেন, তাকে দয়ারামের উপস্থিতির কথা আগেই জানিয়েছিল ইন্দ্রাণী।

তার পর বল কি খবর।

খবর তো জবর রানীমা। ঈশান রায় আর কখনো এমুখো হবে না।

এমন সুবুদ্ধি তার হঠাৎ কেন হল?

হবে না! পেট ভরে রানীদীঘির জল খেয়ে গিয়েছে।

দেওয়ানজি বলল, দয়ারাম দয়া করে হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট ভাষায় বলো—কেন, কি হয়েছে।

দেওয়ানজি, স্পষ্ট ভাষায় বললেও ব্যাপারটা হেঁয়ালি বলে মনে হবে। আচ্ছা তাই না হয় বলি। লোকটার হাড়ে হাড়ে শয়তানি। ঘুড়ি দিয়ে কৈড়িমির লোকদের নুটিস দিয়েছিল যে তাদের গাঁ লুটতে যাবে। জানত এ কথা কৈডিমির লোকে নিশ্চয় জানাবে রাজবাড়িতে, আর তা হলেই রাজবাড়ির লেঠেল বরকন্দাজ সব যাবে কৈডিমিতে আর এই ফাঁকতালে পলোওয়ানদের নিয়ে এসে লুট করবে রাজবাড়ি। দেখলেন লোকটার শয়তানি দেওয়ানজি।

দেখলাম আর এই শুনলাম, কিন্তু এখনো শুনিনি হঠাৎ রানীদীঘির জল খেতে গেল কেন।

সেটা যথাসময়ে যথাসাধ্য বলব। আগে শুনুন, এদিকে রানীমায়ের সোনা-

গাঁতি আর আড়াইকুড়ি পরগণার প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে যাতে তারা এসে রাজবাড়ি লুটতে সাহায্য করে।

দেওয়ানজি শুধালেন, তাদের লাভটা কি ?

লুটের ভাগ পাবে।

ইন্দ্রাণী বলল, তারা আমাদের অনুগত, তারা রাজবাড়ি লুটতে ওকে সাহায্য করবে কেন ?

সবটা আগে দয়া করে শুনুন, তারা করল শয়তানের সঙ্গে শয়তানি। দেশের লোক পলোওয়ানাদের আর নিশীথ রায়ের অত্যাচারে অস্থির। দুই পরগণার প্রধানরা শলাপরামর্শ করে স্থির করল তারা আসবে ঠিকই, কিন্তু নিশান রায়কে সাহায্য না করে ঠেঙিয়ে তাদের হাড়গোড় ভেঙে দেবে। দিলও তাই। নইলে সেদিন রাজবাড়ি রক্ষা পাওয়া কঠিন ছিল, কারণ আমাদের লোকজন সব গিয়েছিল কৈডিঘি গাঁয়ে।

তা এত কথা তুমি জানলে কি করে ? শুধাল ইন্দ্রাণী।

ঐ গঙ্গাপাল আর বাজু সরদারের কাছে।

দেওয়ানজি বলল, তারা তোমাকে বলবে কেন, একজন নিশান রায়ের দেওয়ান আর একজন সেনাপতি।

এখন আর তারা নিশান রায়ের কেউ নয়, দুজনেই বরতরফ হয়েছে।

কি অপরাধে ?

দেওয়ানজি বলল, সোনাগাঁতি আর আড়াইকুড়ির লোকে রাজবাড়ি লুট করতে সাহায্য না করে পলোওয়ানাদের ঠেঙিয়ে মাথা ভেঙে দিয়েছে বলে বোধ হয়।

দয়ারাম বলল, সাধারণ লোকে তাই ভাববে কিন্তু সেটা অপরাধ গণ্য করে না নিশান রায়, জানে শয়তানি করতে গেলে মাঝে মাঝে শয়তানের হাতে মার খেতে হয়।

তবে আর কি অপরাধ করল গঙ্গাপাল আর বাজু সরদার ?

তা বুঝতে হলে আগে ছড়াটা শুনুন, এরই মধ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে রটে গিয়েছে।

দয়ারাম আরম্ভ করল—

ঘুচল রাজার শয়তানি
ভরালো পেট দীঘির পানি
হাতীর চোখে পড়লে ছানি

বুঝতে নারে ডাঙা পানি
ঈশান রায়ের নিশান কাত
হ'ল তাহার রাজগী মাত।

তারপরে ব্যাখ্যাচ্ছলে বলল, এর মধ্যেই সমস্ত কথা আছে।

ইন্দ্রাণী শুধাল, সত্যি করে বলো তো দয়ারাম ছড়াটা তোমার বাঁধা কিনা?

দয়ারাম জিভ কেটে বলল, শ্রীহর্ষের সন্তান বলবে মিথ্যা কথা। প্রথম চারটা ছত্তর কারা রচেছে জানি না, আমি জুড়ে দিলাম শেষের দুটো ছত্তর। ছড়াটা হঠাৎ এসে থেমে গিয়েছিল, শেষের দুটো রচে আমি মোড় মেরে দিলাম। ছড়া এসে ইস্টিশানে থামল। দেওয়ানজি, একুন না দিলে যেমন হিসাব শেষ হয় না, ছড়াতেও তেমনি—ঈশান রায়ের নিশান কাৎ, হল তাহার রাজগী মাত—

এবার ছড়াটা একুনে এসে থামল।

দেওয়ানজি বলল, তা এত গোপন কথা গঙ্গাপাল আর রাজু সরদার তোমাকে বলতে গেল কেন?

বলবে না! একদিনে যাদের দেওয়ানগিরি আর সেনাপতিগিরি যায় তাদের আর থাকল কি? এখন তারা গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়াটা ছড়িয়ে দিয়ে ঈশান রায়ের কেচ্ছা শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। এবারে তারা যোগ দিয়েছে সোনাগাঁতি আর আড়াইকুড়ির দলে।

এর মধ্যে আবার দলাদলি এল কোত্থেকে?

সে অনেক কথা দেওয়ানজি আর জরুরীও বটে, কিন্তু তার আগে ছড়াটার ব্যাখ্যা শুনবেন না?

ইন্দ্রাণী আগ্রহের সঙ্গে বলল, নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার তাড়া নেই।

দয়ারাম ছড়ার সটীক ব্যাখ্যা শুরু করল।

ঘুচল রাজার শয়তানি, মনে হচ্ছে ঈশান রায়ের রাজগী শেষ। আর ভরাল পেট দীঘির পানি, হাতীর চোখে পড়লে ছানি বুঝতে নারে ডাঙা পানি, মনে হচ্ছে রানীমা, ঈশান রায়ের হাতী যেটাকে সে পাটহাতী বলে তার দুই চোখে ছানি আর দুটো কানই কালা, বেটা বুঝতে পারে না কোথায় ডাঙা আর কোথায় পানি। সে পড়ল গিয়ে রানীদীঘির জলে, পিঠে ছিল খোদ ঈশান রায়। সঙ্গে সঙ্গে পড়ল জলের মধ্যে, হাবুডুবু খেয়ে জলে তার পেট ভরে গেল, প্রাণে বেঁচে গেল এই যথেষ্ট। শেষের দুটো ছত্র আমার জুড়ে দেওয়া, ও দুটো না থাকলে ছড়াটা ন্যাড়া হত, দিলাম জুড়ে আমি। রামায়ণ মহাভারত লেখা

সহজ, ছড়া লিখতে গেলে এইখানে, বলে নিজের মাথাটা দেখিয়ে দিল, কিছু থাকা চাই।

দয়ারাম থামলে দেওয়ানজি বলল, তারপরে কি হল বল।

ঈশান রায় কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে উঠে গরম হয়ে উঠল গঙ্গাপাল আর বাজু সরদারের উপরে। একজনকে ডেকে নিয়ে বলল, এক্ষুনি ওদের শির লে আও। সে লোকটা বলল, হুজুর ওরা যদি শির দিতে না চায়।

তবে ডাক সেই হারামজাদাদের।

তারা হাজির হলে বলল, তোমাদের বরখাস্ত করলাম চাকরি থেকে।

কি আমরা হারামজাদা, আর তুমি নবাবজাদা, রইল তোমার বিনে পয়সার চাকরি। চললাম আমরা দুই পরগণার প্রধানদের কাছে। এই বলে সোজা তারা গেল বদন মণ্ডল আর কলিমুদ্দি সরদারের কাছে। তারা তো ঐ দুইজনকে পেয়ে মহা খুশি, বুঝল এবারে গেল ঈশান রায়ের ডান হাত আর বাঁ হাত। তাদের সঙ্গে আমার আগে থেকেই চেনা পরিচয় ছিল। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, ভাই তুমি তো রক্তদহর রাজবাড়িতে কাজ নিয়েছ। ফিরে গিয়ে দেওয়ানজিকে সাবধান করে দিও।

কেন?

কেন আর কি। ঐ শালা ঈশান রায়ের অনেক দিন থেকে চোখ আছে পরগণা দুটোর উপরে। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করত কি উপায়ে ঐ পরগণা দুটো থেকে রানীমাকে বে-দখল করা যায়।

বদন মণ্ডল বলল, বেটা বলে কি, রানীর তো বয়স হল, ওয়ারিস নেই আর দত্তকও নেননি। এখন তোমরা দুই প্রধান যদি আমার সহায় হও তবে পরগণা দুটো লাঠির জোরে দখল করে নিই, তোমরা কি বল?

আমাদের অভ্যাসমতো লম্বা সেলাম করে বললাম, এ আর বলতে, তবে কিনা হুজুর অনেক লেঠেল দরকার হবে।

কেন, আমার পলোওয়ানার দল আছে।

আছে আর কোথায়? তাদের অনেকে লাঠির ঘায়ে হাত পা ভেঙে পালিয়েছে, অনেকে মাথা ফেটে মরেছে, বাকিরা পলো ফেলে দিয়ে পালিয়েছে, বলে গিয়েছে তারা আর পলোওয়ানাগিরি করবে না।

বল কি, এতদূর গড়িয়েছে! কিন্তু তোমরা থাকতে এত লোক খুন জখম হল কি করে?

শোন ঠাকুর, ওরা জানে না আমি শ্রীহর্ষের সন্তান, তাই ভক্তি করে ঠাকুর সম্বোধন করে। শোন, আমরা যে রাজবাড়ি লুট করতে চাইনি গিয়েছিলাম রক্ষা করতে তা ঐ বেটা দুশমনকে ফাঁস করিনি, ওর এখনও বিশ্বাস আমরা ওদের অনুগত, তাই মনের ভাব আমাদের কাছে প্রকাশ করে বলল। তাই বলছি এখুনি গিয়ে দেওয়ানজিকে সব কথা বল, আর বল রানীমা যেন অচিরে দত্তক গ্রহণ করেন।

আমি বললাম, এ কি মগের মুল্লুক নাকি, অন্যের সম্পত্তি বেটা দখল করে নেবে। নাই বা না-নেওয়া হল দত্তক।

ঠাকুর. মগের মুল্লুকে বিচার ছিল না সত্য কিন্তু এই কোম্পানীর আদালতে বিচারের নামে যা হয় তা অত্যাচার। শোন ঠাকুর, ও লোকটাকে আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি, ওর মাথাটা আস্ত শয়তানের কারখানা। রানীমা গত হলেই একটা হাতের লোককে ওয়ারিশ দাঁড় করিয়ে মামলা জুড়ে দেবে। আর কিছু না হোক টাকা খরচ আর হয়রানির চূড়ান্ত। শেষে হয়ত একখানা পরগণা দিয়ে আপোস করতে হবে। লোকটার জোতজমি সমস্তই দুর্বল বেওয়ারিসের সম্পত্তি।

সমস্ত কথা শুনে আমি তো অনেকক্ষণ অব্দি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলাম। শেষে বললাম, কিন্তু পরগণার প্রজারা কি বলে, তারা কি ঈশান রায়কে জমিদার বলে স্বীকার করবে!

আমার কথা শুনে ওরা দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, জমিদার বলে স্বীকার করবে! তখনি তারা লাঠি নিয়ে ছুটে যায় আর কি। বলে, কালকে রাতে তার বাড়িঘর পুড়িয়ে এসেছি, আজ ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হব।

জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তোমরা কি করবে বল?

তারা সকলে দাঁড়িয়ে উঠে একসঙ্গে বলল, খোদার কসম, এই হাতে আমরা জোড়াদীঘির বাবুকে ছাড়া আর কাউকে খাজনা দেব না।

এই কথা শুনে প্রধান দুইজনকে পুছলাম, তবে তারা এতদিন রক্তদহের জমিদারকে খাজনা দিল কেন?

প্রজা সাধারণের মনের কথা দুই প্রধান বলল, তারা বলে কি ঠাকুর জানো, আমরা কিস্তি মোতাবেক রক্তদহের কাছারীতে খাজনা দিয়ে দাখিলা নিয়েছি বটে কিন্তু আর না, এখনি রুখে না দাঁড়ালে আমাদের আসল জমিদারের সম্পত্তি যাবে ঐ বেটা শয়তানের পেটে। তারপরে আবার বললে, খোদার কশম নিয়ে

জানাল এই হাতে জোড়াদীঘির বাবু ছাড়া আর কাউকে খাজনা দেব না। তিনিই আমাদের সাতপুরুষের জমিদার।

সমস্ত কথা শুনে বললাম, দেখ ভাই শুনেছি জোড়াদীঘির দর্পনারায়ণ বাবুজি গত হয়েছেন। তাঁর ওয়ারিশ আছে কি না, কোথায় আছে কি না কেউ জানে না, খাজনা দেবে কাকে।

দয়ারামের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ইন্দ্রাণী খুশি হল, বলল, দয়ারাম, তুমি শ্রীহর্ষের যোগ্য সন্তান বটে। যে কথা এসে শোনালে তাতে আমার সম্পত্তি ও ইজ্জত রক্ষা হল। তারপরে দেওয়ানজির দিকে তাকিয়ে বলল, দেওয়ান জ্যাঠা দয়ারামকে একশ টাকা ইনাম দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

এই কথা শুনে দয়ারাম করজোড়ে বলল, রানীমা মাপ করবেন, শ্রীহর্ষের সন্তান টাকাব ইনাম গ্রহণ করে না, তবে রানীমা যদি সন্তোষ হয়ে থাকেন তবে একখানা শাল বকশিশ করুন।

ইন্দ্রাণী তার কথা শুনে বলল, বেশ তাই হবে। এখন তুমি এসো, বিশ্রাম করগে, যথাসময়ে শাল পাবে।

দয়ারাম বিদায় হয়ে গেলে দেওয়ানজি বলল, বউমা, দয়ারাম যা বলল তার অনেক কথাই আমার কানে এসেছে। অবশ্য এতটা আনুপূর্বিক জানতাম না। আমার তশীলদারগণ অনেক সময়ে অনেক কথা এসে বলে যায়, এ সব কথারও কিছু কিছু বলেছে তবে তেমন বিশ্বাস হয়নি।

তারপরে কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল, এইবার বুঝতে পারবে কেন আমি চন্দনীকে যথাশাস্ত্র দত্তক নিতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করছিলাম।

ইন্দ্রাণী বলল, এর পরে আর বিলম্ব করা চলে না। আজই আমি চন্দনীকে সব বুঝিয়ে বলব।

আরও কিছু কথা কানে এসেছে। ঈশান রায় জানে মেয়েকে দত্তক নিলেও যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে সেই হবে গিয়ে কাযত জমিদার। সে যদি তেমন তুখড় লোক হয় তবে তার হাত থেকে পরগণা কেড়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। না লাঠির জোরে না আইনের জোরে। তাই আমার আরজি চন্দনীকে দত্তক নেবার এবং তার বিবাহ দেবার ব্যবস্থা একসঙ্গে কর।

ইন্দ্রাণী বলল, আপনার যুক্তি সমীচীন কিন্তু তেমন যোগ্য বর আমি হঠাৎ কোথায় পাই, সম্পত্তির লোভে তো যার-তার হাতে চন্দনী মাকে সমর্পণ করতে পারি না।

একটা কথা বলি বউমা, তোমার মুখে সেই ধুলোউড়ির কুঠির বাবুটির যে বিবরণ শুনেছি, তার দয়ামায়া আতিথেয়তার যে বৃত্তান্ত তুমি বলেছ তাতে আমার ধারণা হয়েছে সে অযোগ্য হবে না চন্দনীর।

সে কথা আমিও যে না ভেবেছি তা নয়, আর বৃন্দাবনী মাসী তো অনুক্ষণ সেই কথা আমাকে শোনাচ্ছে।

আমি যদি তাকে বলি ঐ কুঠিটা ছাড়া তার আর কিছুই নাই যে। মাসী কি বলে জান কৃষ্ণ গোকুলের গোয়ালার ঘরে মানুষ হয়েছিলেন তাই বলে কি সত্যিই তিনি নন্দের পুত্র! ঐ কুঠিবাড়ি গোকুলের নন্দর গৃহ, ভালো করে খোঁজ নাও, ও ছেলে বড় বংশের সন্তান, ওর হাতেই নিধন পাবে কংসরূপী ঈশান রায়।

মাসী তো মন্দ বলে না বউমা।

কিন্তু সে কি আমাদের উপরে খুশি, বিদায়ের সময়ে আমাকে একটা প্রণাম পর্যন্ত করল না।

ওসব ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি। বৃন্দাবনী বলবে লীলা।

সত্যি তাই বলে বৃন্দাবনী। আমি একদিন তাকে বললাম, এমন করে চলে গেল কেন বাবুটি। শুনে হেসে বলল, ওসব তাঁর লীলা মা লীলা। আর ভাষায় যতটা বলে ছড়ায় বলে তার চেয়ে অনেক বেশি। গুনগুন করে গান ধরে,

> "মুখে যখন না, যা বল হরি হে
> মনটি তখন দয়ায় আছ ভরি হে।"

মাসী সত্যি অদ্ভুত।

অদ্ভুত নয় দেওয়ান জ্যাঠা, ও অন্তর্যামী।

অন্তর্যামী শব্দটা শুনে দেওয়ানজি হাসলেন।

না, না, হাসির ব্যাপার নয় দেওয়ান জ্যাঠা। বৃন্দাবনী মাসী বুঝেছিল চন্দনীর মন কুঠির বাবুর প্রতি বিরূপ নয়। মাসীকে শুধিয়েছি তা যদি হবে তবে তোমার মুখে তার নাম শুনবামাত্র তোমাকে চড়চাপড় মারে কেন? মাসী বলেছে, কর্তা মা ঐ থেকেই তো বুঝতে পেরেছি। বললাম, তোমাকে তবে এত জ্বালাতন করে কেন? মাসী বলে, কর্তামা, গোকুলের কালো ছেলেটা মা যশোদাকে কি কম জ্বালাতন করত। সত্যি কথা বলতে কি ওটা যে পীরিতের লক্ষণ। আমারও ক্রমে সেই ধারণা হল। দেখতাম মুখে কখনো কুঠিয়ালবাবুর নাম করবে না, যেখানে তার সম্বন্ধে কথা হত চন্দনী উঠে চলে যেত, কিন্তু বুঝতাম মনটা পড়ে থাকত ঐ আলোচনার দিকে। দেখতাম রাতের বেলায়

লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। কাঁদিস কেন শুধোলে বলত কোথায় কাঁদছি মা, সর্দি লেগেছে। মাসী সেকথা শুনে বলত ওটা তো ধুয়ার ছলনা করে কাঁদি।

সমস্ত শুনে দেওয়ান বলল, বউমা তবে তো সমস্তই অনুকূল। লক্ষ্মীজনার্দন মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন তুমি নিরিবিলি ওর কাছে কথাটা পাড়।

কথা তো দুটো, এক দত্তক গ্রহণ, দুই তার সঙ্গে বিয়ে।

আরও একটা কথা আছে—বলে দেওয়ানজি।

কি সেটা?

দত্তক গৃহীত হওয়ার পরে তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমাদের সম্পত্তি আমাদেরই থাকবে, নইলে ফিরে পাবে জোড়াদীঘির বাবু, যেরকম তোড়জোড় করছে পরগণার প্রজারা, মামলা মোকদ্দমা করেও ঠেকানো যাবে না।

হ্যাঁ, এই কথা শুনলে চন্দনী রাজি হতে পারে; জোড়াদীঘির নাম শুনলে ক্ষেপে ওঠে চন্দনী।

জোড়াদীঘির কথা উঠল কি করে?

আমি একদিন বলেছিলাম, ঐ পরগণা দুটো কিনবার পর থেকেই আমাদের সংসারের শান্তি গিয়েছে। ভাবছি ওটা তো জলের দামে কেনা, যাদের সম্পত্তি তাদেব ফিরিয়ে দেব।

শুনে চন্দনী বলেছিল, জলেরও তো দাম আছে, নইলে জলকর আদায় কর কি করে? শুনে বলেছিলাম, দরাদরির কথা ছাড়, এমনিতেই দিয়ে দেব। কি ভিক্ষা নাকি, বলে রেগে উঠেছিল। ভিক্ষা নেবে জোড়াদীঘির বাবু! শুনে সে কি বলেছিল জানেন দেওয়ান জ্যাঠা।

কি বলেছিল বউমা?

বলেছিল জলের দরেই হোক আর ভিক্ষার কড়িরূপেই হোক, আমার সম্পত্তি আমি দেব না। বলেছিলাম সম্পত্তি এখনো তোর হয়নি। বলেছিল একদিন তো হবে, তখন?

তখন আর কি, লাঠির জোরে হোক, আর মামলার জোরে হোক, আমাদের সম্পত্তি আমি ফিরিয়ে নেব।

দেওয়ানজি বলল, খুব তেজী মেয়ে চন্দনী, ও পারবে সম্পত্তি রক্ষা করতে। তবু আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।

আচ্ছা দেখি, বলে উঠল ইন্দ্রাণী। একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি একখানা শাল পাঠিয়ে দিচ্ছি—শ্রীহর্ষের সন্তানের হাতে দেবেন।

চন্দনী ওঠ্‌ ওঠ্‌, পাগলামি করিস নে, সন্ধ্যা হয়ে গেল বাড়ির অনেক কাজ বাকি।

আমার বাড়ি নাই, ঘর নাই, কাজ নাই, মা নাই, বাপ নাই।

তবে এসব কি? আমি কে, এ বাড়ি কার?

তুমি আমার মা নও, এ বাড়ি ঘর তার কাজকর্ম কিছুই আমার নয়। না, এসব কিছু আমার নয়, কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে এখন মা সেজেছ, বলছ এ বাড়িঘর আমার।

বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ পড়ে আছে। যখন ইন্দ্রাণীর মুখে শুনল যে তাকে যথাশাস্ত্র দত্তক নিতে হবে নইলে এ সমস্তর উপরে অধিকার জন্মাবে কেন?

কেন দত্তক নেবার দিন কি আর পেলে না?

শোন মেয়ের কথা একবার। যাকে তাকে কি দত্তক নেওয়া যায়? সবাই জানে তুই আমার মেয়ে, এখন জানবে—

মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, এখন জানবে ও বাড়ির চন্দনী এ বাড়ির লোক নয়, একটা উটকো ছুঁড়ি।

ছি ছি, এসব কথা কি ভাবতে আছে, কেউ এসব ভাবে না, এ গাঁয়ের সবাই তোকে ভালোবাসে।

এমন ভালোবাসায় আমার দরকার নাই।

আমাকে কি মা ভাবিস না?

তাই তো ভাবতাম এখন দেখছি তুমি রাক্ষসী। আমার মাকে খেয়ে ফেলে এখন মনে মনে অনুশোচনা হচ্ছে মেয়েটাকে কেন মেরে ফেললাম না, তা হলে সব জ্বালা জুড়োত।

দেখ্‌ এবারে আমি রাগ করব। আমি খেয়ে ফেলেছি আমার মাসীকে? অনেক বয়সে মাসীর মেয়ে হয়েছে শুনে দেখতে গেলাম, দশ দিন না যেতেই তিনি গেলেন, যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন, ইন্দু, মেয়েটা তোকে দিলাম, তুই নিয়ে যা, মেয়ের মতো করে মানুষ করিস।

আহা মাসী বোনঝিয়ে মিলে বেশ ফন্দি এঁটেছিলে, এতদিন যে আমাকে খেয়ে ফেলনি এই আমার ভাগ্য।

তোর ভাগ্য না রে আমার ভাগ্য, আমার ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, তোকে পেয়ে সব দুঃখ ভুললাম, আর আজকে এখন কটু কথা বলছিস। মাকে কখনো কটু কথা বলে না।

বলে কি বলে না কেমন করে জানব। মা কেমন তা তো জানিনি।

এতদিন পরে তোর মুখে যে এসব কথা শুনতে হবে ভাবিনি—আমি চললাম।

চন্দনী মুখ তুলল না, আন্দাজে শাড়ির আঁচল ধরে টানল।

দত্তক কি কেউ নেয় না? তবে শোন্ মনে দুঃখ পাবি বলে জানাইনি, তোর বাপ আমার মেসো, সেও তো অন্য বংশ থেকে দত্তক হয়ে এসেছিল।

আহা তবে আর কি। দত্তকের মেয়ে দত্তক হবে এই তো স্বাভাবিক। এতকাল চুপচাপ ছিলে, এখন যখন নিজের দরকার হয়েছে তখন বলছ ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, দত্তক নেবার কথা মনে পড়েছে।

রাগের মাথায় বললি বটে তবে কথাটা মিথ্যে নয়, দত্তক নেওয়া শেষ হয়ে গেলে তোর বিয়ে দেব।

বাহা, বাহা, বিয়ে দেবে, তার মানে পাত্রও ঠিক হয়ে গিয়েছে।

মনে মনে এক রকম ঠিক করে রেখেছি।

কে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি শুনতে পাই কি?

শুধু শুনতে কেন দেখতেও পাবি। তাকে তুইও দেখেছিস।

এবারে বিস্মিত হয়ে বলল, দেখেছি?

হাঁ, দেখেছিস।

কে সে?

ধুলোউড়ির কুঠির বাবু।

সেই অভদ্র লোকটা! বিদায়ের সময়ে তোমাকে যে একটা প্রণাম পর্যন্ত করল না—

আর তোর সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলল না—কি বলিস?

এ কি মেয়ের সঙ্গে মায়ের মতো কথা!

এই তো এইমাত্র বললি আমি তোর মা নই—তুই আমার মেয়ে ন'স!

এবারে অনেকক্ষণ পরে চন্দনী বিছানার উপরে খাড়া হয়ে উঠে বসল, বলল, মা, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি বিয়ে তখন করতেই হবে, কিন্তু ঐ অভদ্র বুনো লোকটাকে কখনোই না।

কেন রে?

কেন আবার কি ? লোকটার কথা ভাবলেই আমার গা জ্বলে যায়।

পাশের ঘরে বসে বৃন্দাবনী মাসী সব কথাই শুনছিল, এবারে সে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল :

পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে।

এ ঘর থেকে চন্দনী বলে উঠল, মাসী তিতো কাকে বলে আজ তোমাকে দেখাব। তোমার ভাতে উচ্ছেসিদ্ধ দেব, ডালে উচ্ছে দেব, উচ্ছের তরকারি খাওয়াব।

তাই দিস দিদি তাই দিস। পিত্তির জ্বালায় গা পুড়ে গেল। পিত্তির জ্বালা বড় জ্বালা।

আমারও পিত্তির জ্বালা।

পিত্তির জ্বালা নয় দিদি পিত্তির জ্বালা নয়, তোমার জ্বালা পীরিতের।

এতক্ষণ ইন্দ্রাণী মুখে আঁচল দিয়ে হাসছিল, এবারে বলল, আমি চললাম, চলুক তোমার উতোর চাপান। ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী প্রস্থান করলে চন্দনী বলল, তুমি তেকেলে বুড়ী পীরিতের কি জানো।

তেকেলে নই রে তেকেলে নই, আমরা সবাই ব্রজের গোপিনী, বয়স ধরো, নইলে কালার বয়সের সঙ্গে মিলবে কি করে ?

তোমার কালাকে একবার পেলে হয়।

ঐ তো সে আসছে।

আসুক একবার দেখে নেব।

এত দেখেও সাধ মেটেনি, দিন পনেরো যে তার কুঞ্জে কাটিয়ে এলে। কত কি লীলাখেলা হয়েছে কে জানে।

কি বুড়ী, ছোট মুখে এত বড় কথা ! এই বলে সে দ্রুত বের হয়ে পাশের ঘরে গেল।

সে রাতে চন্দনী খেল না, অনেক টানাটানি অনেক সাধাসাধিতেও বিছানা থেকে উঠল না। তবে ঘুম এল না তার। এই অনিদ্রার সুযোগে সে নিজের মনটাকে বুঝে নিতে চায়। এ কি বিপাকে পড়েছে সে। কুঠিবাড়ির বাবুর পথটা অবধি জানে না। সবাই বলত কুঠিবাড়ির বাবু—চন্দনীও তাই বলত। মাঝে

মাঝে তাকে রাগাবার জন্যে বলত কুঠিয়ালবাবু। একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার নামটা কি? উত্তর পেয়েছিল আস্ত মানুষটাকেই তো দেখতে পাচ্ছ আবার নামে কি হবে। চন্দনী বলেছিল আস্ত মানুষটাকে তো সব সময় দেখতে পাব না। তখন না হয় মানুষটাকে ধ্যান করো। চন্দনী বলেছিল আপনি ভারি অসভ্য, এত দেবদেবী থাকতে আপনাকে ধ্যান করতে যাব কেন? এমনি কথা-কাটাকাটি করত দুজনে। অবশ্য লোকসম্মুখে নয়—গোপনে। গোপনীয়তাতেই তো প্রেমের মাধুর্য। রক্তদহে দিয়ে আসবার পরে প্রায়ই চিন্তা করত তাকে। কত বার তার মনে পড়েছে সেই ডাকাতে কালীর বাড়িতে গিয়ে দু'জনে পূজা দিয়েছিল। মনে মনে সঙ্কল্প করে অঞ্জলি দিয়েছিল যেন তার সঙ্গে বিয়ে হয়। তখনো ভালোবাসার চাঁদ সন্দেহের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। কুয়াশা সরে গিয়ে পৌর্ণমাসির চাঁদ চোখে পড়ল বজরা থেকে সেই বিদায়ের সময়ে; হঠাৎ ধরে ফেলল তার হাত। দীপ্তিনারায়ণ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাল। চন্দনী বলল, দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ। কেন বলল জানে না। তারপর থেকে তার দিবা-রাত্রির ধ্যানজ্ঞান ছিল দীপ্তিনারায়ণের মুখখানি। দুজনের মধ্যে কত আবোল-তাবোল কথা হয়েছে, সে-সব প্রেমের দেয়ালা দেখা। আজ আর শিশুপ্রেমের দেয়ালে নয়—পূর্ণ বিকশিত প্রেমের দেয়ালি।

চন্দনী বুঝেছিল বৃন্দাবনী মাসী তাদের রহস্যের আভাস পেয়েছে। সে ছাড়া আর কেউ দীপ্তিনারায়ণের কথা বলত না এ বাড়িতে। তাই মাসীকে রাগিয়ে দিয়ে শেষে চড়চাপড়টা মেরে টেনে বের করত সেইসব দিনের কথা। মাঝে মাঝে বৃন্দাবনীর মুখে শোনা গানটা মনে পড়ত, এখনো মনে পড়ছিল—

> "কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
> ঘষিতে সৌরভময়
> ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
> দহন দ্বিগুণ হয়।"

যার স্মরণে এত সুখ তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? যত সুখ তত দুঃখ প্রেমের এই বিচিত্র দ্বিত্ব বুঝতে পারল না চন্দনী। সে স্থির করল আর বেশি আপত্তি করা উচিত নয়, যদি মায়ের মত ঘুরে যায়! আকাশের চাঁদ জোয়ারের জলে ভেসে ঘাটে এসে লেগেছে, ভাটার টানে দূরে সরে যেতে কতক্ষণ! তবে এত আপত্তি, এত কান্নাকাটি, পরে হঠাৎ রাজি হওয়া তাই বা কেমন দেখায়।

চন্দনী স্থির করল এ সঙ্কটে তার একমাত্র সহায় বৃন্দাবনী মাসী। বৃন্দাবনী

তখন বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। চন্দনী গিয়ে বলল, এসো মাসি তোমার মাথার উকুন বেছে দি।

তা দে দিদি তা দে। কিন্তু কাল যে এত তিতো খাওয়ালি গায়ের ঝাল তো গেল না।

উচ্ছেতে তোমার গায়ের জ্বালা যাবে না, আজ নিম আর নিসেন্দের ব্যবস্থা করব।

চন্দনী উকুন বাছে। উকুন বাছবার মস্ত সুবিধা এই যে কারো মুখ দেখতে পায় না, অনায়াসে মনের কথা বলা যায়। চক্ষুলজ্জা তখন বাধা জন্মায় না। মাসী মনে মনে বুঝল উকুন বাছা ছল মাত্র, কোনো একটা কথা তাকে দিয়ে কর্তামার কাছে পেশ করতে চায়। চন্দনীর মুখের আড় ভাঙবার জন্যে বৃন্দাবনীই পূর্বপক্ষ করল, বলল, কুঠিবাড়ির বাবুটি মন্দ নয়, যেমন রূপে তেমনি গুণে, তুমি বিয়েতে রাজি না হলে ও পড়ে থাকবে না, এতদিনে বুঝি বিয়ে হয়েই গেল।

চন্দনীর মুখের ভাব যদি দেখতে পেত দুঃখ হত মাসীর মনে।

করুক না বিয়ে, এত বড় জমিদারি কোথায় পাবে।

তাহলে কর্তামাকে বলি চন্দনী ওখানে বিয়ে করবে না, বলে সে উঠতে যাচ্ছিল। আঁচল টেনে বসাল চন্দনী। বলল, দু'দণ্ড পরেই না হয় বল, এখনো উকুন সব বাছা হয়নি।

মাসীর মুখের ঈষৎ হাসি চন্দনীর চোখে পড়ল না।

পরের দিনে ইন্দ্রাণী মেয়েকে একান্তে নিয়ে বলল, তাহলে ধুলোউড়িতে আর চিঠি লিখব না তো, কি বলিস?

মা তুমি চিঠি লিখলে আমি আপত্তি করতে যাব কেন?

বিয়ে যখন করবি নে তখন আর চিঠি লিখে কি লাভ?

বিয়ে করব না এমন তো বলিনি। তবে—

তবে কি, ওখানে বিয়ে করবি নে, এই তো?

তাই বা কখন বললাম।

অবাক করলি দেখছি। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিয়ে দিতে চাই নে।

ইতিমধ্যে বৃন্দাবনীর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর কথা হয়ে গিয়েছে, সে খুলে বলেছে চন্দ্রনীর মনের ভাব। তাই জোর পেল ইন্দ্রাণী।

আমাকে কথা শেষ করতেই দিলে না। বিয়েতে আপত্তি নেই তবে আবার দত্তক গ্রহণ কেন?

শোন মেয়ের কথা। যথাশাস্ত্র দত্তক না নিলে সম্পত্তির উপরে তোর অধিকার জন্মাবে কি ভাবে?

মা তবে তুমি সম্পত্তি রক্ষার জন্যে বিয়ে দিতে চাইছ?

তাই যদি হয় তবে মন্দ কি। তাছাড়া যে বিয়ে করবে সে দেখে নেবে সম্পত্তিতে তোর অধিকার আছে কিনা।

কেন মা ভিখারিণীর কি বিয়ে হয় না?

তুমি তো বাছা ভিখারিণী নও।

তার বেশি কি, এই বাড়ি ঘর বিষয় সম্পত্তি বংশ কিছুই আমার নয়।

সমস্তই তোমার। আমি মরবার আগে সমস্ত পাকা করে যেতে চাই।

আর কিছু দিন যাক না।

তবে বাছা তোমাকে সব খুলে বলি। ঈশান রায়ের অনেক দিন থেকে লোভ ঐ পরগণা দুটোর উপর। সে তোড়জোড় করছে। এদিকে পরগণা দুটোর প্রজাদের ইচ্ছা তারা ঈশান রায়ের কব্জাগত হতে চায় না, তার চেয়ে তারা পুরনো মনিবকে স্বীকার করবে।

কেন, ওটা তো আমরা কিনে নিয়েছি।

বাছা সম্পত্তির বনিয়াদ প্রজাদের বিশ্বাসের উপরে। তারা ঈশান রায়কে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে জোড়াদীঘির বাবু হচ্ছে তাদের আসল জমিদার। তারা খোদার নামে পণ নিয়েছে যে তাদের হাত দিয়ে জোড়াদীঘির বাবু ছাড়া আর কাউকে খাজনা দেবে না।

ওখানকার প্রজারা পাকা লোক, তারা জোড়াদীঘিতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে ছ'আনির বাবু মৃত্যুকালে এক পুত্রসন্তান রেখে গিয়েছে। এখন তার সন্ধানে লোক বেরিয়েছে। তাকে নিয়ে এসে বসাবে পরগণায়। কি করবে ঈশান রায়?

আর তাহলে তুমিই বা কি করবে?

যা করব তাই তো বলছি এতক্ষণ, দত্তক নেবার পরে তোর বিয়ে দেব ধুলোউড়ি কুঠির বাবুর সঙ্গে।

সে কি করতে পারে?

কি না করতে পারে। সে বীর পুরুষ আর প্রজারা তার সহায়। লাঠিসোটা

বা মামলা-মোকদ্দমা যে পথ দিয়েই ঈশান রায় যাক পেরে উঠবে না।

আর ওখানে যদি আমি বিয়ে না করি?

তাহলে জোড়াদীঘির বর্তমান উত্তরাধিকারী এসে বসবে পরগণা দুটো অধিকার করে।

বিষয়টা এত জটিল আর তা নিয়ে তার মা এত চিন্তা করেছে আগে বুঝতে পারেনি চন্দনী। কিন্তু যেমনি শুনল যে সম্পত্তি ফিরে যাবে জোড়াদীঘির বাবুর হাতে অমনি জোড়াদীঘির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ তার ধমনীর মধ্যে সাপের মতো ফণা তুলে উঠল, কাকে বলছে কি বলছে সম্পূর্ণ চিন্তা না করে সে বলে উঠল, মা, তুমি ধুলোউড়ির কুঠির কর্তার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করে আজই, এখনি চিঠি লেখ।

কি বলছিস ভালো করে চিন্তা করে দেখেছিস তো?

এর মধ্যে আর চিন্তার কি আছে। জোড়াদীঘির হাতে সম্পত্তি তুলে দেওয়ার চেয়ে ঐ অভদ্র লোকটাকে বিয়ে করা অনেক ভালো।

তাকে অভদ্র বলছিস কেন?

অভদ্র নয় তো কি। বিদায়ের সময়ে তোমাকে প্রণাম করল না, আমাকে দুটো কথা বলল না—অভদ্র নয় তো কি?

দেখ্, এখনও ভেবে দেখ্, শেষে পিঁড়িতে বসে না উঠে পালাস।

তবে তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক আমি ওখানে ছাড়া আর কোথাও বিয়ে করব না—এই বলে রক্তিম মুখে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে চলে গেল।

তখন পাশের ঘরে বৃন্দাবনী মাসী আপন মনে গান করছিল :

গোকুল নগরী মাঝে যতেক রমণী আছে
তাহে কোনো না পড়িল বাধা।
নিরমল ফুলখানি রেখেছি যতনে আনি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।

১৫

দীপ্তিনারায়ণ অনেকক্ষণ হল দুখানা বড় লেফাফার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, লেফাফা দুখানা সীলমোহর করে আটকানো। সকালবেলাতেই পিঠ-পিঠ চিঠি

ছুখানা লোক মারফত এসে পৌঁছেছে। বার কয়েক উল্টেপাল্টে দেখে আভাসে বুঝতে পেরেছে ছুই বিপরীত দিক থেকে টানছে চিঠি ছুখানা তাকে, মাঝখানে সে নিশ্চল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এখনো খুলে পড়েনি, সে সাহস তার হয়নি। আরো হয়ত অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকত এমন সময়ে মোহন এসে জানাল, দাদাবাবু, পাল্কিবেহারা এসে পৌঁছেছে।

আচ্ছা, তাদের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করে দে।

কিছু বলতে হবে তাদের ?

যা বলবার আমি বলব। এখন বিশ্রাম করতে বল্ গিয়ে।

আর বাদল সরদার আর বরকন্দাজদের কি বলব ?

তাদের খাইয়েছিস ? তবে আর কি, এখন ফিরে যেতে বল।

তারা যদি আপনার হাতের লিখন চায়—হয়ত তেমনি হুকুম আছে তাদের উপরে।

বল্ গিয়ে চিঠি আমি দেব না, সময় হলে নিজেই যাব।

মোহন হুকুম নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নাঃ, আর দেরি করা যায় না—ভেবে একখানা লেফাফা তুলে নিল।

লেফাফাখানার একদিকে জমিদারি সেরেস্তার ছাঁদে টানা হাতের লেখা—

শ্রী শ্রীযুক্ত দীপ্তিনারায়ণ চৌধুরীবাবুজী
প্রবল প্রতাপ জমিদার বরাবরেষু
সাং ধুলিয়াড়ি কুঠি
জিলা পাবনা।

অপরদিকে সীলমোহরের উপরে অর্ধচন্দ্রাকারে লিখিত এস্টেট জোড়াদীঘি পরগণে সোনাগাঁতি তথা আড়াইকুড়ি।

তারপরে তুলে নিল দ্বিতীয় পত্রখানা, তার উপরেও জমিদারি সেরেস্তার ছাঁদে লিখিত ধুলিয়াড়ি কুঠির বাবুজি বরাবর পত্রমিদং সাং ধুলিয়াড়ি কুঠি। জিলা পাবনা।

অপরদিকে মস্ত সীল মোহরের মধ্যে উর্ধ্বোত্থিত শুণ্ড একটি হস্তীর চিত্র।

সীলের চারদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে লিখিত রক্তদহ রাজবাড়ি—রক্তদহ। ঐদিকেই লিখিত মালিক ভিন্ন খুলিতে নিষেধ। এবং তার পরেই লিখিত ৭৪॥০।

ছুই বিপরীত দিকের ছুই পত্র একদিনে একসঙ্গে এসে উপস্থিত হওয়ায় সে হতভম্ব হয়ে পত্রযুগলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। নিষ্ঠুর নিয়তির যুগপৎ

নিক্ষিপ্ত যুগল বাণ। কিন্তু এমন ভাবে বসে থাকলে তো চলবে না। এখনি মোহন এসে উপস্থিত হবে কোনো পরামর্শের জন্য, তার এমন বিহ্বল অবস্থা দেখে না-জানি সে কি ভাববে। খুলে ফেলল সে পরগণার পত্রখানা, বেরিয়ে পড়ল দীর্ঘ পত্র আগাগোড়া জমিদারি সেরেস্তার ছাঁদে লিখিত।

"পরগণা দুটির একমাত্র মালিক জমিদার বাবুজি বরাবর লিখিতমিদং পত্র। পরগণাদ্বয়ের ছোট বড় প্রধান প্রামাণিক ও প্রজাসাধারণের হুজুরের চরণে বহুৎ বহুৎ সেলাম। আশা করি আল্লার দোয়ায় হুজুরের কুশল। অপরঞ্চ নিবেদন, পরগণাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দোয়াতপাড়া গ্রামে বর্তমান মাসের ১৩ই তারিখে বর্তমান সালের পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হইবেক। সেই কারণে অনুগত প্রজাবৃন্দের নিবেদন এই যে হুজুর সশরীরে পুণ্যাহের আসরে উপস্থিত হইলে অধীনস্থ প্রজাগণ আপ্যায়িত হইবেক। পুনশ্চ নিবেদন হুজুরের শুভাগমনের নিমিত্ত পাল্কি ও বেহারা প্রেরিত হইল। তৎসহ পথে বিপদের বিশেষ আশঙ্কার কারণ বিধায় এইসঙ্গে চারজন বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ লাঠিয়াল প্রেরিত হইল। আল্লার দোয়ায় হুজুরের নির্বিঘ্নে আগমন প্রার্থনা করি। বহুৎ বহুৎ সেলামান্তে সোনার্গাতি পরগণার পক্ষে বদন মণ্ডল তথা আড়াইকুড়ি পরগণার পক্ষে কলিমুদ্দি সরদার।"

দীপ্তিনারায়ণের মনে পড়ল কিছুদিন আগে অছিমুদ্দি ও কারিগর নামে দুজন লোক এসে আভাসে যে খবর জানিয়েছিল আজ এসেছে তার বিশদ বিবরণ। কিন্তু তখনই বাঁধভাঙা চোখের জল চুয়ে পড়ল যেমন চুয়ে পড়ে গ্রীষ্মের শেষে বন্যার জল কুঠিবাড়ির কাছে। দীপ্তিনারায়ণের মনে হল এ খবর একসঙ্গে সুখের ও দুঃখের। পিতার সাধ পূর্ণ হতে চলেছে তাই সুখ, পিতা দেখে যেতে পারল না তাই দুঃখ। মনে পড়তে লাগল পিতার কাছে শোনা কত কথা। জমিদারির অন্যান্য অংশ যা নীলাম হয়ে গিয়েছিল তার জন্যে তাঁর বড় দুঃখ ছিল না, দুঃখের কারণ ছিল এই দুটি পরগণার জন্য। এ দুটো কিনে নিয়েছিল রক্তসূত্রে শত্রু রক্তদহের জমিদার যে হেরে গিয়েও এমন মোক্ষম মার মারল যাতে হাড়পাঁজরা চিরদিনের জন্য গেল ভেঙে।

কত রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখতে পেয়েছে বাবা জানলা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছেন।

কি দেখছ বাবা?

উঠে পড়েছিস তুই, এখনো ভোর হতে অনেক দেরি, শুয়ে পড়্।

না তোমার পাশে বসি, কি দেখছ তুমি বলতে হবে।

আরে পাগল, যা দেখছি তা যে মনের মধ্যে।

আমাকে দেখাও না কেন।

আরে পাগল, একজনের মনের মধ্যে কি অপরে দেখতে পারে!

দেখতে না হয় নাই পারলাম, কি দেখলে তা খুলে বল না কেন!

তবে শোন, আমার জমিদারির মধ্যে দুটো পরগণা ছিল সবার সেরা, সোনাগাতি আর আড়াইকুড়ি।

আমি হেসে উঠে বললাম, আড়াইকুড়ি কি একটা নাম হল?

হাঁ, নামটা একটু অদ্ভুত বটে।

এমন অদ্ভুত নাম কেন হল?

কেন জানি নে তবে শুনেছি কোনো এককালে কেউ আড়াইকুড়ি টাকা দিয়ে পরগণাটা কিনে নিয়েছিল।

আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম আড়াইকুড়ি তো পঞ্চাশ টাকা। পঞ্চাশ টাকায় অতবড় সম্পত্তি কেনা-বেচা হত?

তখন এমনি হত। আসলে লাঠির জোরে সম্পত্তি হাতবদল করত, আড়াইকুড়ি টাকাটা উপরি।

সে কতকাল আগে?

কতকাল আগে কে বলবে, নবাবী আমলে সন তারিখ আজকের কালের মতো সুচিহ্নিত ছিল না। এতেই তুই অবাক হচ্ছিস, বগুড়া জেলায় একটা পরগণা আছে বলে শুনেছি যার নাম খোলামকুচি।

আমার বিস্ময় আরও বাড়ল, বললাম, সে পরগণা কি খোলামকুচি দিয়ে কেনা-বেচা হয়েছিল?

হাঁ ঠিক ধরেছিস। একটা কিছু দাম না ধরলে দলিল পাস হয় না, তাই কতকগুলো খোলামকুচি দিয়েছিল বোধ হচ্ছে।

সে তো বেশ মজার সময় ছিল।

কারণ সময়ই মজার, অন্য সবায়ের চোখে। আমাদের এই যে আইন আদালত মামলা মোকদ্দমা সেযুগের চোখে মজার বলে মনে হত।

আচ্ছা হত তো হত, এখন শুয়ে পড় বাবা।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে দীপ্তির, সেটাও রাতের কথা। সে লক্ষ্য করেছে দিনে আর রাতে বাবার দুই ভিন্ন মূর্তি। দিনের আলোয় এমন সমানে সমানে বাপের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, রাতের বেলায় বেশ সহজ ও সমান।

জিজ্ঞাসা করে, জানলা দিয়ে উঁকি মেরে কি দেখবার চেষ্টা করছ বাবা?

জেগেছিস দেখছি। আচ্ছা এখানে আয়। ঐ যে ওখানে খুব উঁচু একটা গাছ দেখতে পাচ্ছিস, আজ পূর্ণিমার রাতে ওটা বেশ চোখে পড়ে—ওই বরাবর তাকালে সোনাগাঁতি পরগণাটা।

কই বাবা, আমি গাছটা দেখতে পাচ্ছি বটে আর তো কিছু চোখে পড়ে না।

চোখে আমারও পড়ে না তবে মনের মধ্যে আর বাইরে মিলিয়ে একরকম করে দেখি।

দীপ্তি মনে মনে ভয় পায়, বাবা কি শেষে পাগল হয়ে যাবে নাকি! বলে, বাবা জমিদারি কি কারও যায় না। ঐ যে ডাকু রায়, শুনেছি তার মস্ত তেজারতি ব্যবসা ছিল, এখন সব গিয়েছে, তবু তো বেশ হালকা মেজাজে আছে।

ওটা ছিল তার ব্যবসা। জমিদারি তো ব্যবসা নয়—

তবে কি?

ওটাকে বলতে পারিস একটা সম্বন্ধ।

কার সঙ্গে সম্বন্ধ?

মাটির সঙ্গে মানুষের সঙ্গে। এ দুটোর চেয়ে বড় আর কি আছে বে বুঝতে পারলি?

দীপ্তি সংক্ষেপে বলে, না।

তবে শোন্। মাটিতে ধান হয়, পাট হয়, মুগকলাই ছোলা আরও কত কি ফসল হয়। মাটির সঙ্গে ঐ ফসলের সম্বন্ধ মায়ের সঙ্গে শিশুর মতো। আবার ঐ ফসলের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ। তারা চাষ করে, ফসল ফলায়, সেই ফসলে তাদের দিন চলে। আবার ঐ রায়তদের সঙ্গে জমিদারের সম্বন্ধ। তারা খাজনা দেয় তবে জমিদারের দিন চলে। তবেই দেখ্, একদিকে মাটি আর ফসল, অন্যদিকে রায়ত আর জমিদার, কেমন সম্বন্ধের শিকল, কাউকে ছেড়ে কারও চলবার উপায় নেই। এই জন্যেই জমিদারি ব্যবসা নয় একটা সম্বন্ধ। ডাকু রায়ের তেজারতি গিয়েছে, এখন ডাকাতি ব্যবসা ধরেছে, আবার সেটা গেলে লোক-ঠকানোর ব্যবসা ধরবে। জমিদারিতে তা হওয়ার উপায় নাই। ঐ ফসলের সঙ্গে রায়তদের কত পুরুষের সম্বন্ধ আবার রায়তদের সঙ্গে জমিদারদের কত পুরুষের সম্বন্ধ। ব্যবসা গেলে ক্ষতি হয়, জমিদারি গেলে হয় ব্যথা-বেদনা।

কই বাবা, আমি তো ব্যথা-বেদনা পাচ্ছি না।

তুই তো মাটির কোলে জন্মাসনি, জন্মেছিলি মায়ের কোলে। সেখান থেকে

মাটির কোলে গিয়ে পড়লেই মাটির সঙ্গে ফসলের সঙ্গে রায়তের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হত। তখন আমার মতো অবস্থা হলে ব্যথা-বেদনা অনুভব করতিস।

বাপের কথা শুনে ছেলের মনে অর্থের একটা ঝাপসা কুয়াশার মতো জাগে—স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারে না।

এমন সময়ে মোহন ঘরে ঢোকে, বলে, বেহারারা জিজ্ঞাসা করছিল, কবে রওনা হবেন।

তার কথায় দীপ্তিনারায়ণের নিশীথ চিন্তার চটক ভেঙে যায়। তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করবার উদ্দেশ্যে বলে, বলে দে কাল সকালে রওনা হব।

মোহন বিদায় নিতে উদ্যত হলে শুধোয়, আর বাদল সরদার কি করছে?

তার চিঠির জবাব দেবেন না শুনে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে।

একেবারে চলে গিয়েছে? আচ্ছা তুই এখন যা। এদের ভালো করে পেট ভরে খাইয়ে দিস।

পিতার সম্পত্তিতে আবার সে কায়েম মোকাম হতে পারবে জেনে ভারি একটি স্বস্তিকর আমেজ অনুভব করে। ভাবে পিতার জেগে স্বপ্ন দেখা সার্থক হতে চলেছে। পিতার মতোই সে অনুভব করে, ও সম্পত্তি তো আমাদের। বর্তমান দখলিকার রক্তদহের জমিদার কে। কিছুদিন জবরদস্তি করে ভোগদখল করেছে এই তো যথেষ্ট, এখন আবার চিরকালের জমিদারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপিত হতে চলেছে। ভাবে, এত বড় আস্পর্ধা রক্তদহের, তারা কি একটা জমিদার, ক' পুরুষের তাদের জমিদারি! পিতার মুখে শুনেছি রানীভবানীর বিশাল জমিদারি যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তারই দু'চার টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে রক্তদহের পত্তন। আর জোড়াদীঘি! আকবরী আমলের বনিয়াদ তার, স্বয়ং বাদশার সীলমোহর করা দলিল ছিল তাদের ঘরে। কিসে আর কিসে, চাঁদে আর চন্দনে! চন্দনে চন্দনে চন্দনী, চন্দনী। আকবর বাদশার সনদ ঠেলে সরিয়ে ষড়ৈশ্বর্যে প্রবেশ করল মান্ধাতার আমলের সনদ। সমস্ত সংশয় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খুলে ফেলল চিঠিখানা, বেরিয়ে পড়ল একখানা চিঠি আগাগোড়া পাকা হাতের মেয়েলি ছাঁদে লিখিত।

দীপ্তিনারায়ণ পড়ছে, 'বাবা, তোমার নামটি পর্যন্ত জানি না, নাম থেকেই তো পরিচয় শুরু, কাজেই পরিচয়টাও অজ্ঞাত। কিন্তু তোমার বংশপরিচয় না জানলেও সংঘর্ষের মুখে তোমার হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছি, বিপদকালে যে আশ্রয় পেয়েছি তোমার কাছে তাতেই কি তোমার পরিচয় পাওয়া হয় নাই? নাই বা জানলাম

নাম ও বংশপরিচয়। এখানে আসবার পরে তোমার কথা আমরা সবাই নিত্য ভাবি, ভাবি যে একবার লোক পাঠিয়ে তোমার কুশল সংবাদ নেব। তবে নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি, বিপদের দিনের আশ্রয়ের সুযোগ নিতে চেষ্টা করছি ভেবে অসন্তুষ্ট হবে এই আশঙ্কায়। কিন্তু এখন ঘটনাচক্রে লোক মারফত তোমার কাছে লোক পাঠাতে বাধ্য হলাম।

এ অঞ্চলে ঈশান রায় বলে একটা দুর্দান্ত লোক আছে। তাকে শয়তান বললে শয়তানকে লঘু করে দেখানো হয়। সেই লোকটা একদল পালোওয়ান। জুটিয়ে গ্রামে গ্রামে লুটপাট ঘরজ্বালানো অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে। প্রজারা এসে আমার কাছে কেঁদে পড়ায় আমি তাদের দিকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। সেই আক্রোশে একদিন রাতে দলবল নিয়ে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল, ভগবানের কৃপায় আমাদের অবশ্য ক্ষতি হয়নি। এখন লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি যে আমাদের দুটি পরগণা জোরজবরদস্তি করে দখল করবার চেষ্টায় আছে। প্রজারা কি করবে জানি না, তার পক্ষ নেবে না আমার পক্ষে থাকবে এখনো জানি না। লাঠির কাছে কতক্ষণ তাদের মনোবল টিকবে বলতে পারি না।

অবশ্য আমাদের ধনবল জনবলের অভাব নাই, তবে আমাদের মাথার উপরে কোনো অভিভাবক না থাকায় ধনবল জনবল থাকা সত্ত্বেও আমরা দুর্বল। যারা আমার সহায় সবাই বেতনের চাকর। আজ্ঞাবহ বলতে কেউ নাই, তাই নিত্য আমাদের গৃহবিগ্রহ গোপালনারায়ণের কাছে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করি। এমন সময়ে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। বিদ্যুৎ-চমকের মতোই দেখতে পেলাম তোমার মধ্যেই আমাদের সব আছে, অভিভাবক বল অভিভাবক, রক্ষাকর্তা বল রক্ষাকর্তা। সত্যি কথা বলতে কি জান বাবা, মেয়েছেলে যতই ধনী মানী লোকবলে প্রতাপশালী হোক, লোকে দেখে তাদের মাথার উপরে কেউ আছে কিনা, না থাকলে ধন মান লোকবল সত্ত্বেও স্ত্রীলোক দুর্বল। দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রে দেখেছ তো বাবা, মাথার উপরে আছেন শিবঠাকুর—ঐ অভিভাবকটি আছেন বলেই দুর্গা মহিষমর্দিনী, নতুবা দেবসেনাপতি পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি অসহায়। আজ রক্তদহের রাজবাড়ির সেই অবস্থা। তুমি এসে আমাদের অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করে আমাদের সঙ্কটত্রাণ করো। একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অযাচিতভাবে আশ্রয় দিয়ে আমাদের রক্ষা করেছিলে, এবারে সঙ্কটের দিনে তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। তোমার পরিচয় জানি না, তবে সব পরিচয়ের উপরে যে পরিচয় মানুষের মন তারই বলে এই প্রার্থনা।

তুমি অবশ্যই আসবে ধারণায় ঘোড়সোয়ারের হাতে এই পত্র পাঠালাম। আর সেই সঙ্গে গেল চারজন বরকন্দাজ। ঈশান রায় লোকটা অতিশয় ধূর্ত। সে ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে যে আমরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তাই এই সতর্কতা।

ইতি নিত্য মঙ্গলপ্রার্থী
আশীর্বাদক
শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেব্যা

নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিহাসের সম্যক তাৎপর্য বুঝবার বয়স হয়নি দীপ্তি-নারায়ণের, নতুবা বুঝতে পারত কি দুর্মোচ্য ফাঁস নিক্ষিপ্ত হল তার উপরে। যে রক্তদহ জন্মসূত্রে তার শত্রু, যে শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সে পিতার কাছে প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ, যে দু'খানি পরগণা তার পিতার শেষ জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল সেই সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য রক্তদহের গৃহিণী তাকে আহ্বান করেছে। ঠিক একই সময়ে একই দিনে দু'দিক থেকে পরস্পরবিরোধী আহ্বান এসেছে তার কাছে। পরগণার প্রধানরা পাল্কিবেহারা পাঠিয়েছে, তারা বদ্ধপরিকর পরগণার মালিকানা তার হাতে তুলে দেবে বলে। আবার রক্তদহের জমিদার গৃহিণী আহ্বানলিপি দিয়ে ঘোড়সোয়ার ও পথের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে বরকন্দাজ পাঠিয়েছে। তারা তো জানে না সে জোড়াদীঘি বংশের সন্তান, এ যে কার্যত তারই বিরুদ্ধে তাকে আহ্বান। এমন সমস্যায় নাকি মানুষে পড়ে! পিতৃসত্যে বদ্ধ না হলে সে হয়তো জমিদারবাড়ি রক্ষার জন্যেই রওনা হত। জমিদার-বাড়িটা অতিশয়োক্তি, তার মধ্যে যে আছে চন্দনী। অবশ্য চন্দনীও পিতৃসত্যের মধ্যে পড়ে, চন্দনীকে বিবাহ করবার পথ সুদৃঢ়ভাবে অবরুদ্ধ, কিন্তু ভালোবাসায় তো আপত্তি নাই। পিতার সঙ্গে যখন রক্তদহের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে জেহাদে সম্মতি ছিল, তার মধ্যে ভালোবাসা তো ছিল না। বিবাহ সামাজিক সংস্কার, প্রেম সমাজের নিয়মের উর্ধ্বে। সে ভাবলো আর কোনো কারণে না হোক, চন্দনীকে রক্ষা করবার জন্যেই সে যাবে রক্তদহে, ঈশান রায়ের দল রাজবাড়ি আক্রমণ করলে চন্দনীর দুর্দশার অন্ত থাকবে না। পরগণা থেকে প্রেরিত পাল্কি-বেহারাদের যা হোক কিছু একটা অজুহাত দেখালেই হবে। চন্দনীকে রক্ষা আর সম্পত্তি রক্ষার মধ্যে কোন্‌টা গুরুতর সে বিষয়ে তার সংশয়মাত্র ছিল না। যাবেই সে রক্তদহে। হাঁক দিল, মোহন!

মোহন এসে দাঁড়াল।

হাঁ রে, রক্তদহের রাজবাড়ি থেকে বাদল সরদার আর যে সব বরকন্দাজ এসেছিল তাদের ভালো করে খাইয়েছিস তো ?

আজ্ঞে রাজবাড়ির লোককে রাজবাড়ির মতোই খাইয়েছি।

তাদের বিশ্রাম করতে বল্।

বিস্মিত মোহন বলে উঠল, বিশ্রাম ! তাদের যে আপনি বিদায় করে দিতে বললেন !

দিয়েছিস বিদায় করে ? তারা আপত্তি করল না ?

বাদল সরদার একবার বলেছিল যে, একবার হুজুরের সঙ্গে দেখা হয় না। রানীমার হুকুম, তাঁকে যে করেই হোক হাতে পায়ে ধরেও নিয়ে যেতে হবে।

নিয়ে এলি না কেন ?

আপনার তো সেরকম হুকুম ছিল না।

আচ্ছা এখন যা, ওরা কতক্ষণ গিয়েছে রে ?

তা হল কিছুক্ষণ।

আচ্ছা, পরগণার লোকদের আর বিদায় করে দিস নে। এখন যা।

দীপ্তিনারায়ণ কিছুক্ষণ চিন্তা করবার অবকাশ পায়, দেখতে চায় এই ফাঁস থেকে মুক্তির কোনো পথ আছে কিনা। চিঠিখানা সাহায্য করতে পারে আশায় আর একবার পড়ল চিঠিখানা ; এতক্ষণ চিঠিটা টেবিলের উপরে পড়ে ছিল। সেখানা বার দুই তিন পড়েও মুক্তির কোনো পথ দেখতে পেল না। অবশেষে ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরতে গিয়ে পরপৃষ্ঠায় লক্ষ্য করল কি যেন লেখা আছে। কাছে গিয়ে দেখল মেয়েলি হাতের কাঁচা লেখা—তুমি এসো না। এ আবার কি ! কার লেখা ? এ কাঁচা লেখা যে চন্দনীর তাতে সে নিঃসন্দেহ হল। কে আর সুযোগ পাবে রানীমার চিঠির মধ্যে লিখবার, এত সাহসই বা কার হবে ? নিশ্চয় কোনো সুযোগে চিঠি খামে ভরবার আগে চন্দনী লিখেছে। কিন্তু এ লেখার অর্থ কি ? সে কি চায় না আমার সঙ্গে দেখা হোক। এ কি রাগে না বিপদের আশঙ্কায় সতর্কবাণী ? এ দুয়ের মধ্যে তৌল করে দেখল সতর্কবাণী হওয়াই সম্ভব। মনে পড়ল অচ্ছিমুদ্দি বলে গিয়েছিল সাবধানে থাকতে। তারপরে রাজবাড়ি থেকে সশস্ত্র বরকন্দাজ প্রেরণ সেটাও সতর্কতার চিহ্ন। তার মধ্যে রানীমার চিঠিতে স্পষ্টত ভয়ের ইশারা আছে। তাছাড়া চন্দনীও হয়তো কানাঘুষায় কিছু শুনে থাকবে, তাই কোনো এক সুযোগে স্পষ্ট নিষেধ করেছে—তুমি এসো না। সম্পত্তির চেয়ে প্রিয়জনের প্রাণের মূল্য তার কাছে বেশি। অবশ্য রাগেরও কারণ আছে,

বিদায়ের সময়ে বজরার মধ্যে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এসেছিল সে। কিন্তু, এ দুয়ের মধ্যে তুলনা হয় কি? কিন্তু লিখল কখন? ভাবতে লাগল দীপ্তিনারায়ণ।

সে ভাবুক কিন্তু পাঠকদের আমি ভাবাতে চাই নে।

নিজের খাস কামরায় বসে ইন্দ্রাণী চিঠিখানা শেষ করে চন্দনীকে বলল, দেখ্, সব ঠিক লিখেছি কিনা।

আমি আর কি দেখব!

তবু দেখ্।

যেন কতই অনিচ্ছায় চন্দনী চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়ল, বলল, মা, এটা আবার লিখেছ কেন—তোমার কথা আমরা সবাই ভাবি, আমরা বাদ দিয়ে আমি লেখা তো উচিত ছিল, আমি তো ভাবি না।

কেন বৃন্দাবনী কি ভাবে না, তবেই আমরা হল!

চন্দনী অপ্রস্তুত হল। ইন্দ্রাণী বলল, যা, চিঠিখানা সীলমোহর করে নিয়ে আয়। এটা আর কাছারীতে পাঠাতে চাই না।

চন্দনী উঠে গিয়ে অপর পৃষ্ঠায় আলগোছে লিখে দিল, তুমি এসো না। সে কানাঘুষায় দীপ্তিনারায়ণের বিপদের কথা শুনেছিল। সম্পত্তির চেয়ে প্রিয়জনের প্রাণের মূল্য তার কাছে বেশি।

দীপ্তিনারায়ণের কণ্ঠে অদৃষ্টের ফাঁস ক্রমেই দুর্মোচ্যতর হয়ে উঠছে—রক্তদহ না জোড়াদীঘি, সম্পত্তি না চন্দনী?

দীপ্তিনারায়ণ ঘোড়াটা নিয়ে মাঠের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। পরগণা থেকে প্রেরিত অছিমুদ্দি সরদার বলল, মোহন ভাই, বাবুজি চললেন কোথায়? এখন রওনা না হলে সন্ধ্যায় আলোতে পৌঁছতে পারবেন না। রাতে বিপদের আশঙ্কা আছে।

মোহন বলল, তোমরা এতজন লোক আছ, বিপদ কাছে ঘেঁষতে পারবে কেন?

আরে সে তো আছিই, আমি আর সাগরেদ, চারজন বরকন্দাজ, আর আটজন পাল্কিবেহারা।

তবে, বলল মোহন, আট আর চারে বারো, আরও তোমরা দুজন, হল চোদ্দ, আর আমিও আছি।

তুমিও যাবে নাকি ভাই?

যাব না! কত্তাবাবু অন্তিম সময়ে খোকাবাবুকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন যে। তখন খোকাবাবু বলতাম, এখন আর তা বলি নে, তোমাদের মতোই বলি বাবুজি। শোনো চিন্তা করো না, খানিকটা ঘোড়া দাবড়িয়ে এখনি ফিরে আসবেন। নাও এখন তোমরা এসে খেয়ে নাও।

এমন সময়ে মুকুন্দ লাঠি ভর দিয়ে এসে উপস্থিত হল, শুধালো, কি কথা হচ্ছিল?

মুকুন্দ এখন বুড়ো হয়ে পড়েছে, লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না।

কথা আর কি, ওরা জিজ্ঞাসা করছিল বাবুজি ঘোড়া নিয়ে চললেন কোথায়?

এই কথা বলে মুকুন্দ লাঠি আশ্রয় করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার মাথাটা পাকা চুলে আর টাকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে, তবে মুখে বলিচিহ্ন তেমন প্রকট নয়। বলল, ও অভ্যাসটা কর্তাবাবুর কাছ থেকে পেয়েছেন, কোনো কারণে মনটা খারাপ হলে তিনি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, ঘোড়ার মুখে ফেনা না ঝরা অবধি ফিরতেন না। এখন প্রহরখানেকের মধ্যে আর ফিরছেন না।

অছিমুদ্দি বুঝতে পারে না হঠাৎ মনখারাপ হতে যাবে কেন? হারানো পরগণা দুটো ফিরে পাবেন--এই কি মনখারাপের সময়?

এই নাও, মনের খবর একমাত্র মনই জানে, মনিব জানবে কি করে?

তবে জানবে কে?

মনের মালিক।

মুকুন্দ দাদা, তোমার কথা তো বুঝতে পারলাম না। মনিব আর মনের মালিক কি আলাদা নাকি?

আলাদা নয়! মনের মালিক যদি মনিব হত, মানে মানুষটা হত তবে সংসারে এতখানি হত না—এই রহস্যিটা বুঝতে বুঝতেই বুড়ো হয়ে গেলাম।

তবে বলেই ফেলো, বুড়ো তো কম হওনি।

বুড়ো হয়ে এইটুকু বুঝেছি, সব কথা বোঝা যায় না।

এমন সময়ে মোহন ফিরে এসে বলল, নাও ভাই সব, ওঠো, তোমাদের চিঁড়ে দই সন্দেশ ঠিক করে রেখেছি। তা এতক্ষণ কি কথা হচ্ছিল?

এই আমাদের মুকুন্দ দাদা বলছিল, সব কথা বোঝা যায় না।

তবে তার জন্যে খামোকা ছট্‌ফট করে মরে কি লাভ। যা বুঝতে কষ্ট হয় না তা হচ্ছে খিদে-তেষ্টা। চলো এখন খাবে চলো। বাবুজি ফিরে এসে যদি দেখেন তোমাদের খাওয়া হয়নি তবে রাগ করবেন।

তারা খেতে চলল।

দীপ্তিনারায়ণ মাঠের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে, এখন বিল শুকিয়ে আগাগোড়া মাঠ হয়ে গিয়েছে। যেদিকে খুশি যতদূর খুশি যাওয়া যায়। কেন যে ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছিল, কেন যে ঘোড়ার গতি ক্রমে দ্রুততর করে দিচ্ছে কিছুই হিসাব করেনি সে। মনের চিন্তাকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবে এই তার ইচ্ছা। চিন্তা বলতে কি? সম্পত্তি না চন্দনী, চন্দনী না সম্পত্তি! পিতার বহু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার লীলাস্থলী এই সম্পত্তি, সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আবহাওয়া তাকে ঘিরে ধরেছে। রাতের বেলায় জাগ্রত পিতার দৃষ্টিতে সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা দেখতে পেয়েছে আর সর্বোপরি ডাকাতে কালীর থানে কতবার পিতার সঙ্গে গিয়ে রক্তজবায় অঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা করেছে, শপথ করেছে রক্তদহের প্রতিশোধস্পৃহা। জোড়াদীঘির অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে পিতার কাছে, কালীমায়ের কাছে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ। যদি প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব না হয় তবে মনের মধ্যে প্রতিহিংসাকে সযত্নে লালন করতে হবে, ক্ষমা কিছুতেই নয়, না কার্যে না চিন্তায়। অদৃষ্টের কোন্ বাত্যায় সেদিন এ বজরা এসে ভিড়লো তার ঘাটে, বিলের মধ্যে অজস্র ঘাট থাকতে তাদের ঘাটটিতে ভিড়িয়ে দিল কোন্ অন্ধ নিয়তি। সে ভাবে সত্যি কি অন্ধ, না নিয়তির ক্রূর চক্রান্ত ঘটালো এই অঘটন। সেই অদৃষ্ট-প্রেরিত বজরার মধ্যে শুক্তির মধ্যে মুক্তা বিন্দুর মতোই ছিল চন্দনী। চন্দনী মুক্তা-বিন্দুই বটে। মুক্তা-বিন্দুর মতোই কোমল তরল, চোখের জলের মতো আর চিক্কণ উজ্জ্বল কচি অধরের হাসির মতো, শুক্তি দীর্ণ সেই বিন্দুটি বাতাস লাগতেই ক্রমে তরলে কঠিন, উজ্জ্বলে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছিল চন্দনীর মধ্যে। সব চেয়ে বেশি করে মনে পড়ে বজরা থেকে বিদায়মুহূর্তে তার ব্যাকুল কণ্ঠের 'দাদা তুমি বড় ছেলেমানুষ' শব্দ কয়টি আর তার চেয়েও বেশি করে অনুভব করে তার মণিবন্ধের উপরে কোমল কবোষ্ণ একটি কচি মুষ্টির আবেষ্টন। সে যে রক্তদহের বংশের কন্যা, আর সে নিজে যে জোড়াদীঘির বংশের সন্তান এই বিষম দ্বৈরথ সমরে তাৎক্ষণিক জয় হল জোড়াদীঘির। সেই জয় যে পরাজয়ের থেকেও নিদারুণ এই চিন্তা চাবুক চালিয়েছে তার স্বপ্নে ও জাগরণে। সে একাকী রাতে জেগে উঠে বারে বারে কপালে করাঘাত করে চিন্তা করেছে, হায়, কেন এমন হয়, কেন এমন হয়! সে যে পিতৃপ্রতিশ্রুতিতে শতপাকে বদ্ধ, পাশ কাটিয়ে পালাবার এতটুকু পথ নাই, পথ নাই, পথ নাই।

ঘোড়া তীরবেগে ছুটছে কিন্তু কই তার মনটা তো পিছনে পড়ে থাকছে না, সে তো সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। ওটাকে উপড়ে ফেলবার কি কোনো উপায় নাই? বিধাতার বিধান কি কেবলই অমোঘ আর নির্মম, তাঁর করুণাময় আবির্ভাব নিতান্তই মিথ্যা! শীতের বাতাস হু হু শব্দে তার দুই কানের উপর দিয়ে নৈরাশ্যের নিঃশ্বাসের মতো প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রকাণ্ড প্রান্তর যেমন সর্বশূন্য তেমনি সর্বশূন্য তার ভবিতব্য। হঠাৎ চোখে পড়ল অদূরে এক প্রকাণ্ড মহীরুহ, কুরুপাণ্ডব উপবনের মধ্যে অতিকায় ঘটোৎকচ। এত বড় মহীরুহ কোথা থেকে এলো, এত দিন চোখে পড়েনি কেন, এ তো লুকিয়ে থাকবার বস্তু নয়, কিন্তু তখনি তার সমস্ত চৈতন্য মথিত করে মনে পড়ল এই বিশাল বনস্পতিটি সে যেন দেখেছে, কিন্তু কবে কোথায়, কখন? ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়াল সেই গাছের তলায়। কবে কোথায় কখন? হঠাৎ স্মৃতির প্রকাণ্ড এক তরঙ্গ তাকে এনে ফেলল লুপ্ত চৈতন্যের ডাঙায়। ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল, ওহো, এই বটে সেই মহীরুহ যার দিকে তাকিয়ে তার পিতা রাতের প্রহর গুনে গুনে কাটিয়েছে। এটা ছিল সোনাগাঁতি পরগণার দুর্মর দিশারী। রাশ টানলো, ঘোড়া থামলো, অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে চিন্তা করল, ভাবলো এ কি করছে, পরগণায় তাকে যেতেই হবে, ঘোড়ার মুখ ফিরলো কুঠিবাড়ির দিকে। ফিরলো বটে তবে তখনো তার মনের মধ্যে পাঞ্জা কষাকষি চলছে পিতার আজ্ঞায় আর চন্দনীর স্মৃতিতে।

যখন সে গ্রামের মধ্যে ঢুকে অতল নিতল দীঘির ধারে এসে পড়েছে, দেখল ঘাটে মেয়েরা স্নান করছে, কতক বা জলে কতক স্নান সেরে ঘাটে উঠেছে, এলোচুল থেকে জল ঝরে পড়ছে। তার মনে পড়ল অনেক দিন আগেকার একটি স্মৃতিচিত্র। বৃন্দাবনীর সঙ্গে স্নানে এসেছিল চন্দনী, স্নান সেরে উঠে চুল মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৃন্দাবনীর উঠবার অপেক্ষায়, তার সেই মুক্তোঝরা চুলের রাশ দেখে গোবিন্দ অধিকারীর গানের একটি কলি মনে পড়ল—'দেখিনি এমন ঝাঝর ঝামর চামর কেশ।' পাছে চন্দনীর চোখে পড়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে চলে এলো। আজ আবার মেয়েদের এলোচুল দেখে সেই কথা মনে পড়ল—'দেখিনি এমন ঝামর ঝামর চামর বেশ কেশ।' ঘোড়ার গতি দ্রুততর করে কুঠিবাড়িতে এসে পৌছাল।

মোহন বলে উঠল, এই দেখো অছিমুদ্দি ভাই, বলছিলাম না যে বাবুজি এখুনি ফিরে আসবেন!

আর এখন ফিরলে কি হবে, এখন রওনা হলে পরগণায় পৌছতে রাত দুপহর হয়ে যাবে, পথে বিপদ আছে।

আর বিপদ তো ঐ ঈশান রায়ের লাঠিয়াল, আমরা এতজন আছি কি করতে?

সেকথা ঠিক মোহন ভাই, তবে বাবুজির গায়ে চোট লাগলে কত্তারা আমাকে আস্ত রাখবে না।

সে একটা কথা বটে, বলে মোহন এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া ধরলো, শুধালো, আজই কি রওনা হবেন?

দীপ্তিনারায়ণ বলল, না, আজ আর রওনা হব না, কালকে ভোরে রওনা হলেই চলবে।

তবে তাই গিয়ে বলি পরগণার সর্দারদের।

দেখ ওদের রাতে থাকা-খাওয়ার যেন অসুবিধা নয় হয়। আর আমার কথাও ভুলিস না।

বাড়িতে ঢুকতেই অনুভব করল সব চন্দনীময়, তার অঙ্গের সুবাসে সব আচ্ছন্ন, সব চন্দনের গন্ধ, ভাবে কে রেখেছিল ওর নাম চন্দনী? পাগলের মতো এ ঘর ও ঘর, বিশেষভাবে যে ঘরে চন্দনীরা শুতো সেই ঘরে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। বৃন্দাবনী মাসির গাওয়া পদগুলো এলোমেলো হয়ে তার মনে পড়তে লাগল, 'নাম হি শ্রবণে যদি ঐছন হয়, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।' চোখে পড়ল মানুষ-প্রমাণ আয়নাখানা যার মধ্যে শতদলের মতো ভেসে উঠত সেই মুখ। মনে পড়ে গেল একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ললাটে কুঙ্কুমের বিন্দু আঁকছিল, এমন সময়ে আয়নায় পড়ল দীপ্তিনারায়ণের ছায়া, বারান্দা দিয়ে সে যাচ্ছিল।

আপনি তো ভারি অভদ্র, একজন মহিলার প্রসাধন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছেন।

তুমি আবার মহিলা হলে কবে? তুমি তো বালিকা।

তবে ভুলবেন না যে আপনিও বালক।

বেশ, সেটা এমন মন্দ কি। ব্রজের কৃষ্ণও তো বালক ছিল। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করো তোমার বৃন্দাবনী মাসিকে। বেশ মনে করিয়ে দিয়েছ, ভাবছি বৃন্দাবনী মাসিকে নিয়েই বৃন্দাবনে যাব।

আর বৃন্দাবনে গিয়ে কণ্ঠী বদল করে বিয়ে করবেন।

মন্দ বলোনি, কিন্তু বৃন্দাবনে তো কারো বিয়ে হয় না, সবাই সখা-সখী।

তবে বিয়েটা বুঝি এই হতভাগ্য বাংলা দেশের জন্য রইল?

তা যদি মনে করো তবে তাই।

নিন, এখন কোথায় যাচ্ছিলেন যান। আমার কাজ আছে।

এমনি কত স্মৃতির টুকরো ভেসে আসে মনের মধ্যে!

আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। বাগানের মধ্যে ঘুরছিল চন্দনী, এমন সময়ে এলো দীপ্তিনারায়ণ।

চন্দনী বলল, আপনার বাগানটা কিছু নয়।

বাগানের অপরাধ?

অপরাধ বাগানের নয়, বাগানের মালিকের। ফলের গাছ আছে ফল নাই।

আগে যদি জানিয়ে আসতে তবে কমলালেবুর গাছ লাগিয়ে দিতাম, দিব্যি পেড়ে পেড়ে খেতে।

আম জাম লিচু জামরুল সমস্তই গ্রীষ্মকালের ফল।

কেন এই যে পেয়ারা গাছ আছে, ফলও ফলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে চন্দনীর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়। গাছতলায় গিয়ে হাত বাড়ায়। সমস্তই নাগালের বাইরে, অনেক চেষ্টাতেও ফল পর্যন্ত পৌঁছয় না।

পেড়ে দিন না।

চন্দনী, ফল পেতে গেলে চেষ্টা করতে হয়। কেন তোমার জন্যে চেষ্টা করব, ফল খাবে তুমি আর চেষ্টা করব আমি!

ভারি তো একটা পেয়ারা গাছ। অমন ঢের ঢের আছে আমাদের বাগানে।

তবে অসুবিধা এই যে বাগানটা এখানে নেই।

নিন রইল আপনার গাছ, চললাম আমি।

দু'পা গিয়েই তাকে ফিরতে হল, সেই সাদাটে সরস পেয়ারা ফিরিয়ে আনলো তাকে।

পেড়ে দিন না।

দেবো যদি আমার কথা রাখো।

পেয়ারার লোভে কি কথা না শুনেই বলল, রাখবো, রাখবো, রাখবো।

তিন সত্যি করলে তো। আচ্ছা তবে এই নাও, তিন সত্যির বদলে তিনটি পেয়ারা।

দুটো দু'হাতে নিয়ে তৃতীয়টা পরম বদান্যতার সঙ্গে দীপ্তিনারায়ণকে দিল।

কি, খাচ্ছেন না ?

তখন কি তার পেয়ারা খাওয়ার কথা মনে আছে, সে অতৃপ্ত নেত্রে দেখছে চন্দনীর পেয়ারা খাওয়া। কি সুন্দর সাদা সাদা কচি কচি দাঁতগুলো! দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, আহা পেয়ারাটার কি সৌভাগ্য!

কি হাঁ করে দেখছেন কি, কখনও কি কাউকে পেয়ারা খেতে দেখেননি ?

তার ইচ্ছা হল পদাবলীর ভাষায় উত্তর দেয়, কিন্তু লাগসই কিছু মনে পড়ল না।

চন্দনী চলে যায় দেখে বলল, কি আমার কথা না রেখেই চলে যাচ্ছ যে বড় ?

কথাটা না বললে রাখবো কি করে।

তবে শোনো, সেদিন যেমন কপালে কুঙ্কুমের টিপ দিচ্ছিলে তেমনি টিপ আমি দিয়ে দেব।

এতক্ষণ হাসিখুশি চন্দনী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, দিয়ে তো দেবেন, শেষ রক্ষা করতে পারবেন ?

এবারে দীপ্তিনারায়ণের গম্ভীর হওয়ার পালা। এমন কথার এমন উত্তর পাবে ভাবতে পারেনি, অপ্রস্তুতের একশেষ হয় সে। তাকে অপ্রস্তুত ও গম্ভীর দেখে হাসি ফুটল অপর পক্ষের মুখে।

কি হাসছে কেন ?

পুরুষকে বোকা বানাতে আমার খুব ভালো লাগে—এই বলে কুঠির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ পিছনে ফিরে জিভ বার করে মুখ ভেংচি করল পুরুষটির উদ্দেশ্যে। তখন পুরুষটি গাম্ভীর্যের অথৈ জলে নিমজ্জমান। কিশোর নির্বোধ, কিশোরী রহস্যময়ী। কিশোরী রাধিকা যত চোখের জল ফেলেছে ফেলিয়েছে তার অনেক বেশি।

এমন কত সুখময় স্মৃতির টুকরো একে একে মনে পড়ে দীপ্তিনারায়ণের। এসব ঠিক পূর্ণ জাগ্রত প্রণয় নয়, প্রথম প্রণয়ের দেয়ালা।

১৬

সে স্থির করে আজ রাতে আর ঘুমোবে না, শুয়ে শুয়ে সারারাত ধরে ভাববে চন্দনীর কথা, চন্দনীর স্মৃতি। একবার মনে হয় ঘুমিয়ে পড়লেও তো চন্দনীকে স্বপ্নে দেখতে পারে। না দেখতেও তো পারে, বিফলে ঘুমিয়ে রাতটা কেটে

যাবে। হায়, স্বপ্ন যদি ইচ্ছালব্ধ হত তবে সংসার বোধ করি এত দুঃখময় হত না।

দীপ্তিনারায়ণ একাকী শয্যায় শুয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চন্দনীর কথা, চন্দনীর কার্যকলাপ চিন্তা করতে থাকে, যে-সব দুর্লভ সুযোগ হাতের কাছে এসেছিল, অবহেলায় ধরেনি, সে-সমস্ত আজ নীরবে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল তাকে। তাদের উদ্দেশে হাত বাড়ায়, ধরা দেয় না তারা। এইভাবে অনেকক্ষণ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের লুকোচুরি চলে। একদিনের কথা তার মনে পড়ে যায়। একদিন ঘরে ঢুকে দেখল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চন্দনী, তার খোঁপায় গোঁজা একটা গন্ধরাজের কুঁড়ি। দীপ্তিনারায়ণের লুব্ধ নেত্র এড়ালো না চন্দনীর দৃষ্টি। রেগে উঠে বলল, কেন এখানে এসেছেন? অপ্রস্তুত হয়ে দীপ্তিনারায়ণ প্রস্থান করল। যদি তার মুখ দেখতে পেত, তবে দেখতে পেত ওষ্ঠাধরেও একটি শুভ্র হাসির কুঁড়ি। মনে মনে বলল, পুরুষরা এমনি বোকা হয়। ফুলটা টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বের হয়ে গেল চন্দনী। সেই অবসরে দীপ্তিনারায়ণ ঘরে ঢুকে ফুলটি তুলে নিয়ে প্রস্থান করল। কিছুক্ষণ পরে তার কানে গেল, কুঠিয়ালবাবু একটু সাবধান হয়ে চলবেন, এ বাড়িতে চোর ঢুকেছে।

কি করে বুঝলে?

আমার ফুলটা চুরি গিয়েছে।

সেটা এমন কিছু অমূল্য বস্তু না, গাছে অনেক আছে, তুলে নাও।

সেটা কথা নয়, চোরের হাত শুধু যে ফুল নিয়েই ক্ষান্ত হবে এমন না হতেও পারে।

আমার এমন কিছু দুর্লভ বস্তু নেই যা খোয়া গেলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

আমার তো হতে পারে।

সেদিন এই পর্যন্ত। যাওয়ার দিন সকালবেলায় চন্দনী বলল, কুঠিয়ালবাবু একটু সাবধানে থাকবেন।

কাছেই ছিল তার মা, বলল, কেন মিছে ভয় দেখাচ্ছিস। অতবড় একটা লোককে অমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলিস তুই।

খুব বড় নয় মা, মাত্র চার আঙুলের বড়।

এ সুযোগ ছাড়ল না দীপ্তিনারায়ণ, সেদিন মেপেছিল কিনা মাসিমা।

তোর কি, লজ্জাসরম কোনোদিন হবে না, পাশে দাঁড়িয়ে মাপতে গেলি।

চন্দনী ঠকবার পাত্রী নয়, বলল, পাশে দাঁড়াতে যাব কেন। পাশাপাশি দু'জনের ছায়া পড়েছিল তাই থেকে বুঝেছি।

দীপ্তিনারায়ণ বুঝল এ মেয়ে চতুরের শিরোমণি, বুঝেসুঝে কথা বলতে হবে এর সঙ্গে। কিন্তু আর বুঝবার সময় পাওয়া গেল না। সেদিন রাতেই রওনা হয়ে গেল চন্দনীরা।

এইভাবে সুখচিন্তার দোলায় যখন সে দোদুল্যমান, বাইরে রাতের গভীরে প্রান্তর জুড়ে বাজছে ঝিঁঝির খঞ্জনী আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে চন্দনী, চন্দনী, চন্দনী। চরাচরের যত মাধুর্য, যত সৌন্দর্য, যত তাৎপর্য সমস্ত ঘনীভূত ঐ নামটির মধ্যে। তার মনে পড়ে গেল বৃন্দাবনী মাসির পদাবলীর একটি কলি, "নাম শ্রবণে হি যদি ঐছন করয়ে অঙ্গের পরশে কি বা হয়।" মনে পড়ল অঙ্গের পরশও তো মুহূর্তকালের জন্য হয়েছিল। বজরা থেকে বিদায়ের কালে যখন তার প্রকোষ্ঠে বেষ্টন করেছিল চন্দনীর তরল কোমল অঙ্গুলিগুলি। মূঢ় সে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়েছিল, মূঢ় মূঢ় মূঢ়তার চূড়ান্ত। তারপরে সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট প্রকোষ্ঠে কতদিন সে চুম্বন করেছে, কতদিন কতবার। আজ সেখানে চুম্বনে দংশনে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। বাইরে তখন বাজছে ঝিঁঝির খঞ্জনী আর অন্তরে বাজছে রক্তের ঝুমঝুমি—যার একটি মাত্র ধুয়া—চন্দনী, চন্দনী, চন্দনী।

হঠাৎ তার মনে হল তবে চন্দনী পত্রের মধ্যে 'তুমি এসো না' লিখতে গেল কেন। এ কি প্রেমের সতকর্তা না ঘৃণার ধিক্কার। তখনই বিশ্লেষণের জট পাকিয়ে যায়, রক্তদহের প্রতি জোড়াদীঘির যদি ঘৃণাপূর্ণ অন্তর্দাহ থাকে তবে জোড়াদীঘির প্রতি রক্তদহের অনুরূপ মনোভাব থাকা কি এতই অসম্ভব? কিন্তু কেমন করে জানবে যে আমি জোড়াদীঘির সন্তান, বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত তো জানত না। তখনি আরো একটু জট পাকিয়ে যায়—তখন জানত না, পরে জেনেছে। তবে ইন্দ্রাণীর সাদর আহ্বান কেন, তাও কিনা আবার জোড়াদীঘির হাত থেকেই রক্ষা করতে জোড়াদীঘির সাহায্য প্রার্থনা। না, নিশ্চয় তারা জানে না তার পরিচয়। তবে ঐ 'তুমি এসো না'—এই নিষেধ বাক্য ঘৃণার ধিক্কার নয়। কাজেই প্রেমের সতর্কতা। সে তড়িৎ বেগে শয্যার উপর উঠে বসল। সবেগে বলে উঠল, চন্দনী আমাকে ভালোবাসে।

ঠিক সেই সময়েই তার চোখ পড়ল দেয়ালে পিতার বৃহৎ তৈলচিত্রখানার উপরে। এতক্ষণ চাঁদের আলো তির্যক ভাবে এসে পড়েছে। এক খণ্ডিত মুহূর্তের

মধ্যে সুখচিন্তার সূক্ষ্ম বস্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। পিতার মুখ স্বভাবতই সৌম্য গম্ভীর। আজ যেন সেই মুখ পুত্রের চোখে রুক্ষ গম্ভীর বলে বোধ হল, তার কেমন যেন ধারণা হল পিতা তার চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে যাচ্ছেন—তাই এই অপ্রসন্নতা। সে অনেক দিন ভেবেছে পিতা জীবিত থাকলে হাতে পায়ে ধরে চন্দনীকে বিবাহ করবার অনুমতি চেয়ে নিত। আর চন্দনীর কচি মুখখানা দেখলেও হয়তো তাঁর রক্তদহ-বিদ্বেষ বিচলিত হত। অতটুকু মেয়ের সঙ্গে বংশগত বিদ্বেষের কাই বা যোগ। তখনি তার মনে হল জীবিতের সঙ্গে তর্ক চলে, মৃত তর্কের অতীত। এখানেই জীবিতের উপরে মৃতের জিত।

দীপ্তিনারায়ণ ভাবে দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলা সহজ, একটা নৌকো থেকে পা সরিয়ে নিলেই হল। কিন্তু সে এমন একটা নদীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যার উপরিতলের স্রোত আর অন্তস্তলের স্রোত পরস্পর বিপরীতমুখী। জলের উপরের অংশ যখন টানছে একমুখে, জলের নীচের টান অনুভব করছে তার বিপরীতে। এ কি দুর্দৈব! কে দায়ী এই উভয় সঙ্কটের জন্য? অদৃষ্ট। অদৃষ্টকে তো ধরা-ছোঁওয়া যায় না। তার সঙ্গে বোঝাপড়ার কি উপায়?

এই উভয় সঙ্কটের দায়িত্ব কি তার ধুলোউড়ির কুঠিতে নির্বাসনের? নতুবা তার কাছে এসেই বজরাখানা বানচাল হওয়ার উপক্রম হল কেন! তার মন চারদিকে অপরাধীর সন্ধান করে ঘুরতে লাগল। অবশেষে তার মনে হল সব দায়দায়িত্ব সমস্ত অপরাধ ঐ চন্দনীর। কি তার দোষ! দোষ তো একটা নয়, সে এত সুন্দর হতে গেল কেন, তার কথাগুলো এমন মধুর কেন, তার চোখ দুটো এমন চপল কেন, তার চুলের ঝারা এমন দীর্ঘ কেন? দোষ কি একটা? আশ্চর্য এই যে, অপরাধী নিরপরাধী নির্বিচারে যখন সকলকেই দায়ী করছিল একবারও তার মনে হল না এই দায়িত্বের সাকুল্য না হোক অংশবিশেষে তার নিজের হতে পারে। এই বিচিত্র চিন্তার স্রোতে দোলায়িত হতে হতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাবা দীপ্তিনারায়ণ, রক্তচন্দন মাখিয়ে জবা ফুল হাতে নাও, যেমন ভাবে আমি নিয়েছি, এবারে জোরে আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মা-কালীর উদ্দেশে বলো, রক্তদহ কৃত অপমান কখনো বিস্মৃত হব না। কায়মনোবাক্যে রক্তদহ জমিদারবংশের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করব, যদি নিতান্ত অক্ষম হই তবে সেজন্য না করব নিজেকে ক্ষমা, না করব তাদের ক্ষমা; এই সঙ্কল্প করে অন্যান্য অনেক বারের মতো আর একবার অঞ্জলি দাও মা-কালীর পায়ে। মনে রেখো যার দেহে

একবিন্দু রক্তদহের রক্ত আছে জোড়াদীঘির ক্ষমার অযোগ্য সে। মনে রেখো অতৃপ্ত পিতৃ-জিঘাংসার সমস্ত দায় বর্তালো তোমার উপর। দাও এবার অঞ্জলি মায়ের পায়ে। পিতা-পুত্র উভয়ের অঞ্জলিবদ্ধ জবাফুল কালীমাতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হল।

ধড়ফড় করে জেগে উঠল দীপ্তিনারায়ণ, দেখল সেই শীতের রাতেও সে ঘেমে উঠেছে, গলার চারদিকে ঘাম। এ কী স্বপ্ন! স্বপ্ন ছাড়া আর কি হবে—এই তো সে পরিচিত কক্ষে পালঙ্কের উপরে শায়িত—ঐ তো দেয়ালে পিতার তৈলচিত্র—কিন্তু কোথায় সেই তৈলচিত্র, কোথায় গেল ছবিখানা। পিতা কি অন্তিম আদেশ দিয়ে অন্তর্ধান করেছেন নাকি! চকিতে সে উঠে দাঁড়াল। না ছবিখানা যথাস্থানেই আছে। চাঁদের আলো সরে যাওয়াতে চোখে পড়েনি। না আর পালাবার পথ নাই—পিতার অন্তিম স্বপ্নাদেশ তার সুখচিন্তার পথ সব অবরুদ্ধ করে দিয়েছে, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

এতদিন যে গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরছিল তার জঠর থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে সে, আকাশ বাতাস আলো। আঃ সে বেঁচে গেল, বেঁচে গেল, আর তার ভয় নাই। শুনলো বাইরে ফিঙে ডাকছে, ডাকছে কাক। সে ডাকল, মোহন! মোহন পাশের ঘরেই শুতো, ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। দরজা খোলা ছিল খোলাই থাকত।

শোন্, পরগণার পাল্কিবেহারার দল আছে না ভাগিয়ে দিয়েছিস?

ভাগাতে যাব কেন, আর সে চেষ্টা করলেও যাবে না। আপনাকে নিয়ে তাদের যেতে হবে এই তাদের উপরে হুকুম।

তবে বল্ গিয়ে যে আজকে খাওয়াদাওয়া সেরে বেলা দশটার পরে রওনা হব।

এ কথা শুনলে তারা কি বলবে জানি। দশটায় রওনা হলে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, পথে বিপদ আছে।

বিপদ! তবে তোরা আছিস কেন; বেহারা-বরকন্দাজে জন ষোল লোক, তার উপরে তুই আছিস।

আচ্ছা তবে তাই বলি গিয়ে। এই বলে মোহন বের হয়ে গেল।

যথাসময় পাল্কিতে চেপে যখন দীপ্তিনারায়ণ রওনা হতে উদ্যত এমন সময় লাঠি ভর দিয়ে মুকুন্দ এসে হাজির হল, বলল, কি খোকাবাবু একাই চললে, আমাকে সঙ্গে নেবে না।

দীপ্তি বলল, মুকুন্দদা সবাই গেলে চলবে কেন, কুঠিবাড়ি আগলাবার জন্যে তোমাকে এখানে রেখে গেলাম, ও তো যার তার কাজ নয়।

মুকুন্দর মুখে আত্মশ্লাঘার হাসি ফুটল, বলল, তা বটে তা বটে। ফিরে এসে দেখতে পাবে সব ঠিক আছে। এখনো লাঠি ধরে দাঁড়ালে—তার বাক্য শেষ হওয়ার আগেই পাল্কি তুলে নিয়ে বেহারার দল রওনা হল। তখন মুকুন্দর দন্তহীন মুখে হাসি, চোখ ঝাপসা।

পাল্কি চলেছে, মানুষপ্রমাণ পাল্কি, পুরু গদি মোড়া, লম্বা হয়ে শুতে অসুবিধা নাই। আগে পিছে দু'জন করে বন্দুকধারী বরকন্দাজ, একপাশে ঘোড়ার উপরে মোহন—এই ভাবে সশস্ত্র পাল্কি চলেছে, পথে বিপদ আছে সবাই জানত।

দীপ্তিনারায়ণের মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই, সে দিব্যি পাল্কির খোলা দরজার কাছে বসে মাঝে মাঝে মোহনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। ঘোড়ার চাল আর পাল্কির চাল সমান, কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে না।

হ্যাঁ মোহন, ঐ দূরে ওটা কোন্ গ্রাম রে?

ওটার নাম বড়দীঘি।

মস্ত একটা দীঘি আছে বুঝি?

কোনো কালে হয়তো ছিল, এখন কোনো চিহ্ন নেই।

এসেছিস নাকি?

কতবার।

কেন রে?

এমনি বেড়াতে। কুসমি যখন ছোট ছিল, অবশ্য আমিও তখন এত বড় ছিলাম না।

এতবার আসবার দরকার কি?

বড়দীঘির কাঁচামিঠে আমের খুব নামডাক।

তাই বুঝি চুরি করে খেতে আসতিস?

কি যে বলো দাদাবাবু, কাঁচা আম পাড়লে কি চুরি করা হয়!

ও যে কাঁচা অবস্থাতেই মিঠে। আচ্ছা চুরি নয় তো নয়, কিন্তু মনে হল ঐ কচি মেয়ে কুসমির কি হবে রে। এই বয়সেই বিধবা হল।

মোহন পাদপূরণ করে দিয়ে বলল, তার উপরে আবার বাপ মা কেউ নেই।

কেন ভাবু রায়?

তাকে তো এতদিন বাপ বলেই জানতাম, পরে শুনলাম পালিতা কন্যা।

চমকে ওঠে দীপ্তিনারায়ণ, বলিস কি রে! কার মেয়ে, কোথায় পেল!

কেউ জানে না।

কেন, কেউ জিজ্ঞাসা করেনি?

বাপ রে, কার সাধ্য, যে বাদশাহী গোঁফ ডাকু রায়ের! ভয়ে কাছে ঘেঁষে না কেউ।

আচ্ছা কেউ না ঘেঁষুক, ভাবছি ঐ কচি মেয়েটার কি হবে।

তবে খুলে বলি, আমি ভেবেছিলাম রানীমা যদি জমিদারিতে ফিরে না গিয়ে বৃন্দাবনের দিকে যেতেন তবে তাঁকে বলে কয়ে ওকে সঙ্গে দিয়ে দিতাম। বৃন্দাবনী মাসীর সঙ্গে কুসমির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

দেখ তো, কোথাকার কার মেয়ে কোথায় এসে পড়ল।

মোহন বলল, এই রকম স্ত্রী-পুরুষের জন্যই আছে কাশী বৃন্দাবন।

আচ্ছা ঐ বাঁদিকের রাস্তাটা কোন্ দিকে গিয়েছে?

গিয়েছে উত্তর দিকে।

আরে সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কোন্ গাঁয়ে কোন্ শহরে জিজ্ঞাসা করছি।

দাদাবাবু, এদিকে তো সবই গ্রাম, শহর আবার কোথায়। হাঁ শহর একটা আছে বটে তবে অনেক দূরে, তার নাম পাবনা।

জেলার সদর বুঝি! গিয়েছিস সেখানে?

একবার গিয়েছিলাম।

কি দেখলি?

শহরে যেমন সব থাকে সবই আছে। পেয়াদা, আদালত, জেলখানা, জজ ম্যাজিস্টর ডাক্তারসাহেব।

আচ্ছা ঐ সারবন্দী গরুর গাড়িগুলো কোথায় চলল?

মোহন হিসাব করে বলল, আজ যে বৃহস্পতিবার, মস্ত হাট বসে রাউতারায়, সব চলেছে সেখানে।

এমন সময় বেহারারা থেমে কাঁধ বদল করে নিল।

মোহন, ওদের কষ্ট বোধ হলে জিরিয়ে নিতে বল্।

কি যে বলো দাদাবাবু, ওরা খামোকা বসে থাকলেই কষ্ট বোধ করে, পাল্কি কাঁধে তুললেই ওরা আরাম পায়।...একটু ঘুমিয়ে নিন দাদাবাবু।

এমন দুপুরবেলায় কি ঘুমোব—এই তো কত নূতন নূতন জায়গা দেখতে দেখতে যাচ্ছি, এদিকে তো কখনও আসা হয়নি।

দীপ্তিনারায়ণ অতৃপ্ত চোখে দেখছে, দু'দিকের মাঠে মাঠে সরষে ফুলে সোনা ছড়িয়ে দিয়ে রেখেছে। তার মিষ্ট কষায় গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে নাকে, মগজের কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠছে। ক্রমে তার চোখ ঢুলে এলো, তারপরে কখন অজ্ঞাতসারে পড়ল ঘুমিয়ে। যতক্ষণ পাল্কির তালে তালে দোলা খাচ্ছিল ঘুমোচ্ছিল সে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখল পাল্কি নামানো হয়েছে।

হাঁ রে মোহন, পাল্কি থামল কেন?

আপনাকে ঘুমোতে দেখে বেহারারা একটু জিরিয়ে জল খেয়ে নিচ্ছিল।

দীপ্তিনারায়ণ দেখল, জলপানের মতোই দীঘি বটে, অজস্র পদ্মফুলে ফুলন্ত।

চমৎকার দীঘিটা। জল পান্না তরল।

কি নাম রে দীঘিটার?

এদিকে কখনও আসিনি, কি করে নাম জানবো!

বেহারাদের জিজ্ঞাসা কর্ না।

একজন বেহারা দীপ্তিনারায়ণের প্রশ্ন শুনতে পেয়েছিল, বলল, এটাকে রতনদীঘি বলে।

সে ভাবল রতনদীঘিই বটে, পাল্কি থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণ বসে থেকে হাত পা কাঠ হয়ে গিয়েছে, একটু ঘুরে নেওয়া যাক।

একজন বরকন্দাজ বলল, না হুজুর, আর দেরি করবেন না, সূর্য পাটে নামছে, কাছারীতে পৌঁছতে রাত একপহর হয়ে যাবে।

আর একজন বলল, পথে বিলম্ব না করতে মণ্ডল মশাই বলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন পথে বিপদ আছে।

তোরা তো সবাই বিপদ বিপদ করছিস, বিপদটা কিসের?

এ ওর মুখের দিকে তাকালো, কি বলবে, আদৌ কিছু বলবে কি না ভাবছিল তারা।

চোর ডাকাত নাকি?

না হুজুর, ঈশান রায়ের দলের ভয়।

ঈশান রায়ের উপদ্রবের বিবরণ শুনেছিল মোহনের কাছে, মোহন শুনেছিল বরকন্দাজদের কাছে।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল রক্তদহের রাজবাড়ির সেই চিঠির একান্তে কাঁচা

মেয়েলি হাতের লেখায় ছোট্ট একটি বাক্যের নিষেধাত্মক সতর্কতা, 'তুমি এসো না।' ঐ ছোট্ট একটুখানি নিষেধের কুশাঙ্কুর তার মনের মধ্যে বিঁধে ছিল এখন সেই কঠিন কুশাঙ্কুর শ্যামল কোমল তৃণাঙ্কুরের মতো, সুখস্পর্শ ছিল মনের মধ্যে। তখনি মনে হল গতরাতের স্বপ্নের অঞ্জলি প্রদান। আবার কেন, আবার কেন, আবার কেন চন্দনীর স্মৃতি। সে তো বিসর্জন করেছে ঐ অতল রতনদীঘির অতল জলে। সেই বিস্মৃত স্মৃতিই কি ফুটিয়েছে ঐ হাজার হাজার পদ্মফুল! নাঃ, আর এসব অলীক চিন্তা নয়।

মোহন, জোরে পা চালাতে বল্ বেহারাদের।

কিছুক্ষণ পরে মোহনকে সে শুধালো, হাঁ রে, ঐ পুবদিকে অনেক দূরে ঐ যে মস্ত বাড়ির চুড়োটা দেখা যাচ্ছে ওটা কাদের বাড়ি?

মোহন জানত না। বরকন্দাজদের জিজ্ঞাসা করে জানল। দাদাবাবু ওরা বলছে ওটা রক্তদহের রাজবাড়ি।

চমকে উঠল সে।

কত দূরে?

অনেক দূরে। ভয় নেই।

ভয় আবার কিসের?

ঐ রাজবাড়ির সঙ্গেই যে আমাদের বিবাদ।

না ভয় নেই চল্, বলে মনে মনে কপাল চাপড়িয়ে বলল, হা ভগবান। যেখানে আমার মনের পরম আশ্রয়, তারই সঙ্গে নাকি বিবাদ। যতক্ষণ বাড়িটা দেখা গেল একদৃষ্টে চেয়ে থাকল সেই দিকে। ওরই কোনো এক প্রকোষ্ঠে আছে সে। সে, সে, সে। তার শপথ নামটি শুদ্ধ উচ্চারণ করবে না। তারপর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটা হারিয়ে গেলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলে বেরুল তার বুকের মধ্যে থেকে।

পাল্কি চলেইছে—চরাচর ঘোরতর অন্ধকার, মাঝে মাঝে শিবাধ্বনির জাল নিক্ষেপ আর আকাশে অজস্র তারকার বিন্দু, তার সঙ্গে মিলেছে বেহারাদের একটানা হুম্মা হুম্মা রব, সমস্তই নিদ্রার অনুকূল। একাকী উপবিষ্ট দীপ্তিনারায়ণ কখন আপনার অগোচরে প্রবেশ করল তন্দ্রায় মধ্যে। নিদ্রার উপকণ্ঠ তন্দ্রা। হঠাৎ সে চমকে উঠল বন্দুকের আওয়াজে, বন্দুক ছোঁড়ে কে! ভাবল তার বরকন্দাজরাই ছুঁড়েছে। কিন্তু আবার, আবার।

মোহন, কে বন্দুক চালায় রে?

কিছু না দাদাবাবু, আপনি চুপ করে থাকুন।

দূরে ও কাছে দুই দফার বন্দুকের আওয়াজ।

ওরা কে রে?

মোহন উত্তর দেওয়ার আগেই বরকন্দাজদের একজন বলল, ঈশান রায়ের লোকেরা পাল্কি চড়াও হতে আসছে, এখনি হারামজাদাদের মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনি পাল্কি থেকে বের হবেন না।

ঈশান রায়ের লোকেরাই বটে। এমন ঘন অন্ধকারেও পক্ষ প্রতিপক্ষ পরস্পরকে চিনেছে। ঈশান রায় অতিশয় ধূর্ত। রাজকীয় অনেক গুণ তার মধ্যে বর্তমান। সংবাদ সংগ্রহ আর মন্ত্রগুপ্তি রাজগীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। সে খবর পেয়েছিল যে ধুলোউড়ির কুঠি থেকে দর্পনারায়ণের পৌত্র দীপ্তিনারায়ণকে পরগণার প্রধানবা নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করে পাল্কিবেহারা বরকন্দাজ পাঠিয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে সে আতঙ্কিত হল, ভাবল একবার জোড়াদীঘিব বাবু পরগণায় এসে পৌঁছলে তার পক্ষে পরগণা হাত করা অসম্ভব হবে। এই পরগণা দুটোয় তার অনেক দিনের লোভ। এই উদ্দেশ্যেই পলোওয়ানাদের রাজগী স্বীকাব করেছিল সে। ঘটনাচক্রে পলোওয়ানাদের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে ববকন্দাজ ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করল আর তাদেরই পাঠিয়ে দিল পথের মাঝে হানা দিয়ে পাল্কিসুদ্ধ জোড়াদীঘির বাবুকে নিয়ে আসতে। একবার তাকে হাত কবতে পারলে পরগণার প্রজাদের মনোবল হ্রাস পাবে। তারপর? তারপরে ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। কিন্তু যে দলটিকে পাঠিয়েছিল তাদের উপরে হুকুম ছিল কখনো যেন বাবুর গায়ে আঘাত না লাগে, তাকে সসম্মানে নিয়ে এসে হাজির করতে পারলে ইনাম মিলবে। কিন্তু একটি গুরুতর ভুল করে ফেলল ঈশান রায়, ভুলে গিয়েছিল যে নির্বোধ নিয়ে সে কাজ করছে। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে, বেঁধে আনতে বললে মেরে আনে যারা তারাই সাধারণত রাজার আশেপাশে জুটে যায়। এ দলটিও তার ব্যতিক্রম নয়। দলের সর্দার কদম সিং ভাবল রাজা যাই বলুন না কেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গেলে চলে না। সে স্থির করল বাবুটির শির নিয়ে গিয়ে রাজাবাহাদুরের পায়ে ভেট দিতে পারলে ইনাম তো মিলবেই, চাই কি রাজা বাহাদুরের খুশীর জোয়ারে খোদ পাট-হাতীটাও তার ভাগ্যে জুটতে পারে। তাই কদম সিং বন্দুক ছুঁড়লো, সর্দারের অনুসরণ করে অন্যেরাও ছুঁড়লো। তখন এ পক্ষেও বন্দুক চলল। সেই দোতরফা আওয়াজে তন্দ্রা ভঙ্গ হয়েছিল দীপ্তিনারায়ণের।

পাল্কির দরজা খোলবার চেষ্টা করতেই মোহন বলে উঠল, দাদাবাবু আপনি বের হবেন না, বাইরে দাঙ্গা বেধে উঠেছে।

দাঙ্গা বাধালো কারা ?

বেহারাদের ধারণা ঈশান রায়ের লোক।

দাঙ্গা বেধেছে আর আমি পাল্কির মধ্যে লুকিয়ে থাকব !

লুকিয়ে থাকবেন কেন, বসে থাকুন। আমরা আছি কি করতে ?

আবার বন্দুকের আওয়াজ।

দীপ্তিনারায়ণ বলে উঠল, ওদের বন্দুক আছে দেখছি !

মোহন বলল, একটা মাত্র, আমাদের চারটে, এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

এমন সময়ে পাল্কির ছাদের উপরে লাঠির শব্দ হল। বাইরে তখন লাঠিতে লাঠিতে ঠকাঠক আওয়াজ।

বেহারাদের একজন চিৎকার করে উঠল, পড়েছে বেটা। যে লোকটা পাল্কির উপরে লাফিয়েছিল মাথা ফেটে সে পড়ে গিয়েছে।

আবার একসঙ্গে তিন-চারটে বন্দুকের আওয়াজ।

এ পক্ষের রব উঠল, পড়েছে পড়েছে !

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এলোপাতাড়ি বন্দুক চলছে, কে পড়ল, কটা পড়ল নিশ্চয় করে বুঝবার উপায় নেই।

বাইরে লড়াই চলছে তাকে রক্ষা করবার জন্যে আর পাল্কির মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকবার লোক দীপ্তিনারায়ণ নয়, দর্পনারায়ণের পৌত্র সে। দরজা খুলে সে বাইরে বের হওয়ামাত্র একখানা লাঠি এসে পড়ল তার মাথায়, উঃ শব্দ করে পড়ে গেল সে।

বাবুজির মাথায় চোট লেগেছে বলে বেহারা ও বরকন্দাজরা ছুটল লাঠি বন্দুক হাতে, সর্বাগ্রে মোহন।

বাবুজির মাথায় চোট লেগেছে শুনে ঈশান রায়ের দল পালাল, বুঝল কাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে, বাবুর গায়ে আঘাত না লাগে যেন ছিল ঈশান রায়ের হুকুম। সকলে ধরাধরি করে দীপ্তিনারায়ণকে তুলে পাল্কির মধ্যে শোয়াল। তারপরেই আরম্ভ হল বিতর্ক। বরকন্দাজরা বলে, হুজুরকে নিয়ে যাব কাছারিতে। বেহারার দল বলে, কাছারিতে কি ডাক্তার আছে, পাল্কিতে করে তাকে নিয়ে যাই পাবনা শহরে, সেখানে সাহেব ডাক্তার আছে।

এ তর্কের শেষ নাই, বরকন্দাজদের হাতে বন্দুক, বেহারাদের কাঁধে পাল্কি, দুই দলেরই সমান শক্তি। দীপ্তিনারায়ণের তখনও জ্ঞান আছে তবে আচ্ছন্ন অবস্থা, কানে ওদের কথাবার্তা আসছিল। সে ডাকল, মোহন শোন, আমাকে রক্তদহের রাজবাড়িতে নিয়ে চল।

এ প্রস্তাবের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, সবারই স্তম্ভিত ভাব।

দীপ্তিনারায়ণ আবাব বলল, পাল্কি তুলতে বল।

এ আদেশ অমান্য কববার কারও সাহস হল না। পাল্কি বওনা হল রক্তদহের বাজবাড়ির দিকে। ঘণ্টাখানেকেব মধ্যেই পাল্কি এসে পৌছলো রাজবাড়ির দেউড়িব সামনে। দেউড়ি বন্ধ। সেকালে রাজা জমিদাবদেব বাড়িব প্রকাণ্ড দেউড়ি সন্ধ্যার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যেত, ভোব হওয়ার আগে খুলত না। তবে আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য দেউড়িব একটা পাল্লাব মধ্যে ছোট একটা প্রবেশেব পথ ছিল, বলত কাটা পাল্লা। মোহন কান পেতে শুনল ভিতবে বিহাবী হিন্দিতে গান চলেছে, তার মনে হল যেন চহবজা সিং-এর গলা। চহবজাব সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল ধুলোউড়িব মাঠে। সে ডাকল, চহরজা ভাই, দরবাজা তো খোল।

চহরজা ভিতব থেকে বলল, কোন হ্যায় বে?

আমি মোহন ভাই, চিনতে পারছ না?

এত রাতে কোথা থেকে? সঙ্গে লোকজন আছে মনে হচ্ছে!

আছে বইকি। খোদ কুঠিবাড়ির বাবুজি আছেন।

তবে তো দেউড়ি খুলতে হয়।

না খুললে পাল্কি ঢুকবে কি ভাবে।

তিনি হুকুম করছেন না কেন?

পাল্কির মধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, পথে দাঙ্গা হয়েছিল।

মোহন দেখে নিয়েছিল তার দাদাবাবুর অচৈতন্য অবস্থা।

দেউড়ি খুলল, পাল্কি প্রবেশ করল। মোহন বলল, যাও, দেওয়ানজিকে খবর দাও।

দেওয়ানজি, দয়ারাম আর ভাদুড়ী একসঙ্গে এসে উপস্থিত হল, লণ্ঠনের আলোয় দেখল দীপ্তিনারায়ণ মূর্ছিত।

যাও ভাদুড়ী, বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বাবুজিকে বিছানায় শোয়াও, আমি রানীমাকে খবর দিতে গেলাম।

ইন্দ্রাণী তখন বৃন্দাবনীর সঙ্গে বসে চন্দনীর বিয়ে সম্বন্ধে জল্পনা করছিল।

দেওয়ান জেঠা হঠাৎ এত রাতে!

ধুলোউড়ি কুঠির বাবুজি এসেছেন।

ঐটুকু শুনতে পেল পাশের ঘর থেকে চন্দনী, তার মুখে আলো জ্বলে উঠল। তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেও এসেছেন, আলো জ্বলবার কথাই বটে। দেওয়ানজির বক্তব্যের শেষাংশ শুনতে পায়নি চন্দনী তবে ইন্দ্রাণীকে উদ্বিগ্ন করে তুলল, বলল, চলুন দেওয়ানজি দেখে আসি।

অনেক চত্বর, অনেক সিঁড়ি পার হয়ে যখন বৈঠকখানায় এসে পৌঁছেছে পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, তুই আবার এলি কেন চন্দনী।

আসব না। ঐ শব্দটির মধ্যে কত গৌরব, কত আনন্দ, কত অহঙ্কার। কিন্তু ভিতরে ঢুকে শুভ্র শয্যায় শায়িত শুভ্রতর দীপ্তিনারায়ণ। মাথা থেকে নেমেছে একটি রক্তের ক্ষীণধারা, জমে কালো হয়ে গিয়েছে।

মাগো কি হবে বলে মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল চন্দনী, পিছন থেকে ধরে ফেলল বৃন্দাবনী, ভয় নাই দিদি, ব্রজেশ্বর আছেন।

সে কথা তার কানে গেল কি না কে জানে, তার ব্রজেশ্বর ঐ মূর্ছিত।

ভাদুড়ী বলল, রানীমা, বদ্যি ডেকে আনি গিয়ে?

দয়ারাম বলল, ভাদুড়ীমশাই, এ হাতুড়ে বদ্যির কাজ নয়। রানীমা যদি একটা ঘোড়া দেওয়ার হুকুম করেন তবে আমি পাবনা থেকে সাহেব ডাক্তার ডেকে আনতে পারি। আমি নাড়ী দেখেছি, হঠাৎ কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই।

ভাদুড়ী বলল, সাহেব ডাক্তার কি এত দূরে আসবে?

রাজবাড়ির নাম শুনলে কবর থেকে উঠে আসবে। দেওয়ানজি একটা ঘোড়ার হুকুম করিয়ে দিন।

তা নিয়ে যাও একটা ঘোড়া দয়ারাম, কতক্ষণের মধ্যে ফিরতে পারবে মনে কর?

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বড়জোর দু'এক দণ্ড বেলা হতে পারে।

দয়ারাম নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে দীপ্তিনারায়ণের শুশ্রূষার যথোচিত ব্যবস্থা করে দিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, চন্দনী এবার চল্।

না মা, ও কথা বলো না, আজ আমি সারারাত এখানে থাকব। এই

বলে সে এগিয়ে গিয়ে দীপ্তিনারায়ণের শীতল হাত নিজের উষ্ণ করতলে চেপে স্থাণু হয়ে বসল। ইন্দ্রাণী দেখল চন্দনী তখন পাষাণী।

ইঙ্গিতে বৃন্দাবনীকে ঘরে থাকতে বলে ইন্দ্রাণী যখন বের হয়ে যাচ্ছে তখন তার বুকের মধ্যে পুরনো সুখদুঃখের ঢেউ। তখন সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারপ্রায় ঘরে বিগত-চৈতন্য রোগীর পাশে বিগত-লজ্জা কিশোরী।

একবার মাত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছিল সে, বলেছিল, মাসী ও কিসের শব্দ!

ঐ তো দয়ারাম চক্কোত্তির ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ—চলেছে পাবনা শহরে।

চন্দনী স্বগতভাবে বলে উঠল, নারায়ণ।

এক ঘটনার আঘাতে কিশোরী হয়েছে জননী।

১৮

আচ্ছা পালমশাই, রাজা বাহাদুর পাশের ঘরে শুয়ে কি ভাবছেন?

ভাববেন আবার কি। শীতে কাঁপছেন, দুখানা কম্বল গায়ে দিয়েও শীত গেল না তাঁর।

হাঁ, মাসের শেষে শীতটা জবর কামড় দিয়েছে। তা শীত কি কম্বল গায়ে দিলে যায়! পেটের মধ্যে কম্বল দেওয়া দরকার।

সরদার তোমার হেঁয়ালি কাটা অভ্যাসটা গেল না। পেটের মধ্যে কম্বল দেওয়া বলতে কি বোঝায়, খুলে বল।

এই দেখ খুলে বলছি—এই বলে বাজু সরদার একটি থলির মুখ খুলে ফেলে দুই বোতল দেশী মদ বের করল, তার পরে বলল, নাও পালমশাই, এবার গিয়ে রাজা বাহাদুরকে ভেট যুগিয়ে এসো। দেখতি পাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর কাঁপুনি বন্ধ হবে।

কিন্তু উল্টে আমাদের কাঁপুনি না আরম্ভ হয়।

কেন, কেন?

কেন আবার কি, বড়লোকের কি দুশ্চিন্তার অভাব থাকে।

সে দুশ্চিন্তাও শেষ হবে ঐ ধান্যেশ্বরীর কৃপায়। যাও দিয়ে এসো।

চলো না দুইজনেই একসঙ্গে যাই।

তুমি এগোও, আমি আসছি।

গঙ্গা পাল গৃহান্তরে প্রবেশ করল। বাজু সরদার ভালো করে কম্বলখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

গঙ্গা পাল ও বাজু সরদার আবার এসে জুটেছে ঈশান রায়ের কাছে।

পলোওয়ানার দল ভেঙে যাওয়ার পর তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল ঈশান রায়, তখন তারা গিয়ে ভিড়েছিল সোনাগাঁতি আর আড়াইকুড়ি পরগণার প্রজাদের কাছে। অনেক লোকের মতো এরা দুজনও ঘোরতর আশাবাদী ব্যক্তি, এদের কাছে স্বজন বিজন বলে কিছু নেই। যখন যেখানে সুবিধা এই তাদের নীতি। পরগণার প্রজাদের সঙ্গে মিশে দেখল যে সেখানে মধু বেশি নাই, যেটুকু আছে তার দাবীদার অসংখ্য। তখন তারা পরামর্শ করে আবার ঈশান রায়ের রাজবাড়িতে এসে দেখা দিল। তারা শূন্য হাতে আসেনি, রাজভোগ্য কিছু সন্দেশ সঙ্গে এনেছিল। তারা জানত পরগণা দুটোর উপরে ঈশান রায়ের অনেক দিনের লোভ। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ হয়েছে। কি উপায়ে বিনা খরচে পরগণা দখল করা যায় আলোচনা হয়েছে। তারা ফিরে এসে রাজাবাহাদুরকে জানাল, হুজুর পরগণা দুটো পেকে বোঁটার সঙ্গে নামমাত্র লেগে রয়েছে, একটু ঝাঁকুনি দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। এই নিরাকার সন্দেশ রসনায় আস্বাদ করতে করতে অনেক দিনের চাপা লোভে ঈশান রায়ের চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

বল কি হে! এত বড় কথাটা এতক্ষণ বলনি কেন?

হুজুর এসব গোপন কথা তো সকলের সামনে বলা যায় না—তাই।

হাঁ, হাঁ, আড়ালে বলতে হয়। তা কি রকম কি দেখলে ভেঙে বল।

ওরা বলে যায়। দুই পরগণার দুই প্রধান সমস্ত প্রজাদের নিয়ে আল্লার নামে শপথ করেছে, এই হাতে তারা রাজবাহাদুর ছাড়া আর কাউকে খাজনা দেবে না।

বাহা বাহা বলে চিৎকার করে উঠল ঈশান রায়। বলল, তোমাদের বেতন বৃদ্ধির কথাটা এবারে ভাবতে হয়।

ওরা মনে মনে বলল, আর বেতন বৃদ্ধিতে কাজ নাই, এখন তোমার জোতজমি রক্ষা পেলে হয়।

বল কি একেবারে আল্লার নামে কসম করেছে, তবে তো মিথ্যা হবে না, এ তো হিঁদুর প্রতিজ্ঞা নয়।

নয়ই তো হুজুর।

ও পরগণা তুটোয় তো হিঁদু প্রজা নেই বলেই শুনেছি।

হুজুর কি মিথ্যা শুনতে পারেন। তবে কি জানেন, যে কটা হিঁদু শয়তান আছে তারা ভয়ে জুজু হয়ে আছে।

তা এখন কি করা যায় বল তো'?

সেই কথা বলতেই তো এসেছি। পরগণায় শুনলাম ধুলোটুড়ির কুঠিতে যে বাবুটি আছেন তিনি জোড়াদীঘির দর্পনারায়ণ বাবুজির পৌত্র। পরগণার প্রধানরা তাকে হাত করবার চেষ্টায় আছে।

এটা তো বুঝলাম না দেওয়ানজি।

আসল কথা রক্তদহ প্রজাদের মনোভাব জেনে ফেলেছে—তাই রক্তদহের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলছে কুঠির বাবুকে হাত করবার।

এটাও তো ভালো বুঝলাম না।

গঙ্গা পাল মনে মনে বলল, ভালো বুঝলে আর তোমাকে নিয়ে খেলাতে আসতাম না।

তা এখন কি কর্তব্য বল সরদার।

বাজু সরদার বলে, এ তো সহজ কথা, আপনি কোনোরকমে কুঠির বাবুকে হাত করে ফেলুন।

আমি বলি কি হুজুর, পাল্কি পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাকে আটকে রাখুন, তখন আর পরগণায় খাজনার দাবীদার কেউ থাকবে না।

ঈশান রায় অতিশয় ধূর্ত, আর ধূর্ত বলেই মাঝে মাঝে নির্বোধের ভান করে। এখনও তাই করছিল। দেখছিল পরগণা সম্বন্ধে নূতন কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা এদের কাছ থেকে। নূতন কিছুই পেল না, বরঞ্চ দেখল সে নিজে অনেক বেশি জানে এদের চেয়ে।

উভয় পক্ষই নীরব। তখন গঙ্গা পাল সাহস সঞ্চয় করে বলল, হুজুর আমাদের তন্‌খা বৃদ্ধির কথা যেন বলেছিলেন।

বলেছিলাম নাকি। হাঁ হাঁ বলেছিলাম বটে, তা সেটাও ভাবতে হবে বইকি।

ওরা মনে মনে বলল, বড়লোকের সর্বত্র স্বভাব একরকম। তন্‌খা বৃদ্ধির কথা বললেই ভাবতে বসে।

এমন সময়ে দরজার কাছে পায়ের শব্দ হল।

ঈশান রায় বলে উঠল, কে?

কেউ ভিতরে প্রবেশ করল না, তবে আবার পায়েব শব্দ হল।

কে, ভিতরে এস।

এক ব্যক্তি ভিতরে এসে লাঠি মাথায় ঠেকিয়ে সেলাম করল।

কদম সিং, খবর কি ?

লোকটি বলল, হুজুর, একদম বেখবব।

কি হয়েছে বল।

কদম সিং কিছুক্ষণ চুপ কবে থাকল।

আব সকলে কোথায় ?

কদম সিং বলল, হুজুর পাল্কিব সঙ্গে চারজন বন্দুকধাবী বরকন্দাজ ছিল, আব আটজন বেহাবা।

পাল্কি পাঠিয়েছিল কাবা ?

পবগণা থেকে গিয়েছিল।

সে কথা তো জানি। কিন্তু পাল্কি গেল কোথায় ?

মালুম হচ্ছে—পরগণাতে চলে গিয়েছে।

তোমাদেব সঙ্গেও তো বন্দুকধাবী ববকন্দাজ ছিল।

হুজুব, ওদেব চারজন বন্দুকধারী, আমাদের সঙ্গে মাত্র দুজন।

তাবপরে ?

জবর মাবপিঠ হল।

তারপরে কি হল খুলে বল।

দুই তরফে বেজায় লাঠালাঠি হল, তারপর বন্দুক চলল।

কুঠির বাবুব কি হল ?

তার মাথায় জবর চোট লাগল।

বল কি ? আমার তো হুকুম ছিল, তার গায়ে চোট না লাগে।

আমরা তো চোট লাগাইনি, বাবুজি হঠাৎ পাল্কি থেকে বের হয়ে এলেন, তখন চোট লাগল।

তখন কি হল ?

বেহারার দল বাবুজিকে পাল্কিতে তুলে নিয়ে ভাগল।

কোন দিকে ভাগল ?

চারদিক বিলকুল অন্ধকার। কোন দিকে ভাগল মালুম হল না। মনে হল পরগণার দিকেই গিয়েছে।

ঈশান রায়ের পরিকল্পনা একদম মাটি হয়ে যাওয়ায় ভিতরে ভিতরে গজরাচ্ছিল।

তোমার সঙ্গের লোকেরা কোথায় গেল ?

তারা তো হুজুর আসতে পারবে না।

কেন, পালিয়েছে নাকি ?

পালাবে কেমন করে। তারা বন্দুকের গুলি লেগে একদম বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।

তার মানে তারা মরেছে !

সেই রকম তো মালুম হচ্ছে। তারা লাশ হয়ে পড়ে আছে।

বেশ হয়েছে।

ওদের তো আনতে হবে, নাহলে শিয়াল-কুকুরে একদম খেয়ে ফেলবে ?

ফেলুক খেয়ে। তোমার গায়ে বন্দুকের গুলি লাগেনি ?

আর কিছুক্ষণ থাকলেই লাগত। আমি হুজুরকে খবর দেওয়ার জন্যে ছিপকে চলে এলাম।

ছিন্ন জ্যা ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠে ঈশান রায় বলল, হারামজাদা ! তুমি পালাতে গেলে কেন ?

না পালালে হুজুর হামভি লাশ বনে যেতাম, হুজুরকে খবর দিত কে ?

হারামজাদা, বেইমান, ভাগো, আভি ভাগো।

কিধার জায়গা হুজুর, রাত তো বেজায় আঁধিয়ারা।

সে যেদিকে দুই চোখ যায়—সেখানে যাও, তোমার নোকরি খতম হয়ে গেল।

যায়গা হুজুর, লেকিন তন্‌খা তো বহুৎ বাকি হ্যায়।

তরে রে শালা ! আমার হাত থেকে পরগণা দুটো ছুটে গেল, আবার তন্‌খা মাংতা ! ভাগো, চলা যাও !

কদম সিং ভেবেছিল খবরটা দেওয়ার জন্যে ইনাম মিলবে—এখন দেখল প্রাণ যাওয়ার মতো। সে মানে মানে বের হয়ে গেল।

গঙ্গা পাল ও বাজু সরদার দেখল ঈশান রায়ের মতলবের কিছুই জানত না, বুঝল যে ঈশান রায়ের এক দাঁতের বুদ্ধিও তাদের নাই—বৃথাই তাকে পরামর্শ দিতে এসেছিল। এ হেন ব্যবস্থায় কি বলা যায় ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

কি করা যায় এখন দেওয়ানজি ?

গঙ্গা পাল বলল, হুজুরের লাঠিয়ালের অভাব কি, জন পঞ্চাশ পাঠিয়ে দিন, পাল্কিসুদ্ধ বাবুকে এখানে নিয়ে আসুক।

সে গুড়ে বালি, এতক্ষণ পাল্কি পরগণার কাছারিতে পৌঁছে গিয়েছে। তা ছাড়া বাবুজির মাথায় চোট লেগেছে—সে কি আর আমার বাড়িতে আসবে। মূর্খদের দিয়ে বুদ্ধির কাজ করাতে গেলে এমনিই হয়। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

বাজু সরদার বলল, হুজুর আমাদের হুকুম দিন, আমরা পলোওয়ালাদের মধ্যে যতজনকে পারি নিয়ে আসি, তার পরে দেখে নেব বদন মণ্ডল আর কলিমুদ্দি সরদারেরা কি করতে পারে।

বাজু সরদারের প্রস্তাবে ঈশান রায় আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পেল।

তোমরা তো বললে পলোওয়ালাদের দল ভেঙে গিয়েছে।

তা গিয়েছে বটে, কিন্তু হুজুরের নাম শুনলে আর লুটের ভাগ পাবে আশায় তারা এসে জুটবে।

আচ্ছা তোমরা কতদূর কি করতে পার দেখো গিয়ে—আমি এদিক দেখি কত লাঠিয়াল যোগাড় করতে পারি।

ওরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালে বলল, হাঁ, তোমাদের তনখার কথাটা যত শীঘ্র পারি ভেবে দেখব—আগে এ হাঙ্গামাটা মিটে যাক।

ওরা বেরিয়ে গেলে শূন্য ঘরে ঈশান রায় গালে হাত দিয়ে বসে রইল।

ওদিকে পরগণার বড় কাছারিতে বদন মণ্ডল, কলিমুদ্দি সরদার, অছিমুদ্দি, ইমারত ও ছোট বড় অনেকে পাল্কির জন্য অপেক্ষা করছে। পাল্কি আর আসে না। এই আসে এই আসে করতে করতে থানার পেটা ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল—তবু পাল্কি এসে পৌঁছলো না। তখন তাদের ধারণা হল, নিশ্চয় ঈশান রায়ের লাঠিয়ালেরা মাঝখানে পাল্কি লুট করে নিয়ে গিয়েছে। এই রকম একটা আশঙ্কার আভাস তারা পেয়েছিল। তখন তারা সিদ্ধান্ত করল, কালকে দুই পরগণার লোক জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে পড়বে ঈশান রায়ের বাড়িতে, খালাস করে নিয়ে আসবে বাবুজিকে। কোনো পক্ষের মনে তিলমাত্র সন্দেহ হল না যে পাল্কি রক্তদহের রাজবাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে।

প্রজাপক্ষ ও (ঈশান) রাজপক্ষ, দুই পক্ষই লাঠিয়াল, বন্দুক ও সড়কি সংগ্রহে মন দিল। ওদিকে গঙ্গা পাল আর বাজু সরদার পলোওয়ালাদের গাঁয়ে গিয়ে লুটের লোভ দেখিয়ে জনাত্রিশেক লোক যোগাড় করে ফেলল, বলল, এবারে

লুটের আধাআধি ভাগ হবে। সেবারের মতো আর পালাতে হবে না। পলো-ওয়ানারা বলল, আমরা তো পালাইনি, সব মাটি করে দিল রাজাবাবুর পাট-হাতীটা। এবারে সেটা নেই তো!

না, না, সে ভয় নাই, আমরা এগিয়ে গেলাম, তোমরা আর গড়িমসি করে বিলম্ব করো না। আমরা চলল্লাম। এই বলে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল।

তাদের উপস্থিত হতে দেখে ঈশান রায় খুশী হয়ে বলল, এই যে তোমরা এসেছ, তা খবর কি?

হুজুরের নাম শুনে গাঁ সুদ্ধ লোক নেচে খাড়া হয়েছে, এসে পৌছলো বলে।

উত্তম, এদিকে আমিও লাঠিতে বন্দুকে, সড়কিতে জনা পঞ্চাশেক যোগাড় করেছি। তা ওরা কখন এসে পৌছবে মনে হয়? সবসুদ্ধ কতজন হল, পঞ্চাশ আর ত্রিশ হল গিয়ে একুনে আশী।

সেই সঙ্গে হুজুরের নাম, হল গিয়ে হাজার আশী।

বেশ বলেছ, কিন্তু ওখানেই থামলে কেন, ঐ সঙ্গে ধরো আমার পাট-হাতীটাকে।

ঐ পাটহাতীর নাম শুনে গঙ্গা পাল ও বাজু সরদার পূর্বতন অভিজ্ঞতার সূত্রে যারপরনাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। বলল, হুজুর আবার হাতী কেন? এ যেন মশা মারতে কামান দাগা!

সে একটা কথা বটে, তবে কি জানো, রাজা যাবে আর তার হাতী যাবে না? পাটহাতীর পিঠে চেপে যুদ্ধযাত্রা করাই রাজাদের চিরকালের রীতি।

তা বটে, মহাভারতে এমন শুনেছি বটে।

তবে আর আপত্তি করো না। তাছাড়া কি জানো, রাজা যাবে, সঙ্গে যাবে দেওয়ানজি আর সেনাপতি।

ওরা বলল, আমাদের তো ঘোড়া আছে, হাতীতে চড়বার যুগ্যি লোক কি আমরা? বিশেষ কিনা রাজাবাহাদুরের সঙ্গে?

এমন সময়ে ওরা দেখতে পেল, মাহুতের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে গজেন্দ্রগমনে পাটহাতী আগমন করছে। হাতীটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঈশান রায় বলল, দেখেছ আজ কি রকম সাজ হয়েছে!

ওরা দুইজনে বিস্ময়ের ভান করে বলল, এমনটি কোথাও দেখিনি।

বাজু সরদার বলল, রাজশাহী পাবনা জেলায় তো রাজা-মহারাজার অভাব

নাই, আর তাদের হাতীও বিস্তর। কিন্তু দেওয়ানজি, এমনটি আর চোখে পড়েছে?

এ আর জিজ্ঞাসা করতে হয়?

ঈশান রায় বলল, আর হাতীর চালটা কেমন দেখছ?

চমৎকার হুজুর, একে বলে ডুলকি চাল।

বাংলায় তাই বলে বুঝি, সংস্কৃত ভাষায় এই নাম গজেন্দ্রগমন। নাও হাতীকে বসাও।

মাহুতের অনুরোধে হাতী বসল। ঈশান রায় উঠে পড়ে বলল, নাও এবার তোমরা উঠে পড়ো। না, না, আর দেরি করো না, শাস্ত্রে বলে শুভস্য শীঘ্রম্। আর অমনি যেতে যেতে তোমাদের তন্‌খা বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

অগত্যা তাদের উঠতেই হল, তন্‌খার চেয়ে প্রাণের মূল্য তো বেশি নয়।

হাতী চলতে আরম্ভ করলে গঙ্গা পাল জনান্তিকে মাহুতকে শুধালো, কি ভাই, হাতীটাকে পেটভরে জল খাইয়ে এনেছ তো?

মাহুত সেদিনের অভিজ্ঞতা ভোলেনি, বলল, তেষ্টা কি একদিনের জল খাওয়ায় মেটে?

বাজু সরদার, তুমি তো আমার সেনাপতি?

হাঁ, নামেই তো লোকে আমাকে জানে।

জানবেই তো। তা সেনাপতি সাহেব, দেখে নিয়ো এই এক হাতীতেই লড়াই ফতে হয়ে যাবে, ওদের ঘোড়সওয়ার আর বন্দুকে কি করবে!

আর হাতী বলে হাতী, একেবারে পাটহাতী। তার উপরে সোয়ার স্বয়ং রাজাবাহাদুর।

ওখানেই থামলে কেন দেওয়ানজি—রাজার দুই পাশে দেওয়ান আর সেনাপতি। বলে উচ্চস্বরে হেসে উঠল ঈশান রায়। আর সেনাপতি-ও দেওয়ান মনে মনে যখন বিচার করছে সময়োচিত এই হাসির সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত কিনা, এমন সময়ে একসঙ্গে তিন-চারটে বন্দুক আওয়াজ করল। হাতী পরগণার এলাকার মধ্যে এসে পড়েছে।

এই হাতীর সঙ্গে এ অঞ্চলের যাবতীয় লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। একবার স্থানীয় এক সার্কাসের দল সঙ দেখাবার জন্যে ওটাকে ভাড়া নিতে চেয়েছিল।

কই আমাদের লোকলস্কর কোথায় ?

না, কোথাও নাই।

হুজুর হাতীর চালের সঙ্গে কি পায়ে হেঁটে পাল্লা দেওয়া যায় ?

ইতিমধ্যে হাতীটা বন্দুকের আওয়াজে থমকে দাঁড়িয়েছে।

কি মাহুত, হাতী থামলো কেন ?

এমন সময়ে আর এক ঝাঁক গুলিব আওয়াজ হল। মাহুতের হয়ে উত্তর দিল হাতী নিজেই। হঠাৎ উৎকট আওয়াজ কবে শুঁড় উর্ধ্বে তুলে। লেজ দিগন্তপ্রসারী করে ছুটলো।

রাজাবাহাদুর ভাঙেন তবু মচকান না, দেখেছ কি রকম ছুটছে, ঘোড়া হার মেনে যায়। কি বলো হে সেনাপতি ?

সেনাপতি আর কি বলবে, তখন তাবা দুইজনে হাতীব পিঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেবল ঈশান বায় রাজমর্যাদা ও রাজকীয় মস্তক রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে হাওদা আঁকড়ে ধরে বলছে, এমন ছুটতে পারে কয়টা ঘোড়া !

হাতীটা কি ভীষণ ডাকছে !

দেওয়ানজি ভুল কবলে, তোমরা সংস্কৃত জানো না তাই হাতীব ডাক বলো, আমরা যারা সংস্কৃত জানি ওকে বলি বৃংহিত।

বাজু সরদার বলল, হাতীটা ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে।

ভয় পায়নি, ভয় পাওয়াবার জন্তেই বৃংহিত করছে।

এইভাবে হাতীর পক্ষে ওকালতি করতে করতে ঈশান রায় ও তদীয় দেওয়ান এবং সেনাপতি চলল। মাঝে মাঝে গাছেব ডালের আঘাতে চড়নদারগণ ব্যতিব্যস্ত।

হুজুর শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, সামনের গাছটার ডাল মাথায় লাগবে।

মাহুত বলে উঠল, হুজুর, হাতীটা দামাল হয়ে গিয়েছে।

তবে তুমি কি করতে আছ, এই বলে হাতের ছড়ি দিয়ে মাহুতকে পেটাতে লাগল, ওদিকে মাহুত আঙুল দিয়ে খোঁচাতে লাগল হাতীটাকে।

হুজুর হুজুর, সাবধান, গাছের ডাল—

প্রাণের দায়ে গঙ্গা পাল ও বাজু সরদার গাছের ডালটা জড়িয়ে ধরল। নীচে দিয়ে ঈশান রায় সমেত পাটহাতী গলে চলে গেল।

এদিকে পরগণার প্রজার দল ছুটে নাগাল পেল না হাতীটার, আর হাতীর দশা দেখে পলোওয়ানার দল পালালো, সঙ্গে সঙ্গে পালালো ঈশান রায়ের

লাঠিয়ালগণ। এই দৃশ্যে অভিনীত হল এ দেশের চিরাচরিত একটি রীতি, রাজা পালালেই যুদ্ধ খতম হয়ে যায়।

প্রজারা ফিরে যাচ্ছে এমন সময়ে তাদের চোখে পড়ল মাঠের মধ্যে দিয়ে দুজন ঘোড়সওয়ার চলেছে, একজন সাহেব একজন বাঙালী। বাঙালীটিকে দেখেই চিনতে পারল, অছিমুদ্দি বলল, কি দয়ারামদা, কোথায় চলেছ এত সকালে?

দয়ারাম ঘোড়া থামিয়ে বলল, রাজবাড়িতে।

সঙ্গে ঐ সাহেবটি কে?

কুলী সাহেব, পাবনার সাহেব ডাক্তার।

সাহেবের নাম কৌলি, লোকের মুখে মুখে দাঁড়িয়েছিল কুলী সাহেব বা [illegible]লী ডাক্তার।

কেন, আবার সাহেব ডাক্তার কেন?

মাথায় চোট খাওয়া এক রুগী এসে পড়েছে তাই রানীমা বললেন, দয়ারাম, যাও, পাবনা থেকে সাহেব ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো।

দয়ারামদা, তা হঠাৎ এমন কে জখমী রুগী এলো যার জন্যে তোমাকে পাবনা শহরে যেতে হয়েছিল?

সে অনেক কথা, তবে সংক্ষেপে বলি। ধুলোউড়ি কুঠির নাম নিশ্চয় শুনেছ। সেই কুঠির মালিক আসছিলেন পাল্কিতে করে—

এই পর্যন্ত শুনে প্রজারা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, বললে, বলে যাও ভাই।

বলবার আর কি আছে। মাঝপথে দাঙ্গা বেধে ওঠে, তাতেই লাঠির চোট লাগে বাবুজির মাথায়। পাল্কির বেহারারা বুদ্ধি করে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল রাজবাড়িতে।

দয়ারামের কথা শুনে প্রজার দল সমস্বরে বলে উঠল, আল্লা হাকিম।

হঠাৎ তোমাদের এখন আনন্দ হল কেন?

হবে না! সে পাল্কি আমরাই পাঠিয়েছিলাম পরগণা থেকে।

সঙ্গে বরকন্দাজ ছিল না?

ছিল বইকি।

তবে আবার দাঙ্গা বাধাল কারা?

ঐ ঈশান রায়ের লোক ছাড়া আর কারা হবে!

তার লোক দাঙ্গা বাধাতে যাবে কেন?

সে অনেক কথা। বাবুজি ঐ শয়তানের হাতে না পড়ে যে রাজবাড়িতে গিয়েছেন, সেই জন্যেই আল্লা হাকিম বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

আচ্ছা ভাই তোমাদের কথা পরে শুনব, এখন আমার তাড়া আছে চললাম।

তুমি যাও দাদা, আমরাও রাজবাড়িতে যাব।

যাবে ভালোই তবে লাঠিসোটা নিয়ে গিয়ে সোরগোল তুলো না, বাড়িতে কঠিন রুগী আছে।

সে ভয় নাই, তুমি এগোও।

সত্যি এগোবার প্রয়োজন ছিল দয়ারামের, সাহেব ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

ওরা দুজন এগিয়ে গেলে অছিমুদ্দি, ইমারত, সাগরেদ প্রভৃতি বুঝল যে বাবুজিকে আনতে পাল্কি পাঠানো হয়েছিল এ খবর ঈশান রায় পেয়েছিল আর বাবুজিকে হাত করবার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল লোকলস্কর, তখন দুই দলে দাঙ্গা বেধে ওঠে, চোট লাগে বাজুজির মাথায়, তবে রক্ষা এই যে বাবুজি রাজবাড়িতে গিয়ে উঠেছেন, ঈশান রায়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলে আমরা সাত হাত পানিতে পড়তাম।

অছিমুদ্দি বলল, আজ রাজবাড়িতে গিয়ে কাজ নাই, আল্লার দোয়ায় বাবুজি ভালো হয়ে উঠুন তখন গিয়ে দেখা করলেই হবে।

তখন তারা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে চলল।

দেওয়ানজি এসে ইন্দ্রাণীকে জানাল, ডাক্তার সাহেব বলছেন রুগী দেখতে যাবেন।

দাঁড়ান আমি একবার রুগীকে দেখে আসি।

ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকে দেখতে পেল রাতের বেলায় চন্দনীকে যেমন দেখেছিল এখনো ঠিক সেইভাবে রুগীর পাশে বসে আছে, রুগীর হাত তার হাতের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রুগীর মুখের দিকে, অনিদ্র ও অভুক্ত, রুগীর জ্ঞান নাই, চন্দনীরও চন্দনীর মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে শুনতে পেত—ধ্বনিত হচ্ছে "চির চন্দন উরে হার ন দেলা, সো অব নদী গিরি আঁচর ভেলা।" আরও দেখল বৃন্দাবনী তেমনি বসে আছে যেমন আদেশ করেছিল ইন্দ্রাণী। তাকে ইঙ্গিতে শুধালো, ব্যাপার কি, সে ইঙ্গিতে উত্তর দিল, যেমনটি দেখছ। তখন তারা দুজনে মিলে চন্দনীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল, মা

চলো, ডাক্তারসাহেব এসেছেন। পাশের ঘরে পৌঁছে এতক্ষণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল, বৃন্দাবনীর কোলে মূর্ছিত হয়ে পড়ল চন্দনী। এই করুণ দৃশ্য কেন জানি না ইন্দ্রাণীর মনে দুঃখের মধ্যেও আনন্দ-কণিকা দেখা দিল, কালো ঢেউয়ের মাথায় আলোর কণা। অপর দরজা দিয়ে ভারি জুতোর মসমস শব্দ তুলে রুগীর ঘরে প্রবেশ করলো ডাক্তার।

১৯

রক্তদহ গ্রামে কুলীসাহেবের জয়জয়কার। যারা সাহেব ডাক্তার আনবার বিরুদ্ধে ছিল তাদেরই প্রশংসা কিছু মুখর। আরে বাপু এ কি উমেশ কবরেজের বড়ির কাজ না ঈশান ডাক্তারের মিকচারের কাজ। ওরা দুটোই গোবদ্যি। ওদের হাতে পড়লে রুগীর এতক্ষণে হয়ে যেত। অপর পক্ষ বলে—আমরা তো গোড়া থেকেই পাবনায় লোক পাঠাতে বলছি। তোমরাই আপত্তি করছিলে। এ যার নাম কুলীডাক্তার, কেটে জোড়া দিতে পারে। একদল বলে—রুগীর মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল, অন্য দলের মতে ঠিক চৌচির নয়—মাঝামাঝি ফেটে দুইখানা হয়েছিল। কোনো পক্ষই স্বচক্ষে রোগীকে দেখেনি কাজেই তর্কের অবকাশ অনন্ত। এমন সময় দেওয়ানজি ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে বাইরে এলো। এইসব লোক স্বচক্ষে আগে আস্ত একটা সাহেব দেখেনি। এখন তর্কটা মুলতুবি রেখে সাহেবকে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু বেশি সময় পাওয়া গেল না, সাহেবকে নিয়ে দেওয়ানজি বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল।

হাঁ, মরতে হয় তো এই রকম ডাক্তারের হাতে মরেও সুখ।

অন্য একজন বলল, উমেশ কবরেজের বড়িতে বাঁচবার চেয়ে এর হাতে মরাও ভালো।

এমন সময়ে দয়ারাম অপর মহল থেকে বাইরে এসে এদের দেখে বলল, আরে তোমরা এখানে কেন? তা সাহেব দেখতে এসেছ দেখো, কিন্তু গোলমাল করো না, গোলমাল সহ্য করতে পারে না ডাক্তার সাহেব, গোঁসা করবেন।

এমন সময় সাহেবকে বৈঠকখানায় বসিয়ে দেওয়ানজি গিয়ে উপস্থিত হল রানীমায়ের কাছে। বলল, বউমা, সাহেব বিদায় চাইছে, বলছে রুগী সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে, আর ভয়ের কারণ নেই, এখন শুধু পাঁচ-ছ দিন শুয়ে বিশ্রাম করতে হবে।

ইন্দ্রাণী বলল, দেওয়ানজি, আর-দু-চারদিন কি থাকতে পারেন না, তাহলে যে নিশ্চিন্ত হই।

সে কথা আমি বলেছিলাম, তিনি বললেন ভয়ের কারণ থাকতে রুগীকে ছেড়ে যাওয়া অভ্যাস নয়। দু-তিনদিন কেন দরকার হলে এক মাস থাকতাম কিন্তু আদৌ দরকার নাই। মাথায় লাঠির চোট লাগলেই আমরা ভাবি মাথা ফাটলো, কিন্তু এক্ষেত্রে মাথার চামড়াটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হয়েছিল, তাইতে তিন দিনের মধ্যে সেরে উঠল। এখন চাই বিশ্রাম।

তবে সাহেব যখন অভয় দিচ্ছেন তাঁকে আর আটকে রাখা যায় না।

হাঁ বউমা, আমিও তাই মনে করছি। কিন্তু কথা হচ্ছে সাহেবকে ফিস কত দেওয়া হবে?

এক হাজার টাকা দিলে কি কম হবে?

একেবারে এক হাজার টাকা দেবেন!

আমার ইচ্ছা আরও বেশি দিই। ভেবে দেখুন সাহেব এসে না পড়লে কি বিপদটাই না হত!

বেশ তাই হবে, সেই ব্যবস্থাই করছি—বলে দেওয়ান যেতে উদ্যত হলে ইন্দ্রাণী বলল, আমি একখানা দামী কাশ্মীরী শাল পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখানা সাহেব যেন অনুগ্রহ করে নেন আমার এই অনুরোধ জানাবেন।

বউমা, সাহেবদের টাকাকড়ি শালদোশালা নিতে বেশি অনুরোধ করতে হয় না, ওরা এই জন্যেই এদেশে এসেছে।

না, এখনো সব শেষ হয়নি। শ্রীহর্ষের সন্তানের কথাটা ভুলবেন না। তিনি রাতের বেলায় ঘোড়া ছুটিয়ে পাবনা শহরে না গেলে সময়মতো ডাক্তার পাওয়া যেত না।

সে কথা আমার মনে আছে তবে মুশকিল এই যে শ্রীহর্ষের সন্তান টাকা ইনাম নেয় না।

সে কথা তো আগেই বলে রেখেছে যে ঘোড়া ছুটিয়ে পাবনা গিয়েছিল সেই ঘোড়াটা ইনাম দিলে নেবে।

বেশ তাই হবে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে, সাহেব বলছিল অনেক কয়দিন হয়ে গেলে একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাবনা পৌঁছতে পারেন। কি করব?

ভালো দেখে একটা ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে দিন।

সাহেবকে বিদায় করে দিয়ে দেওয়ানজি কাছারিতে এসে বসেছে এমন সময় দুইজন ঘোড়সওয়ার এসে নেমে সেলাম করে দাঁড়াল।

অকৃত্রিম উল্লাসে দেওয়ানজি বল, আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, একসঙ্গে দুই পরগণার দুই প্রধান এসে উপস্থিত। নাও, বসো ঐ বেঞ্চিখানায়।

তারা বসলে জিজ্ঞাসা করল, তার পরে বল শরীর কেমন আছে?

হুজুরের দয়ায় ভালোই আছে।

এ কি কথা বললে মণ্ডল, হুজুরের দয়ায় যদি শরীর ভালো থাকে তবে হুজুরের শরীরের এই হাল কেন?

বদন মণ্ডল কথাটা বলে ঠকে গিয়েছে। কলিমুদ্দি সরকার আর তেমন ভুল করল না, বলল, বয়সের অনুপাতে হুজুরের শরীর এমন মন্দ কি!

তবেই দেখো ভালো কথাটা তো মুখ দিয়ে বের হল না, বের হল 'মন্দ কি'। যাক আমাদের সকলেরই বয়স হয়েছে, মন্দ কি শব্দটাকেই ভালো বলে ধরতে হবে। এখন ওসব কথা থাক। তারপরে পরগণার খবর বলো!

খবরের মধ্যে খবর ঈশান রায়ের উপদ্রব।

তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তার পাটহাতীটা এখনো দেহরক্ষা করেনি।

করলে বড়ই বিপদ হত।

কেমন?

ওটা আছে বলেই সামলে চলতে হয় ঈশান রায়কে। এই ধরুন না কেন, ক'দিন আগে বাবুজির পাল্কির উপরে চড়াও হতে গিয়েছিল, একখানা বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেই পাটহাতী রাজাকে নিয়ে রাজধানীর দিকে ছুটে পালাল, আর তার দেওয়ান আর সেনাপতি একটা বটগাছের ডাল ধরে ঝুলে কোনো-রকমে প্রাণ বাঁচালো।

কলিমুদ্দিন সরকার আরও কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিল বাধা দিয়ে দেওয়ানজি বলল, সরকার তোমার বক্তব্যের আগে পিছে বুঝলাম, বুঝলাম যে ঈশান রায় ও তার পাটহাতী এক ছাঁচে গড়া। কিন্তু মাঝখানটায় কিছু গোল বাধল। বাবুজিই বা কে, আর হঠাৎ তিনি পাল্কি করেই বা আসতে গেলেন কেন আর তার উপরেই বা পাটহাতী নিয়ে ঈশান রায় চড়াও হতে গেল কেন?

তবে সব কথা খুলে বলি। তুমি থামো সরকার। এই বলে বদন মণ্ডল আরম্ভ করল, বাবুজিকে আপনাদের চিনবার কথা নয়, ধুলোউড়ির কুঠি বলে যে বড় বাড়িটা বিলের কাঁধিতে আছে সেখানা বাবুজির নিবাস।

মণ্ডল, তাঁর সঙ্গে আমার অবশ্য পরিচয় নাই, তবে রানীমার পরিচয় আছে। মাসকয়েক আগে আশ্বিনের ঝড়ে রানীমার বজরা বানচাল হতে বসেছিল তখন বাবুজির লোকরা গিয়ে তাঁদের রক্ষা করে, আর বজরা মেরামত না হওয়া অবধি সেই কুঠিবাড়িতে রানীমায়েরা সকলে বাস করেছিলেন।

তবে আর চেনেন না বলছেন কেন?

মণ্ডলের পো, এখনো দুটো কথা না বোঝা রয়ে গেল। তোমরা হঠাৎ তাঁকে আনবার জন্যে পাল্কি পাঠাতে গেলে কেন আর ঈশান রায়ই বা পাল্কির উপরে চড়াও হতে গেল কেন।

দেওয়ানজি ও দুটো একসঙ্গে জড়ানো। এই যে পরগণা দুটো আছে না, সোনাগাঁতি আর আডাইকুডি—এ দুটোর উপবে ঈশান রায়ের অনেক দিনের লোভ।

বেশ, কিন্তু তার সঙ্গে বাবুজিব সম্পর্ক কি?

এই তো বললেন রানীমা কুঠিবাডিতে অনেকদিন ছিলেন আব বাবুজিব পরিচয় জানেন না।

না জানালে জানবেন কি করে।

আপনাদের পরিচয় তো তিনি নিশ্চয় জানেন, তা নইলে মাথায় চোট খেয়ে পাল্কি সদর কাছারিতে না নিয়ে গিয়ে রক্তদহের রাজবাড়িতে নিয়ে যেতে বলবেন কেন?

হাঁ, রানীমা নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, তবে গায়ে পড়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাননি।

তবে আরও ভেঙে বলি, ঈশান রায়ের ধারণা হয়েছিল বাবুজিকে একবার তাঁর বাড়িতে তুলতে পারলে পরগণার প্রজাসাধারণ তাঁর বশ হবে।

মণ্ডলের পো ভেঙে তো বললে, কিন্তু শাঁস তো বের হল না। বাবুজি ঈশান রায়ের হাতে গিয়ে পড়লে প্রজাসাধারণ তাঁর বশ হবে কেন?

পরগণা দুখানা এখন রানীমার হলেও প্রজাদের মন পুরনো জমিদারের দিকে ঝুঁকে আছে।

পরগণা দুটো তো আমরা নীলামে কিনে নিয়েছি।

দেওয়ানজি নীলামের ডাক কি লোকের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়!

তা পৌঁছয় না বটে কিন্তু পরগণা তো ছিল জোড়াদীঘির বাবুদের, তার সঙ্গে কুঠিবাড়ির বাবুজির কি সম্বন্ধ?

বদন মণ্ডল ও কলিমুদ্দি সরকার দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, তবে তো আসল কথাটাই জানেন না দেখছি। জোড়াদীঘির দু'আনির মালিক দর্পনারায়ণ বাবুজির বংশধর হচ্ছেন কুঠিবাড়ির বাবুজি, তাঁর নাম দীপ্তিনারায়ণ।

বলো কি! ঐ তিনটি শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ বের হল না দেওয়ানজির মুখ দিয়ে। তিনি একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন আর মনে মনে হিসাব করে দেখতে পেলেন এতদিনের সমস্ত সম্বন্ধ এক আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অল্প-স্বল্প নাশকে মানুষে বিশ্বাস করে কিন্তু সর্বনাশকে বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই রাজি হয় না। আর কেউ না জানুক দেওয়ানজি আর রানীমা জানতেন দর্প-নারায়ণের প্রতিহিংসার বিবরণ। সে প্রতিশোধ-স্পৃহা এমন ব্যাপক যে তার বন্ধনে নিশ্চয় সন্তানকে অবধি জড়িয়ে রেখে গিয়েছে। এই পারিবারিক বিবাদে রক্তদহ বিজয়ী, কাজেই তাদের মনে অসূয়া ছিল না কিন্তু বিজিত পক্ষ তো মনে মনে লাঠি ভাজতে থাকে আর সে লাঠি রক্তের স্রোত বেয়ে বংশপরম্পরায় চলে আসে। তখনি তার মনে হল রানীমাকে গিয়ে খবরটা দিতে হয়। কিন্তু সর্বনাশের মাত্রা যেখানে ষোল আনা সেখানে মনটা বিশ্বাস করতে চায় না। তার মনে হল কুঠিবাড়িতে যখন সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন তখন তো বাবুজি রানীমার পরিচয় জানতেন না—পরিচয় প্রকাশের কথা জানিয়েছিলেন দেওয়ানজিকে। তবু মনটা পুরোপুরি সায় দেয় না। যখন পরিচয় জানতেন না তখন এক রকম, কিন্তু রক্তদহ যে শত্রুপক্ষ একথা জেনেশুনে আহত অবস্থায় পরগণার সদর কাছারিতে না গিয়ে রক্তদহের রাজবাড়িতে পাল্কি ঘুরিয়ে নিতে বললেন কেন? এর কোনো ব্যাখ্যা না পেয়ে কথাটা পাড়লেন দুই প্রধানের কাছে।

তারা বলল, দেওয়ানজি আমরাও তো এ রহস্যের কিনারা করতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছি। কেউ বলে মাথায় চোট খেয়ে বুদ্ধিবিভ্রম হয়েছিল, কেউ বলে রাজবাড়িকেই কাছারিবাড়ি মনে করেছিল।

বদন মণ্ডল বলল, মোহন নামে বাবুজির যে খাস খানখাসা সঙ্গে আছে তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম, মোহন ভাই, এ কেমন হল? সে বলল কেমন করে বলব বড়লোকের বড় কথা, হয়তো আরও কিছু থাকবে।

আমরা বলে উঠি, আবার কি থাকবে?

শোনো তোমাদের আর আটকাব না, আমি অন্দরমহলে চললাম, এখনি গিয়ে রানীমাকে খবরটা দিতে হয়।

দেওয়ানজি উঠতে যাচ্ছে এমন সময় দুই পরগণার প্রধান একসঙ্গে বলে উঠল, এদিকে আবার গাঁয়ের প্রজার দল খোদার নামে কসম করেছে জোড়াদীঘির বাবুকে ছাড়া আর কাউকে খাজনা দেবে না।

দেওয়ানজি এই নূতন তথ্যের আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল, বলল, আবার দেখছি একটা লাঠালাঠি মামলামোকদ্দমা আরম্ভ হবে। এর কি আর শেষ নাই? এই রকম আরও কত কি—স্বগতোক্তি করতে কবতে দ্রুতপায়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল।

সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রাণীকে গিয়ে দেখতে পেল তার খাস কামরায়, আর সে একলাই ছিল। হঠাৎ বিনা এত্তেলায় দেওয়ানজিকে আসতে দেখে সে বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু যখন তার মুখের দিকে তাকালো বিস্ময় পরিণত হল ভীতিতে, বুঝল নিশ্চয় কিছু অভাবিত ঘটেছে নতুবা বহু সঙ্কটে অভ্যস্ত দেওয়ানজির এমন বিহ্বল অবস্থা হতে পারে না।

ইন্দ্রাণী বলল, বসুন দেওয়ান জেঠা।

দেওয়ানজি মূঢ়ের মতো বসে পড়ল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, মুখে তাব রা সরলো না।

হঠাৎ কি এমন হল, এমন বিভ্রান্ত ভাব আগে তো আপনার দেখেছি মনে হয় না।

কি আর বলব, কেমন করেই বা প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না—বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, সমস্তই অদৃষ্টের খেলা।

এতক্ষণে ইন্দ্রাণীর মনেও ভীতির সঞ্চার হয়েছে—তাব মুখ দিয়ে শুধু বের হল, তবু—

আজ সকালে বদন মণ্ডল আর কলিমুদ্দিন সরকার এসেছিল!

ওরা তো সোনাগাঁতি আর আড়াইকুড়ি পরগণার প্রধান, না?

মনে আছে দেখছি!

মনে থাকবে না? ওরা অনেক ভুগিয়েছে। আবার মামলা-ফৈজত বাধাবার মতলবে আছে নাকি?

তার চেয়েও বেশি।

সবই জানেন দেখছি, খুলে বলুন।

ঐ পরগণা দুটোর উপরে ঈশান রায়ের অনেক দিন থেকে নজর আছে।

নজর থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আইনত ও তো আমাদের।

আমাদেব ভুল নাই, তবে লাঠির জোরে দখল করতে—

দেওয়ানজিব বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ইন্দ্রাণী বলল, লাঠির জোর কি আমাদেব নাই ?

অবশ্যই আছে আর সেটা আছে বলেই এবারে অন্য পন্থা অবলম্বন করেছে।

আব কি পন্থা হতে পাবে ভেবে পাই না।

বউমা, আপনাব তো না জানা থাকবার কথা নয়, কত লাঠালাঠি, কত মামলা মোকদ্দমা কবে ঐ সোনাব টুকরো পবগণা দুখানা আমবা জলের দরে কিনে নিযেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি অত বড অন্যায হোক এ আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তখন যিনি জমিদাবির মালিক ছিলেন তাঁর ইচ্ছাতেই সব কাজ হত।

আমিও দু'একবাব মৃদুস্বরে আপত্তি কবেছিলাম কিন্তু পরন্তপ বাবুজি তাডিযে দেবাব হুমকি দিলেন, বুড়ো বয়সে আর কোথায যাব তাই অন্যায়টা সহ্য কবলাম।

কিন্তু এখন কি হযেছে ?

ঐ দুই পবগণাব প্রজাবা এ অন্যায সহ্য কবেছিল তবে স্বীকার করেনি, তাবা স্থিব কবে বেখেছিল পরন্তপ বাবুজি গত হলেই 'বিক্র' কববে। তারপরে যখন ঈশান রায়ের মতলব জ্ঞাত হল তখন সবাই মিলে খোদার নামে কসম করল যে এই হাতে জোডাদীঘিব বাবু ছাডা আব কাউকে খাজনা দেবে না।

প্রসঙ্গত দীপ্তিনাবায়ণেব নাম উঠে পডায় ইন্দ্রাণীর মুখ ম্লান হল, ভাবল, হায় আজ যদি তিনি থাকতেন তবে তাঁর হাতেপায়ে ধরে সব পুরনো ঝামেলা মিটিয়ে নিয়ে পরগণা দুটো ফিরিয়ে দিত। তখনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলল, তিনি তো অনেক কাল গত হয়েছেন।

তিনি গত হয়েছেন সত্যি কিন্তু বংশধর আছে।

অনেক কথা ইন্দ্রাণীর মনে হল, দর্পনারায়ণের পুত্র মানে হলে হতে পারত তার নিজের পুত্র। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপল। মানুষের জীবন এমন অসংখ্য চাপা নিঃশ্বাসের মালা।

রহস্যের শেষ কণাটুকু উদ্ধার করে নিতে চায় ইন্দ্রাণী, বলল, এই তো প্রথম শুনলাম জোডাদীঘির উত্তরাধিকারী আছে। দেওয়ান জেঠা, প্রজাদের কিছুই অসাধ্য নয়—যে কোনো একটা লোককে উত্তরাধিকারী সাজিয়ে মামলা লড়তে চায়।

তাতে তাদের লাভ কি বউমা ?

দোতরফা লাভ, একসঙ্গে ঈশান রায় ও রক্তদহকে ফাঁকি দেবে।

বউমা, প্রজাদের যত অবুঝ মনে করেন তারা তা নয়। তারা আদ্যন্ত খোঁজখবর নিয়েছে, জোড়াদীঘি গাঁয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, অবশেষে আবিষ্কার করেছে তার উত্তরাধিকারী দীপ্তিনারায়ণ বাবুজিকে।

কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে ইন্দ্রাণী বলল, এতকাল ছিল কোথায় সে কেউ জানল না ?

কেউ জানতে চেষ্টা করেনি বলেই জানেনি।

প্রজাদের একতরফা কথা আমি বিশ্বাস করি না, আপনাকে যা হয় একটা বুঝিয়ে দিয়েছে।

যা হয় একটা বুঝিয়ে দেবার লোক আর পেল না, শেষে কিনা তাকেই বুঝিয়ে দিল যে পঞ্চাশ বছর জমিদারির কাজ করে মাথার সমস্তগুলো চুল পাকিয়ে ফেলেছে। তবে আরও খুলে বলি, দেখুন আপনার ধারণার সঙ্গে মেলে কিনা। পরগণা থেকে বাবুজিকে আনবার জন্যে প্রধানরা পাল্কি পাঠিয়েছিল, সেই খবর জানতে পেরে ঈশান রায় লোকলস্কর মায় পাটহাতীটা নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করেছিল। উভয়পক্ষে লাঠালাঠি শুরু হয়ে যায়, বাবুজির মাথায় চোট লাগে, তখন বেধে ওঠে তকরার। ঈশান রায়ের দল চায় তাকে ঈশান রায়ের বাড়িতে নিয়ে যেতে, প্রজাদের দল চায় নিয়ে যেতে সদর কাছারিতে, তবে বাবুজি সকলকে শাসন করে বলেন অন্য কোথাও নয়, তাকে নিয়ে যাও রক্তদহের রাজবাড়িতে।

এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। জোড়াদীঘির বংশধর রক্তদহের শত্রু ! বিপন্ন হয়ে শত্রুর আশ্রয় সে নেবে ? এ কেমন করে সম্ভব, আমি তো বুঝতে পারছি না ! সত্যি কথা বলতে কি, পরগণা থেকে যে দুইজন প্রধান এসেছিল তারাও এ রহস্যের কিনারা করতে পারেনি। আচ্ছা বলুন তো, কোথায় তাঁর নিবাস, কোথায় পাল্কি পাঠিয়েছিল তাঁকে আনতে ?

দেওয়ানজি বলল, ধুলোউড়ির কুঠিতে।

চমকে ওঠে ইন্দ্রাণী—ধুলোউড়ির কুঠিতে ! সেখানেই তো আমরা বিপদের মুখে আশ্রয় নিয়েছিলাম। অনেক দিন ছিলাম, কি উদার আতিথ্য, কি অভিজাত বংশোচিত চেহারা ! কিন্তু কেউ তো বলেনি তিনি জোড়াদীঘির বাবু, তিনিও নিজে প্রকাশ করেননি। এ কেমন করে সম্ভব বুঝতে পারছি না !

প্রজারাও বুঝতে পারেনি। একবার বাবুজিকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

না, ডাক্তারের জরুরী নিষেধ কোনো অপ্রিয় আলোচনা এখন তাঁর সঙ্গে করা চলবে না। আচ্ছা আপনি এখন যান, কথাটা নিজেদের মধ্যেই রাখবেন। আমি একবার ধীরভাবে সমস্ত চিন্তা করে দেখি।

২০

সেকালে রাজারাজড়াদের বাড়ির একটা বিশেষ ধাঁচ ছিল, কেবল বড় বলে নয়, বড় তো বটেই কিন্তু বিশিষ্ট না বললে কিছুই বলা হয় না। অধিকাংশ রাজবাড়ি দীঘি দিয়ে ঘেরা, কোথাও বা দীঘিতে প্রাচীরে মিলিয়ে দুর্গম। সে-সব রাজা জমিদারের ইতিহাস কোম্পানীর আমলের গল্পে গিয়ে পৌঁছেছে, দীঘির মাঝখান দিয়ে জাঙালবাঁধা পথ, পথের মাঝে মাঝে ছোট বড় কামান, বাঁধানো বুরুজের উপরে পাকাপাকি তাদের স্থান। বেশ বুঝতে পারা যায় আততায়ীর পক্ষে যথাসাধ্য দুর্গম। যেখানে সম্ভব হয়েছে চারদিকে ভীমের পাঁজরা দিয়ে তৈরি দেউড়ি। সেই দেউড়িতে দোবে চোবে পাঁড়ে তেওয়ারির দল, সকাল সন্ধ্যায় তাদের কাজ দামামা আর ডঙ্কা বাজানো, প্রহরে প্রহরে বাজানো ঘড়ি আর ঘণ্টা। সকাল বেলাটায় যাদের সূচনা রামচরিত মানস পাঠ দিয়ে, সন্ধ্যায় সেখানে সিদ্ধি তরল আকারে। দেউড়ির পরে প্রকাণ্ড একখানা আটচালা, তার মধ্যে আছে প্রমাণ আকারের পাল্কি আর পুরনো আমলের কিরীচ আর বন্দুক টাঙানো—আর পিতল-বাঁধানো তেলে-পাকানো লাঠি। তারপরেই কাছারি বাড়ি, দেওয়ান পাইক সামন্ত কারকুন গিসগিস করছে। আর ঐ কাছারির নীচে কয়েদখানা। কাছারি বাড়ি থেকে ভিতর দিকে গেলেই রান্নার মণ্ডপ, ঝি-চাকরের সংখ্যা কাছারির মাস-মাইনের খাতা ছাড়া আর কোথাও লেখা নাই। এরা এই মণ্ডপের উপদেবতা, দেবতা হচ্ছে উড়িষ্যা থেকে আগত পাচক। তারা রাজবাড়িতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কাজ করে। বড় বড় দুমুখো উনুনে যে ঢালাও সাইজের ডেকচি কড়াই গামলার ব্যবহার প্রচুর গঞ্জিকার প্রসাদ ছাড়া তা ব্যবহার অসম্ভব। তারপরে মর্ত থেকে ত্রিদিব। ঐ শিব আছেন, কালী আছেন, আছেন রাধামাধব। সেখানে নিত্যনিয়ত চারবেলা দীয়তাম ভুজ্যতাম। আরও কিছু ভিতরে গেলে গৃহদেবতার মন্দির, গোপালনারায়ণ। সেখানে ভোগ ও পূজার স্বতন্ত্র আয়োজন। আরও এগিয়ে গেলে অন্দরমহল, আত্মীয়স্বজন, দূর

নিকট সবার উপরে বাড়ির কর্ত্রী ইন্দ্রাণী দেবী। প্রাচীরের বাইরে গোয়ালঘর, ঘোড়াশালা, হাতীর পিলখানা। এক একটি রাজবাড়ি এক একটি গ্রাম, কিম্বা বলা উচিত রাজবাড়িটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রামটি, কোথাও নামটি রক্তদহ কোথাও জোড়াদীঘি, কোথাও কলস, কোথাও আর একটা বা কিছু। রাজবাড়ির মর্যাদা নির্ভর করে বাড়ির আঙিনার সংখ্যার উপরে, দেউড়ির সংখ্যার উপরে আর তুবেলায় যত পাত পড়ে সেই সংখ্যার উপরে। এ ছাড়া আরও আছে। কাছারি মহল ও অন্দর মহলের মাঝখানে আছে অনেক খাস কুঠী বাড়ি, স্বাগত অভ্যাগত বিশিষ্ট আগতদের থাকবার ব্যবস্থা সেখানে। এইরকম একটি মহলে অসুস্থ ধুলোউড়ির কুঠিবাড়ির বাবুর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। হাতীর দাঁতের কাজ করা মেহগনি কাঠের পালঙ্কে তাঁর শয্যা। তার পরিচর্যার জন্য পাগড়ি বাঁধা চারজন লোক সর্বদা খাড়া। তা ছাড়া আছে পাচক ব্রাহ্মণ, পাঙ্খাসর্দার আর সর্বোপরি আছেন বাবুজির খাস খানসামা মোহন সর্দার। রানীমা বিশেষভাবে তাকে বলে দিয়েছেন বাবুজি কখন কি খান, কখন ডাবের জল, কখন তামাক তাঁর এ সমস্ত অভ্যাস তুমি যেমন জান আমরা কেউ জানিনে, বাবুজির এতটুকু অসুবিধা হলেই অপমান আমাদের উপরে বর্তাবে।

মোহন বলেছিল রানীমা, বাবুজির আর তো কোনো অসুবিধা হয় না, নিজের বাড়িতেও এমন সুখসুবিধার ব্যবস্থা ছিল না, সে তো আপনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, কেবল একটি বিষয়ে—

ইন্দ্রাণী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, কি বিষয় বল বাবা, আমাকে পর ভেব না।

মোহন বলল, আপনি যদি পর তবে আপন আর কে ?

মোহন কথা বলতে জানে বটে।

তুমি সব খুলে বল বাবা, লজ্জা করো না। কি অসুবিধা হচ্ছে বাবুজির ?

ঠিক অসুবিধা নয়, তবে সারাদিন একা পড়ে থাকেন, কথা বলবার লোক পান না, অসুবিধা বলতে এই যা।

তুমি ঠিক কথাই বলেছ বাবা, তবে কি জান সাহেব ডাক্তার নিষেধ করে বলে গিয়েছেন অনেক লোক এসে ভিড় করলে বাবুজির অসুখ সারতে দেরি হবে।

কথাটা তো ঠিক রানীমা, তায় আবার যে-সে ডাক্তার নয়, এ একেবারে সাহেব ডাক্তার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মা, বাবুজি অনেক কথা শুনতে ভালোবাসেন না, তবে মাঝে মাঝে এক-আধবার গান শুনলে তাঁর মনটা ভালো থাকে।

এই কথা! আমাদের দরবারে সুরজপ্রসাদ বলে এক মস্ত গাইয়ে আছে, আমি বলে দেব সে মাঝে মাঝে এসে কালোয়াতী গান শুনিয়ে যাবে।

সুরজপ্রসাদ মস্ত ওস্তাদ, শুনেছি তাঁর গান, তবে কি জানেন রানীমা, কালোয়াতী গান সহ্য করবার মতো এখনো তাঁর শরীরের শক্তি হয়নি, তবে যদি রানীমা হুকুম করেন তবে বৃন্দাবনী মাসী এসে এক-আধটা পদ শুনিয়ে গেলে বাবুজির মনটা তৃপ্তি হবে।

তবে তাই বলে দেব, আজ সন্ধ্যাবেলায় এক-আধটা পদ শুনিয়ে যাবে।

রানীমা চলে গেলেন, নূতন ব্যবস্থাপনা শোনাবার জন্যে মোহন প্রবেশ করল দীপ্তিনারায়ণের কামরায়, দেখল বাবু চোখ বুজে শুয়ে আছেন, তবে ঠিক ঘুম নয়।

এমন সময়ে বৃন্দাবনীকে প্রবেশ করতে দেখে মোহন বের হয়ে গেল। পায়ের শব্দ শুনে দীপ্তিনারায়ণ তাকালো, দেখল বৃন্দাবনীকে, বলল, মাসী অনেক দিন পরে তোমাকে দেখলাম।

না বাবুজি, আমি রোজ একবার করে আসি, তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে ফিরে যাই।

তুমি একাই এসেছ দেখছি।

আর কে আসবে বাবুজি, রানীমা তো সব সময়ে পেরে ওঠেন না।

তা বটে। হাতে ওটা কি?

লক্ষ্মীজনার্দনের চন্নামেৰ্ত্ত, রানীমা পাঠিয়ে দিলেন।

এই সব সামান্য কাজের জন্য তাঁকে বিরক্ত করো কেন? তুমি আনলেই পার।

আমিই তো এনেছি, তবে রানীমা বললেন কিনা।

আচ্ছা দাও।

তখন বৃন্দাবনী তামার টাট থেকে একটু জল নিয়ে মুখে দিল, মাথায় দিল নির্মাল্যের ফুল।

আঃ, বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দীপ্তিনারায়ণ।

মাসী এসেছ যখন, বসো, একটা গান শোনাও। অনেক দিন তোমার গান শুনিনি।

বুড়ো মানুষের গলার গান কি মিষ্টি লাগবে?

মাসী, পুরনো বাঁশীতেই মিষ্টি সুর বের হয়।

তা যদি বলো বাবুজি নূতন বাঁশীর স্বরও কম মিষ্টি নয়। এই দেখো না কেন চন্দনীর গলা।

চন্দনীর উল্লেখে তৃপ্তির কৃত্রিম উদাসীনতা বিচলিত হল। বলল, নূতন বাঁশী থাক। পুরনো বাঁশীই আমার ভালো লাগে।

তা কি গান গাইবো বল, একটা দেহতত্ত্বের গান করি!

মাসী, আমার কি অন্তিম কাল উপস্থিত না বুড়ো হয়ে পড়েছি?

ও কি অলুক্ষুণে কথা বাবা?

মাসী, এখন থেকে বাবুজি না বলে বাবা বলো, বাবুজিটা থাক অন্য লোকদের জন্যে।

বেশ, এখন থেকে তাই বলব, বাবুজিটা না হয় থাকুক চন্দনীর জন্যে। বলে মনে মনে হাসল।

বৃন্দাবনেশ্বরের কল্যাণে বৃন্দাবনী মাসী কম খেলোয়াড় নয়, জানে কোন্ কথা মনের কোন্ তারে ঝঙ্কার তুলবে।

ওসব কথা থাক, বজরার মধ্যে যে-সব পদকীর্তন করতে তারই একটা গাও।

বৃন্দাবনী খঞ্জনী বাজিয়ে আরম্ভ করল—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়নতারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী স্বজন
কিশোরী গলার হারা॥
রাধে ভিন্ন না ভাবিও তুমি—
সব তেয়াগিয়া ও রাঙাচরণে
শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি
সকলি করিয়া ক্ষমা
গলায় বসন আর নিবেদন
করিয়ে তুঁহারি ঠাঁই
চণ্ডীদাস ভনে ও রাঙা চরণে
দয়া না কাড়িও রাই॥

মাসী যতক্ষণ গান করছিল দীপ্তি ভাবছিল মাসী আর চণ্ডীদাস দুজনে ষড়যন্ত্র করে আমার মনের কথা লিখেছে, কিন্তু জানলো কি করে? কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, কিশোরী গলার [illegible], কিশোরী ছাড়া আর কথা নাই। গান থামলে বলল, মাসী একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তোমার মুখে যে গান শুনি কেবলি কিশোরী কিশোরী, বলি বৃন্দাবনে কি কিশোরী ছাড়া বুড়ো বুড়ী নাই?

আছে বইকি বাবা, তবে তারা মনে মনে কিশোরী।

সে আবার কেমন ধারা?

বাবা, বৃন্দাবনেশ্বর যে চিরকিশোর।

দীপ্তি বলে উঠল, আর রাধা চির কিশোরী।

ঠিক ধরেছ বাবা।

আচ্ছা মাসী, রাধার বয়স কত?

কুষ্ঠি তো দেখিনি তবে মনে হয় এই চন্দনার বয়স হবে। কিন্তু একটা কথা বলি বাবা, তুমিও তো কিশোর। তবে বাবা আর একটা গান শোন।—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইতে
তিতায় তিতিল রে?

কিছু উত্তেজিত ভাবে দীপ্তি বলল, থামো মাসী থামো, তোমার পদাবলীতে কেবলি চোখের জল, আমার ভালো লাগে না, শোনাও গে আর যাকে পাও।

আর কাকে পাব। তুমি তো শুধু ধমক দিলে, চন্দনা মারতে আসে।

বেশ করে। বলে দীপ্তি ঘুরে শুলো, না শুয়ে উপায় ছিল না, তখন তার দুই চোখে অবাধ্য জলের ধারা।

তবে যাই বাবা, এ ঘরে আসতে নিষেধ করে দি, বলি গে তোমার শরীর খারাপ।

কি খারাপটা দেখলে?

চোখ ছলছল করছে, ওটা তরুণ জ্বরের লক্ষণ।

তাও জানো?

জানবো না! আমার ঠাকুর্দা চিকিৎসক ছিলেন।

যার চিকিৎসার দরকার সেখানে যাও। আর এ বাড়ির যেন কেউ না আসে বলে দিয়ো।

যাই রানীমাকে বলিগে।

রানীমার কথা কে বলছে।

তবে আর কাকে?

ঐ যে চন্দনী বলে একটা মেয়ে আছে শুনেছি তাকে, তাকে, তাকে—বলে চাদর মুড়ি দিল, না দিয়ে আর উপায় ছিল না, দুই চোখে তখন বান ডেকেছে।

অন্তর্যামী মাসী মনে মনে হাসতে হাসতে চন্দনীর ঘরের দিকে চলল।

চন্দনীর ঘরে এসে দেখল সে ঘুমোচ্ছে, তখন বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করল—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

চন্দনী জেগে উঠে বলল, মাসী, কেন আমার ঘুম ভাঙালে?

আহা ঘুম ভেঙেছে, এই নামে কতজনের মোহনিদ্রা ভেঙেছে, তোমার তো সামান্য দুপুর বেলাকার ঘুম।

অনেক দিন কিল চড় খাওনি।

মাসী গাইতে লাগল—

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

চন্দনী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, কিবা হয় দেখাচ্ছি, তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিবা হয় দেখাচ্ছি, বলে মাসীর পিঠে ছোট্ট দুটি কিল মারলো।

কি এতেই হবে, না আরও দরকার আছে?

অবিচলিত মাসী গেয়ে চলল—

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।

কি হবে উপায় দেখাচ্ছি; মাকে বলে আজই তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাবার উপায় করে দিচ্ছি।

দাও দাও দিদি, এত কি সৌভাগ্য আমার হবে!

চন্দনীকে অগ্রসর হতে দেখে বলল, বাইরের ঘরে একজনকে গান শোনাতে গেলাম, তা তিনি তো ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন, তোমাকে শোনাতে এসে বুড়ো বয়সে মার খেলাম।

বাইরের ঘরে আবার কে এলো?

ঐ যে কে একটি বাবু এসেছেন না তিনি।

এখনো যাননি তিনি, আর কতদিন থাকবেন?

তাঁকেই না হয় জিজ্ঞাসা করো গিয়ে।

চন্দনী সোজা দীপ্তিনারায়ণের ঘরে গিয়ে বলল, আপনি আর কতদিন থাকবেন?

দীপ্তি বলল, একবার আপনি একবার তুমি যা হয় একটা স্থির করো।

তুমি বলতে গিয়ে তো একবার অপমানের চূড়ান্ত হয়েছি।

বেশ এখন থেকে আমিও আপনি বলব।

উত্তম, এটাই তো শিষ্টাচার, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো পেলাম না।

ঈষৎ ব্যঙ্গভরে দীপ্তি বলল, তবে শুনুন চন্দনী দেবী, আমি যাব না, এখানেই চেপে বসে থাকব।

বসে আর কই, দিব্যি শুয়ে আছেন দেখছি।

আমার অসুখ এখনো সারেনি।

বেশ সেরেছে দেখছি। মাথায় পটি কোথায়?

অসুখ কি কেবল মাথাতেই হতে হবে, মনেও তো হতে পারে।

একটা মনও আছে তাহলে। বাঁচা গেল!

কিন্তু চন্দনী দেবী, আমার মনের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি?

থাকতেও তো পারে।

ও বুঝেছি, সম্পত্তির লোভে রয়েছেন।

তা হলেই বা দোষ কী? কিন্তু সম্পত্তিই তো একমাত্র লোভনীয় নয়?

একমাত্র লোভনীয়! আর কি লোভনীয় থাকতে পারে বুঝতে পারছি না।

এবারে ব্যঙ্গের মাত্রা আর একটু চড়িয়ে দীপ্তি বলল, হায় চন্দনী দেবী, তা যদি বুঝতে পারতেন!

বুঝতে যখন পারিনি খুলেই বলুন না।

রানীমাকে বলব।

রানীমা! কেন মা বলতে কি মুখে বাধলো?

আপনার জিনিসে ভাগ বসাতে গেলে পাছে রাগ করেন এই ভয়ে বলিনি।

তবু ভালো যে ভয় আছে। যদি সত্যি ভয় থাকে তবে এখন থেকে আপনি না বলে তুমি বলবেন।

সেটা কি কেবল একতরফাই হবে?

সদর্পে হাঁ ব'লে বের হয়ে এলো চন্দনী।

পালালেন যে?

সে কথার কে উত্তর দেয়? বস্তুত পলায়ন ছাড়া অন্য পন্থা ছিল না চন্দনীর, কৃত্রিম কোপ কতক্ষণ থাকে!

বাইরে আসতেই বৃন্দাবনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বৃন্দাবনী বলল, কি বাবুটিকে বিদায় করে বুঝি এলে? এবার মায়ের কাছে চলেছ আমাকে বিদায় করবার আরজি নিয়ে, তা যাও, মা ঘরে নাই, শুনলাম দেওয়ানজির সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে তাঁর খাস কামরায় গিয়েছেন।

তার কথার উত্তর না দিয়ে চন্দনী সোজা চলে এলো নিজের ঘরে, এসেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। তখন এতক্ষণের চেপে রাখা হাসি উছলে পড়ল। সে বিছানায় ওলটপালট খেতে লাগল। তার মনে হল শরীরটা পাখীর পালকের মতো হাল্কা হয়ে গিয়েছে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সে। মনে হতে লাগল পদকর্তারা কি করে তার মনের কথা পদাবলীতে গেঁথে গিয়েছেন। বৃন্দাবনীর মুখে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি যে কয়জন পদকর্তার নাম শুনেছিল তাদের উদ্দেশে নমস্কার করল। তারপর মনে পড়ল রাধার দুঃখের কাহিনী—রাধার না তার নিজের, দুঃখের না সুখের ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল।

ইন্দ্রাণীর খাস কামরায় দুজনে নীরবে বসে আছে, ইন্দ্রাণী ও দেওয়ানজি। তাদের মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারা যায় একটা গুরুতর সমস্যার ভারে উভয়ে পীড়িত। অবশেষে ইন্দ্রাণী বলল, দেওয়ান জেঠা এমন তো হওয়ার কথা নয়; শুনেছিলাম যে প্রজারা সকলে আমাদের দিকে।

ঠিক আমাদের দিকে নয় বউমা, তারা জোড়াদীঘির বাবুর দিকে।

সেই জোড়াদীঘির বাবু তো এখন আমাদের ঘরে।

ঐ যে লোকটা ঈশান রায় বেটা শয়তানের জাসু। লোকটা প্রজাদের

বুঝিয়েছে আমাদের ঘরে যিনি এসেছেন তাঁর সঙ্গে জোড়াদীঘির কোনো সম্বন্ধ নাই, বুঝিয়েছে যে কোনো একটা লোককে আমরা জোড়াদীঘির বাবু বলে চালিয়ে দিচ্ছি, আর তার উপরে কয়েকজন মাথালো প্রজাকে হাত করে নিয়ে বলেছে তাদের, দু বছরের খাজনা মাপ করে দেবে যদি তারা ঈশান রায়ের পক্ষে আসে। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা মেতে উঠেছে, রটাচ্ছে পাল্কিতে করে যে আসছিল জোড়াদীঘির সে কেউ নয়। আরও বুঝিয়েছে জোড়াদীঘির বাবুর বংশগত শত্রু রক্তদহ, সে কেন উপযাচক হয়ে রক্তদহের রাজবাড়িতে আশ্রয় নেবে? খাজনা মাপের অনুপান সঙ্গে থাকায় ওষুধটা সহজেই ধরেছে।

এত কথা জানলেন কি করে?

দয়ারাম চক্রবর্তী সব জেনে এসেছে।

আচ্ছা তাকে একবার ডাকুন, তার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে নিই।

সেই ভালো—বলে দেওয়ানজি উঠে গেল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। সে ঘরে ঢুকেই ইন্দ্রাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

ও কি করেন, আপনি শ্রীহর্ষের সন্তান।

হলে হয় কি আপনি যে অন্নদাতা, শ্রীহর্ষ এখন বংশগৌরব ছাড়া আর কিছু দিতে পারত না, আপনি তার সন্তানের মুখে প্রত্যহ অন্ন দিচ্ছেন, আপনাকে প্রণাম না করলে প্রত্যবায় হবে যে।

দয়ারামের অভ্যাস ছিল মাঝে মাঝে এক-আধটা সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ, তার পিতামহ পণ্ডিত ছিল।

আচ্ছা দয়ারাম, দেওয়ান জেঠার মুখে যে-সব ঘরের কথা শুনলাম আপনি জানলেন কি করে?

রানীমা, ঘরের কথা তো সামান্য, হাঁড়ির কথা অবধি আমার অজানা নয়। পরগণা দুটোর যে-সব লোকের হাঁড়ি চড়ে না, তাদেরই সংগ্রহ করে ঈশান রায় দল পাকিয়েছে, বলেছে তোমাদের দুই সালের খাজনা মাপ দেব, আমার সঙ্গে এসো।

তারা বলল, কর্তা আজ খেতে পাই না, ভবিষ্যতের আশায় থাকি কি করে!

ঈশান রায় বলে, আঃ কি মুশকিল, কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে?

আচ্ছা মুসলমান প্রজারা কেষ্টর নাম শুনে চটে উঠল না?

হুঁ হুঁ, সেদিকে ঠিক আছে, না হলে আর শয়তান বলেছে কেন। বেছে বেছে হিন্দু প্রজাদের ডেকেছিল, জানে তাদেরই ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।

আচ্ছা এমন কেন হয় বলতে পারেন দেওয়ান জেঠা ?

আগ বাড়িয়ে দয়ারাম বলল, উনি থাকেন সদর কাছারিতে, উনি কি জানবেন। আমার কাছে শুনুন রানীমা, মুসলমান চাষীরা খাটে, চাষ করে, একের বিপদে অপরে সাহায্য করে। হিন্দুদের ঠিক উল্টো, তারা ভাগে চাষ করে, ধান উঠলে মালিককে দেয় না, বলে কর্তা দুটো চানা হয়েছিল তাও আবার পঙ্গপালে খেয়ে গিয়েছে : আর প্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাকে আরও বিপাকে ফেলতে চায়। তারা রাজাকে খাজনা দেয় না, মহাজনের সুদ দেয় না। এমন লোকের অন্নাভাব না হবে কেন ?

ঈশান রায় আরো বোঝালো তোমরা তো খোদার কসম নিয়ে বলোনি যে জোড়াদীঘির বাবুকে ছাড়া আর কাউকে খাজনা দেবে না !

প্রজাদের একজন বলল, এখন তো শুনছি জোড়াদীঘির বাবুজিই রক্তদহের রাজবাড়িতে এসেছেন।

ঈশান রায় এই কথা শুনে হেসে উঠল, বলল, মণ্ডল তোমার চুল পেকেছে, এমন কথায় বিশ্বাস করলে বলে হেসে উঠল। আর ঐ যে রক্তদহের দেওয়ানটি, পয়লা নম্বরের শয়তান। ধুলোউড়ির কুঠির বাবুটির সঙ্গে যোগসাজসে তাকে জোড়াদীঘির বাবু বলে চালিয়ে দেবে, তাহলেই দুই পরগণার খাজনা পাবে—এই সব আশা দেখিয়ে তাকে এনে ফেলেছিল রাজবাড়িতে। আমি সেই খবর পেয়ে বুঝলাম, এই রে মরলো আড়াইকুড়ির প্রজারা, তাই তো লেঠেল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, মেরেই ফেলত, নেহাৎ গুরুর কৃপা ছিল তাই প্রাণে বেঁচে গেল। এই তো খুলে বললাম ভিতরের কথা। তোমরা সরল, তোমাদের ছেলেমানুষ বললেই হয় তাই তোমাদের হাঁড়ির খবর বললাম বিশেষ তোমরা আমার স্বজাতি। দেখো ঐ মুসলমানগুলোকে আবার বলে বসো না, ওদের তো জাত-পাত নেই, ওরা কথাটা রক্তদহের কানে তুলবে, মরতে মরবে তোমরা।

সে ভয় করবেন না কর্তা, আমরা এসব কথা কি বলতে পারি, এ আমাদের পেটেই থাকবে।

তবে আর কি, এখন যাও।

একটা আরজি আছে কর্তা।

কি বল, বল ?

খরচপত্রের বড় টানাটানি চলছে, কিছু পেলে ভালো হত।

ও এই কথা, এতক্ষণ বলনি কেন ? আচ্ছা তোমরা বসো, আমি আসছি।

ঈশান রায় ভিতরে চলে গেল, ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল কত পাওয়া যাবে।

কেউ বলে বিশ-পঁচিশ, কেউ বলে একশ-দেড়শ।

ঘণ্টাখানেক পরে ঈশান রায় বেরিয়ে এসে বলল, এই নাও। তার হাতে একগোছা কাগজ।

এই নাও, কারেন্সি নোট বলে এগুলোকে মনে কর।

কারেন্সি নোট কি কর্তা?

ও তা জানো না, ওই যা দিয়ে হাটেবাজারে কেনাবেচা হয়। তোমাদের ঘরেও নিশ্চয় দু'চারখানা আছে।

সেগুলো তো কর্তা ছাপা কাগজ, আবার রাজার সিলমোহর তাতে থাকে—এ তো নিছক দাখিলার উপরে হাতে লেখা। এ সব তো হাটেবাজারে চলবে না।

চালাতে জানলেই চলবে, তবে এখন হাটেবাজারে চালাবার চেষ্টা করো না, জানাজানি হয়ে গেলে লোকে কেড়ে নেবে।

প্রজাদের মুখের ভাব দেখে ঈশান রায় বোঝে তারা বিশ্বাস করেনি।

কি, বিশ্বাস হল না? আচ্ছা দাও আমার হাতে—এই বলে এক জনের হাত থেকে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে পড়ল, ভূষণ দাস বার্ষিক জমা ২৩।৵০ আনা। এই দেখ আগামী তিন বছরের হিসাব বলে লিখে দিয়েছি ৭০৵০ আনা নগদ পেলাম। তাহলেই দেখ ঐ পরিমাণ টাকার কারেন্সি নোট কিনা।

প্রজারা হতবুদ্ধি, মুখে কথা সরে না তাদের।

দেখ গোড়ায় বলেছিলাম দু'বছরের খাজনা মাপ দেব। তার পরে ভাবলাম নাঃ, একেবারে তিন বছরের মাপ করে দিই, তাহলে রক্তদহ আর তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারবে না, সব তামাদি দোষে খারিজ। তবেই দেখ তোমাদের জন্য কত চিন্তা করি। জমিদারি শাসন কি মুখের কথা!

কিন্তু এত চিন্তার ফলেও প্রজাদের মুখে বিশ্বাসের লক্ষণ দেখা গেল না।

যাও যাও এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাও, আর কারেন্সি নোটগুলো সামলে-সুমলে রেখো, তোমাদের মুসলমান ভাইরা আবার দেখতে না পায়, দেখতে পেলেই এসে ধরাও করবে আমাকে। আমি কত খাজনা মাপ দেব!

তা এখন আমাদের কি করতে হবে?

শোনো, বলে গলার স্বর নামিয়ে এনে বলল, এখন কিছুই করতে হবে না, তবে আমি যখন লড়াই করতে বের হব তোমরা লাঠিসোঁটা নিয়ে সঙ্গে যাবে।

ঐ নকল জোড়াদীঘির বাবুটার মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলতে পারলে একেবারে নিশ্চিন্তি, তখন মুসলমান প্রজারা আর কাকে খাজনা দেবে? তোমাদের কোনো ভয় নাই আমার লেঠেলদের হাতে বন্দুক কিরীচ থাকবে, আর সঙ্গে থাকবে আমার পাটহস্তী।

পাটহস্তীর কথা শুনে প্রজারা রীতিমতো ভীত হয়ে উঠল, ভয়ে ভয়ে বলল, হুজুর ঐ অপয়া হাতীটা না নিলেই কি নয়? সেবার রানীদীঘির জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খেলো, সব সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, রক্ষা পেয়ে গেল রাজবাড়ি।

বিমল হাস্যে প্রজাদের ভীতিকে চাপা দিয়ে ঈশান রায় বলল, আরে ও হাবুডুবু খাওয়া নয়, রানীদীঘির জল মাপছিল, ওর জুড়ি নাই রাজবাড়ির পিলখানায়।

প্রজারা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলল, তবে আজ উঠি হুজুর।

হাঁ, সেই ভালো, খবর পেলেই সকলে এসে জুটবে। আর খুব সাবধানে রাখবে ঐ কারেন্সি নোটগুলো। তোমাদের আবার অভ্যাস কাগজপত্র চালের বাতায় গুঁজে রাখা, ওতে জানাজানি হয়ে যায়। চালের বাতায় নয় চালের হাঁড়ির মধ্যে রাখবে। একেবারে তিন বছরের খাজনা মাপের দাখিলা। আর তোমাদের কার কি চাই একটা ফর্দ করে রেখো, পরগণাটা হাতে এলেই একেবারে সদরে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে দেবো।

প্রজারা নিঃশব্দে প্রণাম করে বিদায় নিল।

এই পর্যন্ত বলে দয়ারাম চক্রবর্তী থামল।

থামলে কেন? শুধালো দেওয়ানজি।

আর তো কিছু নাই। তবে যদি রানীমা হুকুম করেন তবে না হয় একবার পরগণার মুরুব্বীদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি।

না তার দরকার নাই, আমাদের লোকজন তৈরী আছে।

দেওয়ানজি, আমাদের সবচেয়ে বড় সহায় ঐ পাটহাতী। ওটা যেমন অলুক্ষণে তেমনি অপয়া।

আচ্ছা তুমি এখন এসো, বলল ইন্দ্রাণী।

দয়ারাম চলে গেলে দেওয়ানজি বলল, বউমা, আর দেরি নয়, দত্তক নেওয়া তো হয়ে গিয়েছে, এবার বিয়েটা শীঘ্র সম্পন্ন করাও, শুভস্য শীঘ্রম্।

আমি তো চাই যে শুভকার্য শীঘ্র হয়ে যাক। কিন্তু দীপ্তিনারায়ণের মনের ভাব তো বুঝতে পারছি না।

দেওয়ানজি একটু হেসে বলল, বউমা তোমার বয়স হয়েছে, আমার তো হয়েইছে, ওসব ভাবসাব আমরা বুঝতে পারব না। তুমি বৃন্দাবনী মাসীর সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করো।

তারও তো বয়স হয়েছে।

না ঠিক হয়নি, মাসী বৃন্দাবনের গোপী, তার কাছে কোনো কথাই গোপন থাকে না। ব্রজেশ্বরের অসীম কৃপা গোপীদের উপরে।

মন্দ বলেননি, তার সঙ্গে চন্দনীরও কথাবার্তা হয় দেখেছি, তবে তাই যাই।

তাই যাও মা, মোট কথা আর বিলম্ব নয়। বিয়ে হয়ে গিয়েছে শুনলে প্রজারা 'কারেন্সি' নোট ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সব একাকাট্টা হয়ে যাবে।

এতও আসে ঈশান রায়ের মাথায়?

নইলে আর শয়তান বলেছে কেন!

দেওয়ানজির কথা শেষ হওয়ার আগেই ইন্দ্রাণী চলে গিয়েছিল। তখন সেই নির্জন ঘরে কপালে হাত ঠেকিয়ে বৃদ্ধ দেওয়ান বলল, লক্ষ্মীজনার্দন মুখ রক্ষা করো রানীমার।

দীপ্তিনারায়ণ জানলার কাছে আরামকেদারায় বসে একখানা বই পড়ছিল। এখন সে উঠে বসতে পারে। ঘরের মধ্যে এমন কি বারান্দাতেও ঘোরাফেরা করতে পারে। ডাক্তারের মতে এখন সে সুস্থ। এমন সময় পিছন থেকে কে একজন তার চোখ চেপে ধরল। সে বুঝল তবে না-বোঝার ভান করে বলল, কে, দেওয়ানজি নাকি, তারপরে হাত দিয়ে চোখের উপরকার হাত স্পর্শ করে বলল, না, দেওয়ানজির হাত তো এমন নরম হবে না! তবে কি মোহন নাকি, মোহন তোর এত সাহস কবে থেকে হল? নাঃ, তার হাতও এমন নরম নয়। বুঝেছি নিশ্চয় বৃন্দাবনী মাসী! বলল, মাসী চোখ ছাড়ো, পড়তে দাও, বইখানা খুব ভালো লাগছে। নাঃ মাসীও নয়, তার আঙুলে তো আংটি ছিল না। এবারে সে হাত দিয়ে পশ্চাদবর্তিনীর মুখ স্পর্শ করল। এবারে কানে শুনতে পেলো একটি মৃদু মধুর হাসি। সে ঘুরে বসে বলল, তাই বলো, চন্দনী!

চন্দনী বলল, ছাড়ো, (দীপ্তিনারায়ণ তার হাত ধরে ছিল) মাসীকে ডেকে দিই!

মাসীর দরকার নেই, বোনঝিতেই চলবে। তারপরে এত সকালে ব্যাপার কি?

ব্যাপার আর কি, জিজ্ঞাসা করতে এলাম, অসুখ তো সেরে গিয়েছে, আর কতদিন পরের বাড়িতে থাকা হবে?

তোমরা তো এর চেয়ে বেশিদিন আমার কুঠিবাড়িতে ছিলে।

ও, তারই বুঝি পাল্টা গাইছেন?

মন্দ কি!

এ ঘরটিতে আমাদের দরকার।

এই কথাটা বলবার জন্যে তোমাকে আসতে হল! তবু ভালো যে একবার দেখা পাওয়া গেল।

কেন, এর আগে কি দেখা পাননি?

মনে তো পড়ে না।

কেমন করে পড়বে, তখন অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন।

তারপরেও তো অনেকবার মাসীর দেখা পেয়েছি।

মাসী যত সস্তা বোনঝি তত সস্তা নয়।

হঠাৎ দর চড়লো কবে থেকে?

তা না হয় মায়ের কাছে শুনবেন, এখন জেনে রাখুন এই বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত আমার।

বেশ, রজনীমার সঙ্গে দেখা হলে জানাবো যে চন্দনী এসে বিদায়ের নোটিশ দিয়ে গিয়েছে।

মা এসে নিজেই জানিয়ে যাবেন।

তখন যা হয় করা যাবে। এখন থামো, আমি এখন তিলোত্তমাকে নিয়ে ব্যস্ত।

তিলোত্তমা আবার কে? কোথায় সে?

বেশি দূরে নয়—এই ঘরেই আছে।

তাই বুঝি ঘরটা ছাড়তে চাইছেন না?

এক রকম তাই, তবে আমি গেলে সেও আমার সঙ্গে যাবে।

তিলোত্তমা প্রসঙ্গ চন্দনীর মোটেই ভালো লাগল না। বলল, সে বুঝি খুব সুন্দরী?

তোমার চেয়ে তো বটেই।

একবার দেখতে পাই না!

সময় হলেই দেখতে পাবে।

আমার চেয়েও সুন্দরী?

কেন, হতে কি নেই!

তাকে বুঝি খুব ভালোবাসেন? তবে মাসীর কাছে শুনেছি যে অজ্ঞান অবস্থায় বারে বারে আমার নাম করছিলেন, কেন?

অজ্ঞান অবস্থায় বলেই করছিলাম, এখন জ্ঞান হয়ে ভুল ভেঙেছে।

থাকুন আপনার তিলোত্তমাকে নিয়ে, আমি চললাম।

প্রস্থানোদ্যত চন্দনীর আঁচল ধরে ফেলে বলল, কোথায় চললে?

শুনবেন? তবে শুনুন। মাকে গিয়ে বলব, তোমার ঐ কুঠিবাড়ির বাবুটি রসের নাগর, ঘরে লুকিয়ে রেখেছে তিলোত্তমাকে।

মাকে নয়, মাসীকে জিজ্ঞাসা করো রাধা থাকলে কি আর চন্দ্রাবলী থাকতে নেই!

নেই, নেই—বলে প্রস্থান করল চন্দনী।

দীপ্তিনারায়ণ হেসে বন্ধ করল বইখানা।

সোজা মায়ের ঘরে গিয়ে বলল, মা, তোমরা ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে স্থির করেছ?

আজ এতদিন পরে সে কথা উঠল কেন? কতবার শুনেছিস, তখন তো আপত্তি করিসনি?

তখন কি জানতাম ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তিলোত্তমা নামে একটা মেয়েকে! আর বলে কিনা সে আমার চেয়েও সুন্দরী!

তা কি হতে নেই?

হবে না কেন, তবে এ বাড়িতে তার স্থান নেই। এ বাড়িঘর সব আমার।

২৯

চন্দনীর কথা শুনে কৌতূহল বোধ করল ইন্দ্রাণী, সঙ্গে একটুখানি স্বস্তিবোধও ছিল, বিষয়সম্পত্তির উপরে তার মমতা জন্মেছে দেখে। বলল, চল তো দেখে আসি কোথায় সেই মেয়ে আর কেমন সুন্দরী!

অত সহজে কি দেখতে পাবে, লুকিয়ে রেখেছে, বড় সহজ লোক নয় তোমার ঐ কুঠিবাড়ির বাবুটি।

ঐ তো একটা ঘর, লুকিয়ে রাখবে কোথায়, চল।

দুজনে ঘরে ঢুকল, আগে ইন্দ্রাণী, পিছনে চন্দনী।

কি করছ বাবা ?

একখানা বই পড়ছি।

চন্দনী বলছিল, তিলোত্তমা বলে একটি মেয়েকে দেখেছে, সে নাকি খুব সুন্দরী।

সত্যি খুব সুন্দরী।

দেখলে তো মা আমার কথা সত্যি কিনা !

আমার কথাও মিথ্যা নয়, খুব সুন্দরী আর ভারী নম্র মিষ্টভাষী। শুধু রূপ নয়, গুণেরও অন্ত নাই।

আগেই চন্দনীর ক্রোধ চরমে পৌঁছেছিল রূপের বর্ণনায়, এখন গুণের ব্যাখ্যায় মনের উষ্মা চোখের জলে ঝরে পড়তে লাগল।

কাঁদছিস কেন ?

সত্যিই তো কাঁদছে। মেয়েটিকে দেখলে বোধ করি মূর্চ্ছা যেত। আচ্ছা মা, তোমায় দেখাচ্ছি মেয়েটিকে, তবে ওকে নয়।

কই দেখাও না বাবা।

এই নাও বলে বইখানা দিল দীপ্তিনারায়ণ। ইন্দ্রাণী পড়ল দুর্গেশনন্দিনী, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। তা বাবা এই বইয়ের নাম তো আগে শুনিনি, লেখকেরও নয়।

কি করে শুনবে মা, বইখানাও নূতন, লেখকটিও, এই তার প্রথম বই।

কোথায় পেলে বাবা এ বই ?

কলকাতা থেকে এক বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছিল ধুলোউড়িতে, লিখেছিল বইখানা বের হতেই কলকাতার শিক্ষিত সমাজে শোরগোল পড়ে গিয়েছে, সকলেই পড়ছে আর সকলেরই ভালো লাগছে।

এর সঙ্গে তিলোত্তমার সম্বন্ধ কোথায় ?

তিলোত্তমাকে নিয়েই বইখানা, সে এই উপন্যাসের নায়িকা। তুমি নিয়ে যাও, আমার পড়া হয়ে গিয়েছে, নিশ্চয় ভালো লাগবে। তবে আমার মনে হয় মেয়েটির একটি ত্রুটি আছে, অত বোকা না হয়ে একটু রোখা হওয়া উচিত ছিল।

এই আমাদের চন্দনীর মতো কি বল !

না মা, তোমার মেয়ে একই সঙ্গে বোকা আর রোখা।

শুনলি তো ?

দীপ্তিনারায়ণ ও ইন্দ্রাণী মুখোমুখি অবস্থায় ছিল, একজন বসে একজন দাঁড়িয়ে। অবস্থিতির এই সুযোগ নিয়ে চন্দনী ছোট্ট হাতের ছোট্ট মুঠিতে একটি কিল দেখাল।

এখন তুই যা, আমরা একটু কথা বলি।

চন্দনী আভাসে ইঙ্গিতে শুনেছিল কি কথা হবে।

বলল, আচ্ছা মা যাচ্ছি, বইখানা নিয়ে গেলাম।

ইন্দ্রাণীর বদলে দীপ্তিনারায়ণ উত্তর দিল, নিয়ে যাও, তবে তিলোত্তমার উপরে রাগ করে বইখানা ছিঁড়ে ফেল না।

না না, বইখানা আমাকে দিয়ে যা, তুই ছিঁড়েছুঁড়ে ফেলবি। যা, এখন বৃন্দাবনী মাসীর কাছে গিয়ে গান শোন গে।

যাওয়ার আগে দীপ্তিনারায়ণের দিকে তাকিয়ে জিভ দেখাল, দীপ্তিনারায়ণ দেখল রক্তিম অধরোষ্ঠের মধ্যে রক্তিম জিহ্বার সরস অগ্রভাগ।

ইন্দ্রাণী বলল, মেয়েটি বড ভালো।

হবে না কেন মা, তোমারই তো মেয়ে।

ইন্দ্রাণী সাহস সঞ্চয় করে বলল, চন্দনী আমার মেয়ে নয়।

এই কথায় অকস্মাতের আঘাতে বজ্রাহত হয়ে গেল দীপ্তিনারায়ণ। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বার কতক বলল, তোমার মেয়ে নয়, তোমার মেয়ে নয়!

না বাবা, সত্যি আমার মেয়ে নয়। আমার মাসী দশ দিনের মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। সেই থেকে ও আমার কাছে আছে। তার পরে একটু থেমে থেকে বলল, তবে এখন আমার মেয়েই বলতে পার। মাস দুই আগে ওকে যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করেছি।

দীপ্তিনারায়ণের তখনো বজ্রাহত ভাব কাটেনি। অভাবিতের তাঁত থেকে নানা রঙের সুতোর জাল বুনতে লাগল মনের মধ্যে। তার মধ্যে সবগুলো কালো নয়, রঙীন সুতোর সংখ্যাও মন্দ ছিল না।

কি ভাবছ বাবা ?

দীপ্তির চটকা ভাঙল, বলল, চন্দনী যেমন জোরের সঙ্গে আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলল, বুঝলাম ও তোমার পরে জমিদারি দেখতে পারবে।

ও অমন বলেই থাকে, কিছু মনে করো না বাবা। কিন্তু জমিদারি দেখা কি মেয়েছেলের কাজ? আমি আর কদিন, প্রাচীন হয়ে পড়েছি।

কেন, দেওয়ানজি আছেন।

তাঁর বয়স আমার চেয়েও বেশি।

তবে মা এক কাজ করুন, তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দিয়ে ফেলুন।

আমি সেই কথাই তো ভাবছি।

চন্দনীর অনুরোধে বৃন্দাবনী একটি পদ গাইতে শুরু করেছিল, তারই বাণী এখান থেকে শোনা যাচ্ছিল। বৃন্দাবনীর মধুর কণ্ঠে মধুর গীতিতে ক্ষণকালের জন্ত ইন্দ্রাণীদের কথায় বাধা পড়ল।

বৃন্দাবনী গাইছিল—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল
টুটল সকল সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ রব করু
গগনে উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হুউ
মলয় সমীর বহু মন্দা॥

মধুর পদাবলীর জাদুতে মুগ্ধ হয়ে দুজনে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকল, প্রথমে কথা বলল দীপ্তিনারায়ণ, মা, তাড়াতাড়ি চন্দনীর বিয়ে দিয়ে ফেল।

তাড়াহুড়ো করে তো বাবা চন্দনীকে যার তার হাতে দিতে পারি না!

সে এক কথা বটে, তবে দেওয়ানজির কাছে শুনলাম ঈশান রায় বলে লোকটা আবার গোলমাল বাধাবার চেষ্টায় আছে।

আছে বইকি, ঐ পরগণা দুটোর উপরে অনেক দিনের লোভ। এতকাল উনি ছিলেন বলে কিছু করে উঠতে পারেনি, এখন আমাদের মেয়েমানুষের সংসার তাই উঠে পড়ে লেগেছে।

লাগলেই হল! যোগ্য জামাই হলে লোকটা পিছিয়ে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ এখন যোগ্য পাত্র পাই কোথায়? তারপর একটু থেমে হয়তো মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে হাতের শেষ দান নিক্ষেপ করল, বলল, বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অসংকোচে উত্তর দিয়ো। চন্দনীকে তোমার কেমন মনে হয়?

অসংকোচেই বলব এমন মেয়ে হয় না, ও যে ঘরে যাবে উজ্জ্বল হবে সে ঘর।

তবে কেন বাবা তুমিই ওকে নাও না।

আমি—বলে কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে থাকল।

কেন নয় বাবা, ও কি তোমার অযোগ্য?

আমিই ওর যোগ্য নই মা। আসল কথা কি জানো, পিতার নিষেধ ছিল রক্তদহের বংশের মেয়ে কখনো বিয়ে না করি।

ও তো বাবা রক্তদহের বংশের মেয়ে নয়, ওর শরীরে রক্তদহের বংশের এক বিন্দু রক্ত নেই। তোমাকে তো আগেই বলেছি, ও আমার মাসীর মেয়ে, ওকে যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ করেছি, তাতে তো রক্তের পরিবর্তন বোঝায় না। তারপরে একটু থেমে থেকে—হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করলে না!

তোমাকে অবিশ্বাস করব মা, এমন পাষণ্ড আমি নই।

তবে আর বাধা কি?

বাধা আমার মনে নয়, বাধা লোকাচারে। লোকে বলবে দর্পনারায়ণ বাবুজির পৌত্র তোমার সম্পত্তির লোভে—

(সুন্দরী মেয়ের লোভে মুখে এসেছিল তবে সংকোচে বলতে পারল না, বলল, সম্পত্তির লোভে।)

সম্পত্তি তো তোমার বাবা!

দীপ্তিনারায়ণ লঘুভাবে বলল, সে কথা চন্দনী স্বীকার করবে না।

দুজনেই বুঝলো এটা পরিহাস।

সম্পত্তি চন্দনীর স্বামীর। আমি বৃন্দাবনী মাসীর কাছে শুনেছি তোমাকে ও বড় ভক্তি করে (সেকালের মেয়েদের মুখে ভালোবাসা শব্দটা বের হতে চাইতো না)। বৃন্দাবনী মাসীর কাছে গিয়ে তোমার কথা পেলে আর কিছু শুনতে চায় না। আচ্ছা বাবা, লোকাচার রক্ষার জন্যে এক অনুষ্ঠান করলে হয়!

দীপ্তি এতক্ষণে সমস্যার সমাধান সন্ধান করছিল, আগ্রহের সঙ্গে শুধালো, কি অনুষ্ঠান মা?

আমাদের গুরু পুরোহিত গৃহদেবতার সম্মুখে যদি শপথ করে বলে, তবে কি লোকাচারের মুখরক্ষা হবে না? কি বল বাবা!

কি আর বলব মা, এত প্রয়োজন ছিল না—তুমিই আমার গৃহদেবতা।

আনন্দে স্বস্তিতে পতনোন্মুখ অশ্রুধারা নিবারণের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাণী "তবে সেই ব্যবস্থাই করি গে"—বলে উঠে গেল।

এতক্ষণ পরে নিজেকে একলা পেয়ে প্রশস্ত শয্যার উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগল, এ-ও আনন্দের এক প্রকাশ। তার মনের একতারায় একটি মাত্র বাণী ধ্বনিত হতে থাকল, চন্দনী তার, চন্দনী তার, চন্দনী তার।

মনে মনে দুজনে উত্তর প্রত্যুত্তর চলতে থাকল। কি গো, তিলোত্তমাকে কেমন লাগল?

উত্তর পেল, তিলোত্তমা বড় ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে। অনেকটা মাসীর রাধার মতো। তার চেয়ে অনেক ভালো অনেক শক্ত আয়েষা।

অনেকটা তোমার মতো কি বলো?

আমি কি খুব শক্ত?

শক্ত আর কাকে বলে, কতবার আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছ! অয়েষার সূর্যালোকের কাছে চন্দনীর চাঁদের আলো ম্লান।

আবার কবিত্বটুকুও আছে দেখছি!

আছে বইকি, দরকার হলে গরলাধার অঙ্গুরীয় মুখে দিতে পারি।

মুখে কি আর কিছু দেবার মতো নাই! বলে তার রক্তিম ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠে একটি তপ্ত চুম্বন মুদ্রিত করে দিল।

আঃ, কেউ দেখে ফেলবে!

কেউ না দেখলে বুঝি আপত্তি নেই। আয়েষা হলে এমন অকারণ আপত্তি করত না।

বটে!

নাঃ ছাড়ো ছাড়ো, ওসব এখন ভালো লাগে না।

পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ স্থির করে ফেলতে হবে বুঝি?

আঃ, ছাড়ো।

কেন ছাড়ব, কতবার আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছ!

তাই বুঝি আমার প্রাণটা বের করে দিতে চাও?

ভাষায় যতই আপত্তি করো, তোমার মুখ চোখ কিন্তু বলছে অন্য কথা।

হার মানলাম বাপু, যা হয় করো।

পরদিন শুভ লগ্নে গৃহবিগ্রহ লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরে গুরু, পুরোহিত, ইন্দ্রাণী, দেওয়ানজি, ভাদুড়ীমশাই ও দয়ারাম চক্রবর্তী কুশাসনে আসীন, সকলের অগ্রে দীপ্তিনারায়ণ, সকলের পিছনে বৃন্দাবনী মাসী। প্রথমে লক্ষ্মীজনার্দনের যথাবিহিত পূজা সম্পন্ন হল, তারপর গুরুঠাকুর তামাতুলসী, গঙ্গাজল হাতে করে বললেন, এই বাড়ির গৃহদেবতা যিনি, বহু পুরুষ ধরে যথাশাস্ত্র পূজিত হচ্ছেন, তাঁকে সাক্ষী করে ঘোষণা করছি শ্রীমতী চন্দনা যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত হয়েছে রানীমাতা ইন্দ্রাণী ঠাকুরানীর দ্বারা। তার শরীরে একবিন্দু রক্তদহ জমিদারবংশের রক্ত নাই। তোমরা সকলে বল তথাস্তু। উপস্থিত সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করল, তথাস্তু। তারপরে সকলে গৃহদেবতার সম্মুখে প্রণাম করল। তখন পুরোহিত ঠাকুর দেবতার চরণামৃত সকলের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন, বললেন, আপনারা সকলে বলুন, শান্তি, শান্তি, শান্তি।

গুরুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, চন্দনা মাকে দেখছি না কেন ?

বৃন্দাবনী বলল, কত অনুনয় বিনয়, কত টানাটানি করলাম, কিছুতেই এলো না।

মনস্তত্ত্বজ্ঞ গুরুঠাকুর বললেন, এ সময়ে ব্রীড়া স্বাভাবিক।

দীপ্তিনারায়ণ মনে মনে ভাবল, সব মেয়েই কোনো না কোনো সময় তিলোত্তমা।

ইন্দ্রাণী বলল, সকলের সমক্ষে লক্ষ্মীজনার্দনকে একটা পদ গেয়ে শুনিয়ে দাও।

মাসী মন্দিরা ঠুকে শুরু করল—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥
গনইতে দোস গুনলেস না পাওবি
জব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কিএ মানুস পশু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥

ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুআ পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥”

ইন্দ্রাণী ভাবল, আহা, এ সময়ে চন্দনী থাকলে ভালো হত।

সেই সময় দীপ্তিনারায়ণের চোখে পড়ল উঁচুতে ঘুলঘুলির ফাঁকে একখানি কচি মুখ হাসিতে কৌতুকে রহস্যে উজ্জ্বল, একসঙ্গে তিলোত্তমা ও আয়েষার ঢালাই মূর্তি।

এমন সময়ে দেউড়ির দোতলায় নবতখানায় সানাই বেজে উঠল। গাঁয়ের লোকে ভাবল রাজবাড়িতে হঠাৎ সানাই বাজে কেন?

২২

আমরা যেকালের কথা বলছি তখনো গ্রামীণ সমাজ অটুট ছিল, উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র মিলে একটা অখণ্ড ব্যাপার। তাই কোথাও একটা ঢেউ উঠলে সর্বত্র তার আঘাত পৌছত, একজনের সুখে সকলে সুখ বোধ করত, একজনের দুঃখে সকলে কাতর হত। এই গ্রামীণ সমাজের কেউ ছিল জমিদার, ছোট হলে বাবু বলত লোকে, বড় হলে বলত রাজা। রক্তদহের জমিদারকে লোকে রাজা বলত। সেই সানাইয়ের রবের অর্থ অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকে জানতে পারল, প্রথমে কানাকানি, তার পরে জানাজানি। চন্দনীর বিয়ে হবে। চন্দনী সকলের প্রিয় ছিল তাই সকলে খুশি হল। কার সঙ্গে বিয়ে, না কুঠিবাড়ির বাবুর সঙ্গে। তারপরে যখন সকলে জানতে পারল কুঠিবাড়ির বাবুটি জোড়াদীঘির বাবুদের বাড়ির ছেলে, তখন সকলের আনন্দের সঙ্গে মিশ্রিত হল স্বস্তির নিঃশ্বাস। জোড়াদীঘির সঙ্গে আজ অনেকদিন ধরে রক্তদহের মামলা মোকর্দমা লাঠালাঠি মারামারিতে সকলে অস্থির হয়ে উঠেছিল, এবার বুঝল যুদ্ধপর্বের পরে এবারে শান্তিপর্ব। বুড়োরা বলল, এবার আপদ চুকে যাবে মনে হচ্ছে। আর কি আমাদের লাঠি ধরবার বয়স আছে। জোয়ানরা বলল এবারে মন দিয়ে চাষবাস করতে পারব। আর সকলে মিলে বারোয়ারীতলায় বসে তামাক পোড়াতে পোড়াতে বিচার শুরু করল। জিত হল কার—রক্তদহের না জোড়াদীঘির? কেউ বলল, জোড়াদীঘির সম্পত্তি আবার ফিরে পেল জোড়াদীঘি। এই কথা শুনে একজন

বলে উঠল, শুধু কি তাই, সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা। আর একজনের মতে আসল জিত হয়েছে রক্তদহের।

কেন?

চন্দনীর মতো মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজতে হল না। পাত্র আপনি এসে উপস্থিত হল।

একজন প্রাচীন লোক বলে উঠল, তোমরা সব ছেলেমানুষ, সেকালের কথা কিছুই জানো না। জোড়াদীঘির বাবুদের বাড়িতে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল ইন্দ্রাণী মায়েব। দেখ বিধাতার লীলা, তারই মেয়ে বউ হয়ে চলল জোড়াদীঘিতে।

একজন ছোকরা শুধালো, আচ্ছা সে বিয়ে ভেঙে গেল কেন?

সে অনেক কথা, আর এক সময় বুঝিয়ে বলব, এখন থাক।

থাকবে কেন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে পরগণা দুটোর জন্যে এই বিবাদ, যার ধন তার হাতে ফিরে গেল। হরি হরি বলো সবে পালা হল সায়। জোড়া-দীঘি রক্তদহ এখন সমান সমান। আমাদের ভাগ্যে এখন দই সন্দেশ মিষ্টান্ন।

অপর একজন সূত্র টেনে নিয়ে বলল, ছাই পড়ল দৌলতপুরের ঈশান রায়ের ভাগ্যে।

দেখা গেল এ বিষয়ে সকলেই একমত, সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

লোকটা শয়তানের জাশু, করেছে কি জানো, আড়াইকুড়ি পরগণার কয়েক-জন বেশ বোকা লোককে হাত করে নিয়ে বলেছে তোমরা আমার দিকে এসো, তোমাদের প্রত্যেককে তিরিশ বিঘা করে জমি লাখেরাজ করে দেব। তারা তো শুনে নেচে উঠল। মনে থাকে যেন, এখন যাও, কথাটা পাঁচকান করো না। তারা যখন বলল, হুজুর, এখন খরচপত্রের জন্য নগদ কিছু দিতে আজ্ঞা হয় তখন ঈশান রায় করল কি জানো, প্রত্যেকের হাতে তিন সালের খাজনার দাখিলা দিয়ে বলল, এখন এই নিয়ে যাও, পরগণা হাতে এলে আরও দেবো।

তা ভাই, তুমি এত কথা জানলে কি করে? তুমিও কি লাখেরাজের আশায় গিয়েছিলে নাকি!

তা কেন, ওদেরই একজন একখানা সেই দাখিলা নিয়ে রক্তদহের হাটে সওদা করতে এসেছিল, মাছ কিনে দাম দিতে গিয়ে ঐ দাখিলা বের করে দিল, তখনই সব জানাজানি হয়ে গেল। মেছুনী বলল, এ কি, টাকা কোথায়? লোকটা বলল, এই তো কারেন্সি নোট। ঐ কারেন্সি নোট শব্দটা ঈশান রায় ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

লোকে এমন বোকাও হয়!

টাকার লোভে বোকা হয় ভাই, টাকার লোভ বড় লোভ।

তা এখন ঈশান রায় কি করবে?

কি আর করবে, বেগুনপোড়া দিয়ে ভাত খাবে।

অপর একজন বলল, তা কেন, তার পাটহাতীতে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে।

পাটহাতী তো একবার রানীদীঘির জল পেট ভরে খেয়ে গিয়েছে।

ঈশান রায়ের পেটেও দু'চার ঢোক গিয়েছে।

না ভাই, লোকটা অত সহজে ছাড়বে না। অনেক দিনের লোভ ঐ পরগণা দুটোর উপরে। ভেবেছিল মেয়েছেলের সম্পত্তি, মারামারির ভয় দেখালেই ছেড়ে দেবে।

এখন যখন দেখবে দর্পনারায়ণ বাবুজির নাতি মালিক হয়েছে—তখন কি করবে?

কি আর করবে, পাটহাতীতে চেপে দেশান্তরী হবে।...

এই তো গেল পুরুষ মহলের কথা।

আর গাঁয়ের মেয়েরা খবরটা শুনবামাত্র অমনি সমস্বরে উলুধ্বনি দিয়ে উঠল আর সকলের উল্লাসরবে মনে হল পাড়ায় ডাকাত পড়েছে।

ও দিদি, আমার কথাটা শোনো।

আরে তোমার কথা তো সারাজীবন শুনে এলাম। এবার আমার কথা শুনতে হবে। কালকে রাতে আমি গঙ্গাফড়িঙের স্বপ্ন দেখেছি।

কি হয়েছে তাতে?

গঙ্গাফড়িঙের স্বপ্ন দেখলে গাঁয়ে বিয়ে হয়।

বিয়ে তো হয় প্রজাপতির স্বপ্ন দেখলে।

তবে হয়তো প্রজাপতিই হবে। না হলে ভোরবেলা উঠেই বিয়ের খবর পেলাম কেন?

তখন একজন প্রাচীনা মীমাংসা করে দিল, গঙ্গাফড়িঙও যা, প্রজাপতিও তাই—দুই-ই কেষ্টর জীব।

ও কি মোক্ষদা, তুমি চললে কোথায়?

একবার রাজবাড়ি থেকে ঘুরে আসি। চন্দনীর ছেলেবেলায় আমি তার কাঁথা শেলাই করে দিয়েছি, আমার দাবীটা রানীমাকে জানিয়ে আসি।

তখন সকলেরই নিজ নিজ পাওনাগণ্ডার দাবী মনে পড়ে গেল। কেউ কোলে করে ঘুরেছে, কেউ দুধ খাইয়েছে, কেউ মেনা দিয়েছে। দাবীর কি আর অন্ত আছে! তখন সকলে একজোটে রাজবাড়ির দিকে রওনা হল।

সংসারের কর্ত্রী যদি বিধবা হয়, তবে অল্প সময়ে হাতে অনেক টাকা জমে যায়। পরন্তপ রায় গত হওয়ার পরে এই ক'বছরে অনেক টাকা জমেছে ইন্দ্রাণীর হাতে, তাই তিনি দরাজ হাতে চন্দনীর বিয়ের খরচ করবার হুকুম দিলেন দেওয়ানজিকে। চন্দনী তাঁর গর্ভজাত সন্তান না হয়েও গর্ভজাত সন্তানের অধিক; আর এই বিবাহের সূত্রে এমন একজন জামাতা পেলেন জমিদারিতে—ঘনায়মান অশান্তি যে দূর করতে সক্ষম হবে। সর্বোপরি জোড়াদীঘি ও রক্তদহের মধ্যে বহু দিন ধরে বিবাদ চলছিল, তার উপশম হয়ে যাবে। অতএব খরচে কার্পণ্য করলে চলবে কেন? দেওয়ানজির উপর ঢালাও হুকুম আছে অর্থী প্রার্থী অতিথি অভ্যাগত কেউ যেন ফিরে না যায় আর। তাছাড়া বিয়েতে দানের যে ব্যবস্থা হল তেমন কেউ দেখেনি। খবর পেয়ে পাবনা শহর থেকে ব্যাপারীরা এলো বেনারসী শাড়ি, ফরাসডাঙার ধুতি-চাদরের গাদা নিয়ে, গুরুদাসপুর থেকে এলো পিতল কাঁসার তৈজসপত্র, আর তুরন্ত নৌকো পাঠিয়ে দিয়ে গহনা তৈরি করবার জন্যে নিয়ে আসা হল নাটোর বোয়ালিয়া থেকে সেরা সোনারূপোর কারিগরদের এসব বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ও সহায় দয়ারাম চক্রবর্তী।

দয়ারাম বলল, রানীমা, খাট পালঙ্ক চেয়ার আলমারি কলকাতা থেকে আনলে এই যজ্ঞির যোগ্য হত।

ইন্দ্রাণী বলল, তা বটে, তবে নৌকো করে আনতে অনেক সময় লাগবে, এদিকে বিয়ের দিন স্থির হয়ে গিয়েছে বিশে ফাল্গুন, আজ মাঘ মাসের সতেরোই।

তা বটে—বলে দয়ারাম চুপ করল।

কাছেই দেওয়ানজি বসেছিল, বলল, দয়ারাম, তুমি শ্রীহর্ষের সন্তান, কাছের জিনিস দেখতে পাও না। কুষ্ঠে আর তাঁতিবন্দের ছুতোরের কাজ দেখলে কলকাতার ছুতোরের দল হুতোশে মরে যাবে। আমি রানীমাকে পরামর্শ দিয়েছি, সেখান থেকে কারিগর এনে পছন্দমতো বাড়িতে তৈরি করিয়ে নিতে।

ইন্দ্রাণী উভয় পক্ষের কথা শুনে বলল, হ্যাঁ আসবাবপত্র আর অলঙ্কার আমি নিজে নকশা করে বাড়িতে বসিয়ে তৈরি করিয়ে নেবো। আর দেওয়ানজেঠা, আমাদের বাড়িতে অনেকদিন রাজমিস্ত্রির হাত পড়েনি, সব বে-মেরামত হয়ে আছে, সেদিকে একবার নজর রাখবেন।

সেকথা আমার মনে আছে বউমা, আমি ইতিমধ্যেই মিস্ত্রী ও ছুতোরদের কাছে খবর পাঠিয়েছি, তারা এলো বলে।

সেই সঙ্গে আরও একটা বিষয় আছে, বলল ইন্দ্রাণী, জোড়াদীঘির বাড়িটা আজ অনেকদিন অব্যবহারে পড়ে আছে, নিশ্চয় জীর্ণ হয়েছে। আর এক দল রাজমিস্ত্রী পাঠিয়ে দিন সেখানে, যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি করে তুলতে হবে।

এ প্রস্তাব উত্তম, বলল দয়ারাম। এতক্ষণ সে ছটফট করছিল, কথা বলবার সুযোগ খুঁজে। কিন্তু রানীমা—

এমন সময় মোহন এসে প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

এই যে মোহন এসেছ, তোমাকে তলব করে পাঠিয়েছিলাম, দেখো ধুলোউড়ি থেকে সেই মুকুন্দ বুড়োকে নিয়ে আসতে হবে। শুনেছি সে শৈশব থেকে মানুষ করেছে দীপ্তিনারায়ণ বাবাজিকে।

মোহন বলল, একজন পাইক পাঠিয়ে দিলেই চলবে, দেওয়ানজিকে হুকুম করে দিন।

তুমি হাসালে মোহন, সেই বুড়ো মানুষ আসবে কি করে ভেবে দেখেছ!

আজ্ঞে, নৌকোতে।

না, নৌকোতে নয়। দেওয়ানজি পাল্কিবেহারা পাঠিয়ে দেবেন। মনে থাকে যেন দেওয়ানজেঠা।

বেশ আমি সেই ব্যবস্থাই করছি।

রানীমা, আমার আর একটা আরজি আছে।

কি আরজি, বলো বাবা।

ঐ ধুলোউড়ি গাঁয়ে কুসমি নামে একটা মেয়ে আছে, কুঠিবাড়িতে আসত, আপনি তাকে অনেকবার দেখেছেন।

হাঁ হাঁ, খুব মনে আছে; আহা সুন্দর মেয়েটা, এত অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে! ও তো ডাকু রায়ের মেয়ে, না?

হাঁ মা। তাই বলেই জানতাম। তবে ডাকু রায়ের মৃত্যুর পরে তার মায়ের কাছে জানলাম চার-পাঁচ বছরের এই মেয়েটিকে এনে ডাকু রায় নিজের মেয়ে বলে চালিয়ে দিয়ে মানুষ করেছে।

বলো কি, তারপরে বুঝি বিয়ে দিয়েছিল!

না রানীমা, বিয়ে আগেই হয়েছিল। বিয়ের পরেই বিধবা হয়, অলুক্ষণে মেয়ে

বলে কেউ রাখতে চায় না। বাপ-মা আগেই মরেছিল, তখন এক বোষ্টম ওকে নিয়ে আসে, ডাকু রায় তাকে বলে, তুমি বোষ্টম মানুষ, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াও, ওকে মানুষ করবে কি করে? মেয়েটাকে আমাকে দিয়ে দাও। বোষ্টমটি খুশি হয়ে দিয়ে দিল। ও কার মেয়ে কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কেউ জানে না।

আহা, এমন অবস্থাতেও মানুষ পড়ে। এখন ওর না-জানি কি গতি হবে।

গতি এখন রানীমার চরণ।

আচ্ছা আসুক তো, তারপরে দেখা যাবে। দেওয়ানজেঠা ধুলোউড়িতে দু'খানা গাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, আর মোহন তুমি একটা ঘোড়া নিয়ে সঙ্গে যাও, নইলে আসবে কেন?

কিছুক্ষণ পরে দেওয়ানজি ফিরে এলো, জরুরী সংবাদ পেয়ে মাঝেখানে একবার উঠে গিয়েছিল সদর কাছারিতে।

কি খবর দেওয়ানজি? শুধালো দয়ারাম চক্রবর্তী।

খবর আছে—বলে দেওয়ানজি তাকালো ইন্দ্রাণীর দিকে।

কি খবর বলুন?

খবরের ভূমিকা স্বরূপ দেওয়ানজি বলল, শয়তানের মাথার ভিতরটা একবার দেখতে ইচ্ছা করে, এত বুদ্ধিও আসে।

অতিবুদ্ধিই তো দুর্বুদ্ধি, তার মানে দেখো না কেন! রায়গুণাকর কি বলেন নি—সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

দেওয়ানজি ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, পরগণা থেকে কয়েকজন প্রধান এসে জানালো যে ধুলোউড়ির বাড়ি দখল করবার আশায় ঈশান রায় রওনা হয়ে গিয়েছে।

সংবাদের অপ্রত্যাশিততায় সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রথমে কথা বলল ইন্দ্রাণী, হয়তো এটা গুজব, এতখানি সাহস কি হবে লোকটার।

না বউমা, খবর খাঁটি, দলবল নিয়ে যেতে তাকে অনেকেই দেখেছে। লোকটার কানে খবর পৌঁছে গিয়েছে চন্দনী মায়ের সঙ্গে বাবুজির বিয়ে। বুঝেছে পরগণা দখলের আশা এবারে ছাড়তে হল। তাই এখন যতটা পাওয়া যাবে।

তার ধারণা হয়েছে বিয়ের ব্যাপারে সকলে ব্যস্ত থাকবে, অরক্ষিত থাকবে কুঠিবাড়ি—কাজেই দখল করে নেবার এই উপযুক্ত সময়।

আচ্ছা, মোহন কি রওনা হয়ে গিয়েছে?

না, এখনও যায়নি বউমা।

তবে তাকে অপেক্ষা করতে বলুন। আর একবার দীপ্তিনারায়ণকে খবরটা দিন।

দেওয়ানজি উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে সমস্ত খবর শুনে দীপ্তিনারায়ণ এসে বলল, মা, আমাকে একটা ঘোড়া দেবার কথা দেওয়ানজিকে বলুন।

কেন বাবা, ঘোড়া কি হবে?

ধুলোউড়িতে রওনা হয়ে যাব।

সে কি কথা! এই কদিন পরে বিয়ে, এখন তুমি মারামারির মধ্যে যেতে পারবে না।

সে কি হয় মা? আমার বাড়ি ওরা দখল করে নেবে আর আমি এখানে চুপ করে বসে থাকব!

তুমি গিয়ে কি করবে?

ওদের হটিয়ে দিতে হবে।

আমার লোকজন তো যাচ্ছে।

যাক, আমাকে যেতেই হবে।

তুমি কি পারবে?

এটুকু যদি না পারি তবে কি করে আপনার সম্পত্তি রক্ষা করব। না, আমাকে যেতেই হবে।

দীপ্তিনারায়ণের সঙ্কল্প দৃঢ় দেখে বলল, দেওয়ানজি, সেই ব্যবস্থা করুন।

দুটো ঘোড়া বলুন, বলে দয়ারাম।

কেন আর একটা ঘোড়ায় কি হবে?

আমি যাব না নাকি ভাবছেন দেওয়ানজি। শ্রীহর্ষের সন্তান হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবার লোক নয়—আমি যাব বাবুজির সঙ্গে।

তবে সেই ব্যবস্থা করুন। আর মোহন কি রওনা হয়ে গিয়েছে?

না, এখনো যায়নি।

বেশ হয়েছে, আমরা তিনজনে রওনা হয়ে যাই।

লক্ষ্মীজনার্দন তোমাকে রক্ষা করুন, বলল ইন্দ্রাণী। অবশ্য আমাদের লোকজন তোমাদের পিছনে পিছনে যাবে।

চল্ মোহন।

আমি তো তৈরি, দাদাবাবু।

তখন তারা তিনজনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করল।

ইন্দ্রাণী বলল, নারায়ণ, নারায়ণ।

ইতিমধ্যে খবরটা বাড়ির মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে, শুনেছে চন্দনী ও বৃন্দাবনী মাসী।

দীপ্তিনারায়ণ একবার পিছন ফিরে চাইল, চোখে পড়ল তেতলার ছাদের উপরে চন্দনীর কচি মুখখানা। সে মুখ তিলোত্তমার।

২৩

এবারে আমরা কাহিনীর উপসংহারে এসে পড়েছি। ফাল্গুন মাসের ২০শে তারিখে যথানির্দিষ্ট শুভলগ্নে চন্দনীর সঙ্গে দীপ্তিনারায়ণের বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হয়ে গেল। সম্পন্ন হিন্দুঘরের বিবাহ একটা যজ্ঞীয় ব্যাপার। এখনও তার জৌলুস ও আড়ম্বর কিছু কিছু আছে। তবে আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন আরো অনেক বেশী ছিল, আর যে ঘরের কথা বলছি, তার আড়ম্বর রীতিমতো একটা রাজসূয় ব্যাপার ছিল। গ্রামের অতি প্রাচীন ব্যক্তিরাও বলাবলি করতে লাগল যে, এরকম ঠাট-ঠমক, জাঁক-জমক এ গাঁয়ে আর আগে কখনো হয়নি। তারা পরস্পরকে বলতে লাগল, আর হবেই বা না কেন, রক্তদহ ও জোড়াদীঘি এ যে সম্মিলিত ব্যাপার। এই আসরের মধ্যে একজন প্রাচীন ব্যক্তি ছিল, সে বলল যে তার বাবার মুখে শুনেছিল জোড়াদীঘির প্রবল জমিদার উদয়নারায়ণ রায়ের ছেলের সঙ্গে রানীমার বিবাহ যখন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, তখন কী জানি কী কারণে সেই বিয়ে ভেঙে যায়। সেই থেকে জোড়াদীঘি আর রক্তদহের সূত্রপাত হয় বিবাদের। এতদিনে তার সুসমাধান হল। কাজেই একে যজ্ঞীয় ব্যাপার করে তুলতে রানীমা যথাসাধ্য করেছেন।

তার কথা শুনে আর একজন প্রাচীন বলে উঠল, তবে সে কী আজকের কথা! সেদিনের বালিকা রানীমা আজ প্রাচীনা হয়ে পড়েছেন। সংসারে আর থাকবেন না বলে রওনা হয়েছিলেন বৃন্দাবনে।

তার কথার উত্তরে এবারে কথা বলল টোলের পণ্ডিতমশাই।

রওনা হলেই হল, ফিরে তো আসতে হল। আসতে হবে না! বৃন্দাবনের মালিক যে সে শুধু ব্রজবালকদের সখা নয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের সারথীও

বটে। তারপরে একটু থেমে শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা এসব কথা বুঝবে না। পুরাণে সমস্ত বিস্তারিত লেখা আছে।

একজন শ্রোতা বলল, পণ্ডিতমশায়, কেন ব্রজেশ্বর রানীমাকে ফিরিয়ে পাঠালেন?

আরে ঐ তো বললাম, এসব কথা তোমরা বুঝবে না। মুখে কারো বুঝবার আগ্রহ দেখতে না পেয়ে পণ্ডিত বলল, আচ্ছা, না হয় বুঝিয়ে দিচ্ছি। সংসারের কোনো কাজ বাকী ফেলে রেখে তীর্থে যাওয়ার উপায় নেই। সেজন্যেই রানীমা বাধা পেলেন।

আর একজন প্রবীণ শ্রোতা বলল, শুধু কি বাধা পাওয়া? বজরা সেই ঘাটে এনে ভিড়িয়ে দিলেন, যেখানে রয়েছে যার সহায়তায় সাংসারিক কাজ সুসম্পন্ন হবে।

শ্রোতাদের সকলেই পণ্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। তাদের মনে হল এ দেখছি গাঁয়ের টোলে পণ্ডিত রমেশ আচার্য নয়, প্রাচীনকালের কোনো তত্ত্বদর্শী পুরুষ।

তখন একজন জিজ্ঞাসু বলল, আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, ঐ ধুলোউড়ির কুঠিতে যে জোড়াদীঘির দর্পনারায়ণ রায়ের পৌত্র আছে, এ কথা কী করে রানীমা জানলেন?

এসব যোগশাস্ত্রের কথা। যোগচর্চা কর, সংসারে অজানা কিছু থাকবে না।

লোকটি কিঞ্চিৎ অবোধ। বলল, দাদাঠাকুর, আমি পাঠশালায় থাকতে যোগবিয়োগ সমস্ত শেষ করে ফেলেছি। কিন্তু বাবা যে কোথায় পয়সা লুকিয়ে রাখেন জানতে পারলাম না। তার অর্বাচীনের মতো উক্তি শুনে রমেশ পণ্ডিত একটি উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলো, তার বিশ্বাস এ হাসিই একমাত্র উত্তর।

শীতের সকালবেলার রোদ্দুর তখন মধুর লাগছিল। অন্যান্য শ্রোতারা এই উচ্চাঙ্গের আলাপে অভিভূত হয়ে পণ্ডিতের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। তখন আগ্রহী শ্রোতার দল পেয়ে পণ্ডিত যোগশাস্ত্রের এমন ব্যাখ্যা শুরু করল, যা স্বয়ং পুরাণ কর্তাদেরও অগোচর ছিল। পণ্ডিত একবার আড়চোখে দেখে নিল, মজলিশটি বেশ জমেছে। কিন্তু সব চেয়ে জমেছিল শ্রীহর্ষের সন্তান দয়ারাম চক্রবর্তীর আসর। শ্রোতারা সকলেই জানতো যে, দয়ারাম চক্রবর্তী, মোহন দীপ্তিনারায়ণের সঙ্গে রওনা হয়ে গিয়েছিল ঈশান রায়কে প্রতিরোধ করবার

উদ্দেশ্যে, ধুলোউড়ির কুঠির দিকে। এই আসরে তিনজন লোকের নাম উল্লেখ করলেই চলবে। মোহন, মুকুন্দ আর দয়ারাম চক্রবর্তী স্বয়ং।

মোহনের সঙ্গে রক্তদহের সকলেরই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। মুকুন্দই এই প্রথম এলো রক্তদহে। তবে এই কদিনে সেও পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এ আসরের অধিকাংশ শ্রোতাই অল্পবয়স্ক। তারা গল্প শুনতে চায়। রমেশ পণ্ডিতের আসরের শ্রোতাদের মতো তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তাদের আগ্রহ নেই।

জমিয়ে গল্প বলতে পারে বটে দয়ারাম চক্রবর্তী। সে বলছে, তবে শোনো ব্যাপার কী হয়েছিল, আমরা তো গিয়ে পৌছলাম, ভাবলাম, না জানি কত লাঠি সড়কি বরকন্দাজ নিয়ে ঈশান রায় আমাদের আগে গিয়ে পৌছেছে। ওমা! গিয়ে দেখি জনপ্রাণী নেই। তখন বল তো কী করলাম আমরা?

একজন ছোকরা বলে উঠল, আমরা কী করে বলব? গিয়েছেন আপনি, আপনিই বলুন।

আরে বলব তো আমি বটেই।

তবে আর আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

আহা, বুঝলে না, গল্পের চেয়ে গল্পের মুখপাতটার দাম বেশী। মুখপাতটা জমিয়ে নিতে পারলে তারপর আর গল্পের ভাবনা নেই।

আমাদের আদি পুরুষ শ্রীহর্ষ নাগানন্দ নাটক লিখেছিলেন। কাজেই লিখবার অভ্যাসটা আমরা—তাঁর সন্তানেরা জানি।

সেই ছোকরাটি আবার বাধা দিয়ে বলল, আপনার পূর্বপুরুষের কাহিনী এখন থাক। ঈশান রায় কী করল খুলে বলুন।

তোমার মতো ব্যস্তবাগীশ লোককে গল্প শোনানো যায় না। এই দেখ তো. মুকুন্দদা আর মোহন কেমন শান্ত হয়ে বসে আছে।

সেই ছোকরাটি আবার বলল, আহা, তারা তো সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বচক্ষে সমস্ত দেখেছেন। তাই আর ছটফট করবেন কেন?

দেখুন তো মুকুন্দদা, আপনি প্রাচীন লোক। একটা বিচার করে দিন।

মুকুন্দ বলল, ওসব অর্বাচীনদের কথা ছেড়ে দিন—আপনি বলে যান।

শুনলে তো ছোকরা, এই হল প্রাচীন অর্বাচীন প্রভেদ।

সকলকে নিরুত্তর দেখে চক্রবর্তী আবার শুরু করে দিল, আমাদের ঈশান রায়ের সঙ্গে হাতী আছে শুনে আমাদের লোকজন ভয় পেয়েছিল। আমি বললাম, মাভৈঃ!

শ্রোতাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, ওটার কি অর্থ হল ?

অর্থ আর কি, ভয় পেয়ো না।

তা ওটা বাংলা ভাষায় বললে কি চলত না ?

অর্থ হত, কিন্তু এমন শব্দ হত কি ! যেন বন্দুকের আওয়াজ হল। মাভৈঃ ! সংস্কৃত ভাষার তাগদই আলাদা। আচ্ছা নাও, শোন। একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম হাতীর উপরে স্বয়ং ঈশান রায়, পাশে বসে আছে একজন পাইক, হাতে মস্ত এক নিশান। আমি শুধালাম—আপনি কে বটেন ?

উল্টে লোকটা বলে কিনা, তার আগে তুমি বলো কে বট ? কেমন, ঠিক ঠিক বলছি না কি মোহন ভাই !

হাঁ হাঁ, ঠিক হচ্ছে।

এ তো কেবল আপনার কথাই বলছেন, যাঁর কারপরদার হয়ে আপনি গিয়েছিলেন সেই দাদাবাবু তখন করছিলেন কি ?

আরে এটা আর বোঝো না, দাদাবাবু বিয়ের বর, আজ বাদে কাল বিয়ে, তাঁকে কি লড়াইয়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়া উচিত। আমি আর মোহনভাই যুক্তি করে বিলের ধারে এক সম্পন্ন চাষীর বাড়িতে বসিয়ে রেখে এগিয়ে গেলাম। বলে গেলাম, এখানে একটু বিশ্রাম করুন। আমরা লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আসি। এই কথা শুনে তিনি বললেন, আমাদের লোকজন এখনো এসে পৌছোয়নি, তোমরা দুজন খালি হাত-পায়ে গিয়ে কী করবে ? আমি বললাম, চুপ করে বসেই দেখুন না কী করি !

তিনি বললেন, ওর যে আবার একটা হাতী আছে বলে শুনছি।

সেই তো ভরসা। আমাদের আছে মাঠভরা শেয়াল। আগে সন্ধ্যা হোক, তারপরে বাঘের খেলা আরম্ভ হবে। কী মোহনভাই, সব ঠিক বলছি তো ?

মোহন বলল, সব ঠিক আছে।

সেই ছোকরাটি মুখপাতের দৈর্ঘ্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। সে বলল, নাগানন্দ নাটক শুনবার শ্রোতা পাওয়া যেত কী ? আমার তো মনে হয় মুখপাতের পরেই আসর ভেঙে যেত।

এমন সময়ে 'শয়তান' বলে হঠাৎ এমন উৎকট চিৎকার করে উঠল যে শ্রোতারা চমকে গেল।

'তবে রে শয়তান' বলে আবার গর্জন করল দয়ারাম।

শ্রোতাদের অনেকে রাগে চিৎকার করে উঠল। বলল, গল্প শোনাতে বসেছো বলে গালাগাল দেবার অধিকার তোমার নেই।

তখন মুহূর্তমধ্যে গলার স্বর নীচু ও মোলায়েম করে বলল, আহা, এসব গালাগালি সে-ই পাইকটাকে দিয়েছিলাম, তোমাদের সঙ্গে কী আমার গালা-গালির সম্পর্ক!

এই কথা শুনে কেউ কেউ বলল, এই সরল বিষয়টা কি আমরা বুঝতে পারিনি ভাবছেন? নিন, এখন বলুন।

কুঠীবাড়ির কাছে পৌছে দেখি মুকুন্দদা একটা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডেকে বললাম, মুকুন্দদা, নামটা আগেই মোহনের কাছ থেকে শুনে নিয়েছিলাম, আমরা রক্তদহের রাজবাড়ি থেকে আসছি, আমরা দাদাবাবুর লোক, দাদাবাবুও এসে পৌছোলেন বলে। আর যাই করো তোমার ঐ হাতের বন্দুকটা ছুঁড়ো না বাপু। বন্দুক-কামানের এমন বেয়াড়া অভ্যাস যে, একেবারেই এফোঁড় ওফোঁড় না করে ছাড়ে না।

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, তোমার ঐ মা ভাঁয়সা শুনে ঈশান রায় কী করল?

ঈশান রায় তো আমার মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নয়। হবেই বা কী করে?' কজন আর শ্রীহর্ষের সন্তান?

সে চিৎকার করে পাইককে বলল, দেখ্ তো বজ্জাতটা কী বলছে!

পাইক উত্তর দেবার আগেই আমি বললাম, এখানে শুভাগমন কেন? আর তোমার বরকন্দাজ লাঠিয়ালগুলোই বা কোথায়?

ঈশান রায় হাতীর উপর দাঁড়িয়ে উঠে বুকে চাপড় মেরে বলল, কিছু দরকার হবে না, আমি একাই একশো।

আমি বললাম, তোমারও দরকার হত না, শুধু হাতীটাকে পাঠিয়ে দিলেই চলত। মনে নেই একবার রানীদীঘির জল খেয়েছিলে? আজ বুঝি আবার বিলের জল খেতে এসেছ?

আমার কথা শুনে ঈশান রায় হাতীর উপরে দাঁড়িয়ে উঠে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল। ওরে হস্তিমূর্খ, আজই হাতীর পায়ের তলাতে তোর মৃত্যু লেখা! তখন মাহুতকে হুকুম দিল, হাতীটাকে নিয়ে চড়াও হতে আমাদের উপরে।

হাতী চলতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময়ে সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল হাতীর ভাবগতিকের পরিবর্তন। জন্তুটা

আমাদের দিক থেকে ফিরে বিলের দিকে ধাবমান হল। ঈশান রায় বলল, ও মাহুত, পাটহাতী চললো কোথায় ?

হুজুর, শেয়ালের ডাক শুনেছে যে !

তাই তো, মুশকিল হল দেখছি। ওর কানে যাতে শিয়ালের ডাক না ঢোকে সেইজন্য যে কাপড়ের পুঁটলি দুটো তৈরি করা হয়েছিল, সে দুটো গেল কোথায় ?

সে তো, কর্তা, ফেলে এসেছি।

ফেলে এসেছিস, বটে ! রাজার হুকুম অমান্য—পাইক, মাহুতকো পাকড়াও !

আর পাইক ! শিয়াল ডেকে উঠতেই পাইক একলাফে হাতীর পিঠ থেকে সরে পড়েছিল। কারণ সে হাতীর স্বভাব জানত। ওদিকে মাহুত ঈশান রায়ের উদ্দেশে সতর্কবাণী প্রচার করতে লাগল, কর্তা, সরে পড়ুন। হাতীটা দামাল হয়ে উঠেছে। বিলে গিয়ে পড়ে কি—কি করে—ঠিক নেই !

তবে তুমি কি করতে আছ ?

মাহুত আর্তকণ্ঠে বলল, আমি না থাকবার মতোই। সামনেই এই গাছটার ডাল ধরে ঝুলে পড়ব—আপনিও চেষ্টা করুন।

ঈশান রায় বলল, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, পাটহাতীর পিঠ থেকে নামছি না।

ঈশান রায়ের ধারণা ছিল, শিয়ালের ডাক এখন থেমে যাবে। কিন্তু থামবার বদলে সে ডাক ক্রমেই উচ্চ ও দীর্ঘস্থায়ী হতে লাগল।

হাতীটা পাগলের মতো হয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ছুটতে শুরু করল। তখন চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সে অন্ধকারের মধ্যে হাতীটা এসে নেমে পড়লো বিলের মধ্যে।

এখন একটা কথা আগে বলে নিই, বলবার দরকার হয়নি বলে বলিনি। বলবার দরকার হলে বলব আশায় হাতে রেখে দিয়েছিলাম। এই বিলের মধ্যে একটি জায়গায় গভীর চোরাবালি ছিল।

সে জায়গাটি ধূলিয়াড়ি গ্রাম ও কুঠিবাড়ি থেকে অনেকটা দূরে।

বাস, এইবারে আমাকে বলতে দাও চক্কোত্তি মশায় ! বলে উঠল মোহন। এতক্ষণ যা বলছিলে তোমার দেখা ও জানা। কিন্তু এবারে ঐ চোরাবালিটার কথা আমি বলি, কারণ ওটা আমার জানা।

নিতান্ত হতাশ হয়ে চক্রবর্তী চুপ করল। চক্রবর্তীকে চুপ করতে দেখে শ্রোতাদের একজন বলল, চক্কোত্তি মশায়, আপনিই বলুন !

অপর একজন শ্রোতা বলল, বলি মোহনভাই, চক্কোত্তি মশায়ের মতো এমন রসান দিয়ে কি বলতে পারবে? আর অমন মুখপাত! তোমার বলা তো জানি, হাতীটা জলে পড়ল আর ডুবে মরে গেল! ওভাবে রোদ পোয়াতে পোয়াতে গল্প হয় না।

তখন শ্রোতাদের সমর্থন পেয়ে চক্কোত্তি বলল, তা যখন তোমাদের ইচ্ছা, আমিই না হয় বলি।

মোহন ভাঙে তবু মচকায় না, বলল, চোরাবালির বর্ণনাটুকু আমি না হয় করি, তারপর কি ঘটল তুমি বলো।

সেই ভালো, সেই ভালো—বলে উঠল শ্রোতার দল।

মোহন শুরু করল, যোয়াড়ি গ্রাম থেকে খানিক উজানে বিলের মধ্যে—এক জায়গায় চোরাবালি ছিল, যেমন প্রকাণ্ড তেমনি গভীর। ভয়ে ওদিকে কেউ যেত না। দলছাড়া গরু বাছুর ওখানে গিয়ে জল খেতে নামলে এমন নিশ্চিহ্ন ভাবে তলিয়ে যেত কেউ জানতেও পারত না। একদিন ওদিক দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আছে চারখানা হাঁটু অবধি ঘোড়ার পা। এই দৃশ্য দেখে গা শিউরে উঠল। আস্ত ঘোড়াটাকে ডুবতে দেখলে অতটা ভয় পেতাম না। অমনি ফিরে এসে দু-চারজনকে ডেকে নিয়ে গেলাম দেখাবার আশায়, দেখি কই কিছু নেই! তখন তারা বলল, মোহনদা ক্ষেতের কাজ নষ্ট করে এলাম, এখন দেখছি সত্যি সময়টা নষ্ট হল, তুমি চোখে কি দেখতে কি দেখেছো!

আরে ভাই আমি কি ঘোড়ার পা চিনি না! এই দেখো ভয়ে এখনো গা কাঁপছে! তার পর থেকে ওদিকে যাওয়া গাঁয়ের লোক ছেড়ে দিল। আগে লোকের গোরু বাছুর হারালে লোকে ভাবত বাঘে ধরে নিয়ে গিয়েছে—এখন বুঝতে পারা গেল হতভাগা জন্তরা জল খেতে নেমে চোরাবালির গ্রাস হয়েছে। নাও এইবার বলো চক্কোত্তি মশায়, আমার মুখপাত সারা হল।

মোহনের নিয়মনিষ্ঠায় চক্কোত্তি খুশি হল, বলল, এই তো মরদকি বাৎ, যেমন কথা তেমনি কাজ।

আর হাতীকা দাঁত বাদ দিলে কেন?

ঈশান রায়ের পাটহাতীটার দাঁত নেই বলে। নাও, এখন শোনো। তখন মাহুতের অঙ্কুশ না মেনে, ঈশান রায়ের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে অন্ধকারের মধ্যে হাতী ছুটেছে। ততক্ষণে আমাদের লোক, ঈশান রায়ের লোক

এসে গিয়েছে। আমরা সকলে মশাল জ্বালিয়ে ছুটেছি—কি হল কি হল বলতে বলতে। কিছু দূরে যেতেই দেখি যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে, হাতীটা ছুটেছে বিলের দিকে ঐ চোরাবালির মুখে। আমাদের সোরগোল শুনে আর মশালের আলো দেখে আরো জোরে ছুটেছে হাতী। তখন সকলে 'মাহুত, মাহুত' বলে ডাকাডাকি শুরু করল।

সকলে মশালের আলোয় তাকিয়ে দেখে হাতীর উপর মাহুত নেই। তখন রব উঠল, মাহুত কোথায় গেল, মাহুত কোথায় গেল ? এই কথা শুনে মাথার উপর থেকে মাহুত বলল, বাবু, আমি এইখানে। সবাই শুধালো, ওখানে কী করে গেলে ?

হাতীটা তো বিলের মধ্যে গিয়ে পড়বে। তাই আমি প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই বটগাছের ডাল ধরে ঝুলছি।

আর তোমাদের পাইক গেল কোথায় ?

লোকটা তো এইখানেই ছিল বোধ করি। ঐ তেঁতুল গাছটার ডাল ধরে ঝুলে পড়েছে।

আর তোমাদের রাজাবাবু ?

কী আর বলব ! তিনি তো হাতীর উপরেই আছেন।

কিন্তু হাতীটা কোথায় ?

ঐ তো, বিলের ধারে গিয়েছিল, এতক্ষণে বোধ হয় জলের মধ্যেই নামলো।

এই কথা শুনে আমাদের দলের মধ্যে ধুলোউড়ির যে কয়জন প্রাচীন ব্যক্তি ছিল, এই মুকুন্দদাও তাদের একজন, বলে উঠল, কী সর্বনাশ ! এখানেই যে সেই সর্বনেশে ঘোড়ামারার চোরাবালি। হাতীটা একবার গিয়ে নেমে পড়লে তো আর রক্ষা নেই !

হাতীটা হয়ত শেষ পর্যন্ত না নামতেও পারত, কিন্তু এতগুলো লোকের সোরগোল শুনে আর মশালের আলো দেখে ছুটে গিয়ে পড়ল সেই সর্বনাশা চোরাবালির মধ্যে।

ওরে রাখ রাখ, থাম থাম, রাজা মশায় নেমে পড়ুন, নানা রকম রব উঠল। কিন্তু কে কার কথা শোনে ? লোকে তখন হাতীটা ছেড়ে মানুষটার প্রতি নজর দিল। কিন্তু মানুষটার তখন তুরীয় অবস্থা, সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে লেগেছে। ঈশান রায় আওড়াচ্ছে, নবম একং মাসং যাতি, দ্বৌ মাসৌ মৃগ-শূকরৌ, অহিরেকং দিনং যাতি, অল্পভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণঃ।

ইতিমধ্যে চোরাবালিতে হাতীর পেট পর্যন্ত ঢুকেছে। যতই সে হাঁসফাঁস করছে ততই সে তলিয়ে যাচ্ছে। সকলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। করবার কিছু নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা অনিবার্য পরিণামের মধ্যে তলাতে লাগল।

চোখের উপর এই ভয়াবহ ব্যাপার দেখে সকলে স্থাণুবৎ হয়ে গিয়েছিল। এতগুলো লোক, কিন্তু কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

অনতিকালমধ্যে পাটহস্তী ও রাজাবাহাদুর সেই চোরাবালির গ্রাসে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু অদৃশ্য হবার আগের মুহূর্তে একটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারিত হল তার মুখে। তুরীয় অবস্থা আর কাকে বলে!

এমন সময় রাজবাড়ির জন-দুই লোক তিন-চার ভাঁড় খেজুরের রস নিয়ে উপস্থিত হল। তখন আর চক্রবর্তীর পক্ষে আসর জমানো সম্ভব হল না। গেলাস-ভর্তি শীতল বাস্তব রসের কাছে হার মানলো শ্রীহর্ষ-সন্তানের কাহিনীর রস।

২৪

মা, ঈশান রায়ের সঙ্গে লড়াইয়ের বিবরণ শুনতে যদি চাও, এর ওর কাছে জিজ্ঞাসা না করে লড়লো যারা তাদের ডেকে নিয়ে বসো।

এই কথা বলে দীপ্তিনারায়ণ প্রবেশ করল ইন্দ্রাণীর খাস কামরায়।

এসো বাবা, বসো—বলে একখানা চৌকি দেখিয়ে দিল তাকে।

তোমরা, অনেক লোক তো গিয়েছিলে, কতজনকে জিজ্ঞাসা করব?

দীপ্তি বলল, রাজবাড়ির, পাইক-বরকন্দাজ পৌঁছবার আগেই লড়াই ফতে হয়ে গেল।

তবে তারা কী করছিল? তারা কি তখনো এসে পৌঁছোয়নি?

আমি সব গুছিয়ে বলতে পারব না।

এই মোহন, ভিতরে এসে কেমন লড়াই করলি রানীমাকে বুঝিয়ে বল্।

মোহন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, ভিতরে এসে ইন্দ্রাণীকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

বল তো বাবা, কী হয়েছিল?

মোহন শুরু করল, ঈশান রায়ের যে পাটহাতী রাজবাড়ি আক্রমণ করতে এসে পেট ভরে রানীদিঘীর জল খেয়েছিল, সেই পাটহাতীতে চেপেই কুঠিবাড়ি

লুট করতে গিয়েছিল ঈশান রায়। সে হাতীর অনেক গুণ, মা। সেটা একটা চোখে দেখতে পায় না, আর একটা কানে শুনতে পায় না, আর শিয়ালের ডাক শুনে বাঘের ডাক মনে করে।

বিস্মিত ইন্দ্রাণী বলে, তবে এমন হাতী রাখা কেন?

সে কথা বলে কে মা? ঈশান রায়ের লোকজন সবাই বলেছে, হুজুর হাতীটা বাদ দিয়ে চলুন, লুঠতরাজ সব আমরা নিষ্পত্তি করে দিচ্ছি।

ঈশান রায় শুনবে না। রাজা আছে, হাতী নেই, এ কি হয়?

ধুলোউড়িতে পৌছোতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে যেতেই মাঠে মাঠে শিয়াল উঠল ডেকে। আর অমনি হাতীটা লেজ তুলে, শুঁড় তুলে, বিকট আওয়াজ করতে করতে ছুটল। ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, তবে লড়াই হল কোথায়?

গোড়াতেই যেখানে হাতী পালায়, সেখানে আর লড়াই করবে কে?

মাহুতে থামাতে পারল না?

মাহুত কোথায় মা? সে একটা বটগাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল।

আর ঈশান রায়?

ঈশান রায় হাওদা চেপে ধরে পিঠের উপরে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

আর, তোমরা কী করছিলে?

আমরা কি হাতীর সঙ্গে দৌড়ে পারি?

তা এমন হাতীটা গেল কোথায়?

আর কোথায়! হাতীটা প্রাণভয়ে বিলের মধ্যে যেখানে গিয়ে নামল, সেখানে মস্ত একটা চোরাবালি ছিল। সেই চোরাবালিতে গাঁয়ের কত গরু ছাগল ঘোড়া ডুবে মরেছে। এখন হাতীর ওজন তার উপরে গিয়ে পড়লে কী আর রক্ষা আছে? নিমেষের মধ্যে হাতী তলিয়ে গেল।

আর ঈশান রায়?

তার আর ফিরবার উপায় ছিল না। পাটহাতীর সঙ্গে সেও তলিয়ে গেল।

কী সর্বনাশ! বলে কপালে হাত দিল ইন্দ্রাণী। তারপরে দীপ্তিনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করল, তখন তুমি কোথায় ছিলে বাবা?

উত্তর দিল মোহন, দাদাবাবুকে কী কাছে যেতে দিয়েছি?

হ্যাঁ মা, আমাকে ওরা দূরে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে নিজেরাই গিয়েছিল। তাই মজাটা দেখতে পেলাম না।

একে মজা বল, বাবা? একটা মানুষ আর একটা অত বড় জানোয়ার ঐ ভাবে মারা গেল, কোনো সদ্‌গতি হল না।

নেহাৎ দুর্গতিও হয়নি। ওদের মুখে শুনলাম, ঈশান রায় তলিয়ে যাবার সময় কী একটা সংস্কৃত মন্ত্র পড়ছিল।

সমস্ত বিবরণ শুনে কিছুক্ষণ ইন্দ্রাণী চুপ করে রইল। তারপরে মুকুন্দর দিকে তাকালো—বলল, মুকুন্দ, তুমি চুপচাপ বসে আছ, কিছু তো বললে না!

মুকুন্দ গলাটা পরিষ্কার করে বলল, রানীমা, এখন আর বলতে চলতে পারি না, সারাদিন চুপ করেই বসে থাকি। এমনি ভাবে থাকতে থাকতেই সব শেষ হয়ে যাবে, তখন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিলের ধারে পুড়িয়ে আসবে।

তার চেয়ে চল না কেন আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে, সেখানে যদি ব্রজেশ্বর তোমাকে কৃপা করেন তাহলে যমুনার নীল জলে তোমায় ভাসিয়ে দেব।

না কর্তামা, ধুলোউড়ি কুঠি ছেড়ে আমার নড়বার হুকুম নেই।

কার হুকুম মুকুন্দ!

কার আবার, কর্তাবাবুর। তাঁকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি জোড়া-দীঘিতে, তিনি যখন ধুলোউড়ির কুঠিতে এসে বসলেন, আবার দীপ্তিনারায়ণ-বাবুকে কোলেপিঠে করে মানুষ করবার ভার পড়ল আমার উপরে। শেষের দিকে প্রায়ই বলতেন, মুকুন্দ, দুজনেরই তো বয়স হল, কে আগে যাবে ঠিক নেই, যদি আগে আমি যাই, তোমার উপর ভার থাকল দীপ্তিকে মানুষ করবার আর এই কুঠিবাড়ি রক্ষা করবার। তারপরে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যাওয়ার কথা তো আগে আমার কিন্তু সব ওলোটপালোট হয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বলল, দাদাবাবুর তো এখন বিয়ে হয়ে গেল। কদিন বাদে চলে যাবে জোড়াদীঘিতে, এখন আর তোমার ভাবনা কি?

মুকুন্দ বলল, কিন্তু কুঠিবাড়িটা? এই তো সেদিন ঈশান রায় লুট করতে এসেছিল।

তেমনি সাজাও পেয়েছে।

তবেই তো···

না, আর দোমনা করো না।

তার চেয়ে কর্তামা এক কাজ কর, ঐ কুসমী মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। মেয়েটার মা বাপ ভাই বন্ধু কেউ নাই। কোথায় ওর বাড়ি, কোথায় ওর বংশ কেউ জানে না। ডাকুরায় শৈশবে ওকে কোথা থেকে এনে মেয়ের মতো পালন

করেছিল, সেই থেকে ও ডাকুরায়েরই মেয়ে। সেই থেকে ওকে ডাকুরায়ের মেয়ে বলেই জানে, এখন সে আশ্রয়টুকুও গেল। এখন ওর আশ্রয় হবে তোমার কৃপায় রাধামাধবের চরণতলায়।

ইন্দ্রাণী বলল, কথাটা বৃন্দাবনী মাসীও বলেছে। দুইজনে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, ধুলোউড়িতে থাকতে। কত পদ শিখেছিল। বৃন্দাবনী প্রায়ই বলত —কর্তামা ওর গলা কি মিষ্টি। ওকে নিয়ে চল বৃন্দাবনে। আমার ইচ্ছা ওকে দিয়ে রাধামাধবকে গান শোনাবো। এমন সময় দেওয়ানজি এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। বলল, বৌমা, বোধ করি অসময়ে এলাম।

না দেওয়ান জেঠা, আপনি তো জরুরী কাজ ছাড়া আসেন না।

এমন কিছু জরুরী নয়। চন্দনী দিদির শুভ বিবাহ উপলক্ষে যে সব দান-খয়রাত হয়েছে, তারই একটা তালিকা—বলে ফর্দ আকারে লম্বা কতগুলো কাগজ এগিয়ে দিল।

এ যে এক দিস্তা কাগজ দেখছি!

হবে না মা, যে রাজসূয় যজ্ঞ করেছ! এমন এদেশে কখনো হয়েছে বলে লোকে জানে না।

আচ্ছা তবে ভালো করে তুলে রাখুন।

না না মা, তা হয় না, নিজের চোখে একবার দেখা উচিত।

তবে আপনি পড়ুন, চশমাটা আমার কাছে নেই।

সেই ভালো, আমি পড়ি তুমি শোনো। এই বলে দেওয়ানজি একখানি চৌকিতে বসল, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

দেওয়ানজি আরম্ভ করল, 'চন্দনী' মাতার শুভবিবাহে দানধ্যান প্রভৃতি হরিয়েক খরচের বিবরণ।

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীজনার্দন বিগ্রহের মন্দির মেরামত ও নূতন রূপোর সিংহাসন বাবদ—৫০০০১৲।

গুরুপ্রণামী—১১ খান মোহর।

কুলপুরোহিত প্রণামী—৫ খান মোহর।

গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীহিতার্থে দান—৫০১৲।

গ্রামস্থ তিন পাঠশালার হিতার্থে—৩০১৲।

গ্রামস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঔষধ খরিদ বাবদ—১০১৲।

সরকারী অতিথিশালায় দান—৫০১৲।

সদর কাছারি দেওয়ানজিকে দান—হীরার আংটি, কাশ্মীরী শাল ও গরদের ধুতিজোড়।

ভাদুড়ী মহাশয়ের সোনার আংটি ও গরদের ধুতিচাদর।

দয়ারাম চক্রবর্তী বাবদ সোনার আংটি, গরদের ধুতিচাদর।

সদর কাছারি তথা মফঃস্বলের কাছারিসমূহের নায়েব, পেস্কার, জমারনবিশ, সুমারনবিশ, কারকুন, পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ প্রভৃতির চাকুরিকালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী প্রত্যেককে দু'মাসের বেতনের সমতুল্য অর্থদান।

পরগণাসমূহের প্রধান পরামাণিকগণের পারিতোষিক—১০০১৲ করিয়া।

রাজবাড়ির পেয়াদা, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল প্রভৃতি প্রত্যেককে ১০১৲।

হরিয়েক বারবরদারী বাবদ—৫০০০৲।

বিবাহের কয়দিন রোশনাই ও আতসবাজি বাবদ—২৫০০৲।

পরগণা হইতে আগত প্রজাদের ভোজের জন্য খাসি খরিদ—৮৫টি।

তিন রাত্রি যাত্রাগানের, পাঁচালীপাঠের খরচ বাবদ ৩০০০৲।

কলিকাতা হইতে আগত মিনার্বা থিয়েটারের অভিনয় প্রদর্শনের খরচ ও তাহাদের যাতায়াতী খরচ সাকুল্যে ১০,০০০৲।

কাঙ্গালীভোজন ও বস্ত্রবিতরণ ৫০০০৲।

সমাগত পণ্ডিতগণের বিদায়ী—২৫০০৲।

জামাতা বাবাজীর পালনকর্তা মুকুন্দ পাইকের নগদ দেনা—১০০১৲।

ঐ কারপরদার মোহন চাকাকে নগদ দেনা—৫০১৲।

বৃন্দাবনী মাসীর গরদের থান, হরিনামের মালা, নূতন খঞ্জনী, ধুলোউড়ি গ্রামের কুসমী নামে বালিকার গরদের থান ও হাতখরচ বাবদ ৫১৲।

এই সুদীর্ঘ তালিকা যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি ক্লান্তিকর। শুনতে শুনতে ইন্দ্রাণী বলে উঠল, দেওয়ান জেঠা, আপনার তত্ত্বাবধানে কোনও কিছু বাদ পড়েনি দেখছি। চারদিকে আপনার দৃষ্টি পড়েছে দেখছি।

দেওয়ান জেঠা বলল, এখনও তো শেষ হয়নি মা। এই তালিকার অর্ধেক মাত্র হয়েছে।

তবে এখন থাক, ওবেলা আবার শুনব। কিন্তু একটা দুঃখ থেকে গেল দেওয়ান জেঠা। জোড়াদীঘি থেকে কেউ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বা বিবাহে যোগ দিতে এল না।

আমাদের কোনও দোষ হয়নি, আমরা যথারীতি পুরোহিত ঠাকুরকে পাঠিয়ে

তাদের নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছি, পাছে তারা বলে নিমন্ত্রণটা স্বশ্রেণীর হাত দিয়ে এলো না—তাই বেছে বেছে পুরোহিত ঠাকুর ও টোলের একজনকে পাঠিয়েছিলাম। মুখে অবশ্য বাবুরা যাব না একথা বলেনি, বলেছিল, আপনারা এগোন আমরা আসছি।

তবে তো আপনি যথাবিহিত কাজ করেছেন। তাদেরই সবচেয়ে আহ্লাদ হওয়া উচিত এ বিবাহে।

বৌমা, সংসারে সবদিক বাঁচিয়ে চলবার যতই চেষ্টা কর, সকলকে কখনো সুখী করা যায় না। পুরাণে বলেছে—ইন্দ্রের হাজারটা চোখ। সেই হাজারটা চোখকেও ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু যিনি সর্বতোচক্ষু সেই তাঁকে—

তার কথা শেষ হবার আগেই সদর থেকে একজন লোক এসে রানীমাকে প্রণাম করে, দেওয়ানজিকে নিম্নস্বরে কিছু নিবেদন করল। দেওয়ানজি তাকে যেতে বললে সে লোকটি চলে গেল।

তখন ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, বউমা, এবার তোমার দুঃখের কারণ বুঝি শেষ হতে চলল। এইমাত্র লোকটা খবর দিয়ে গেল—জোড়াদীঘি থেকে একজন বাবু এসেছেন।

ইন্দ্রাণী উৎফুল্ল হয়ে বলল, আপনি বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করুন, আমি দীপ্তিনারায়ণকে নিয়ে আসছি।

দীপ্তিনারায়ণ ঘরে ঢুকে চমকে উঠল, এ কি, পার্থ যে! তোমরা ভাই ভারি অন্যায় করেছ, বিয়েতে কেউ এলে না—এখানে সবাই বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বিশেষ করে রানীমা।

পার্থ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কোথায়?

তিনি আসছেন। তারপর জোড়াদীঘির খবর কি? আর কেউ এলেন না কেন?

আর কে আসবেন বল? আমি ছাড়া বুড়োবুড়ী, নয় নিতান্ত শিশু।

কিন্তু আসল কথাটি কি বল তো? তোমরা বিয়ের দিন না এসে তার কয়েক দিন পরে এলে কেন? এখান থেকে চিঠিপত্র কি সময়মত যায়নি?

চিঠিপত্র তো গিয়েইছে, কিন্তু সেই সঙ্গে গিয়েছেন রাজবাড়ির পুরুত ঠাকুর।

তোমাদের এই উষ্মা ও নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কারণ কি বল।

কারণ তুমিও জানো, আমিও জানতাম। সেই জানাই আমার এখানে বিয়েতে আসার বাধা সৃষ্টি করেছিল, যখন বাধা ভাঙল তখন অত্যন্ত দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমি ভালো বুঝতে পারছি না, খুলে বল।

তবে শোন। শুধু আমি বলে নয়—রক্তদহের রাজবাড়ির মেয়েকে বিয়ে করার সংবাদে জোড়াদীঘির ছোট-বড় হিন্দু মুসলমান সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয়দের তো কথাই নাই।

এবারে দীপ্তিনারায়ণ বলে উঠল, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। বাবার সেই নিষেধবাক্য।

তবে তো বুঝেইছ। রক্তদহের রাজবাড়ির সঙ্গে জেঠামশায়ের কি মত ছিল সে তো সর্বজনবিদিত। সেই ঘরে তুমি বিয়ে করছ শুনেও কেউ বিশ্বাস করেনি।

তুমি শুনেছো বটে, সবটা শোননি।

সবটা শুনলাম বটে, তবে কয়েকদিন পরে।

কি শুনলে, কেমন করে শুনলে বল দেখি?

তোমাদের এখানকার যে রাজবাড়ির পুরুত গিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন গিয়ে আমাদের গাঁয়ের টোলের পণ্ডিতমশায়ের আত্মীয়। তোমার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলে পুরুতঠাকুর বললেন, দর্পনারায়ণ বাবুজির নিষেধ ছিল রক্তদহের রাজবাড়ির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রাখে, রাজবাড়ির মেয়ে বিয়ে করার কথা তিনি ভাবতেই পারেননি। তখন তোমাদের পুরুতঠাকুর বুঝিয়ে বললেন, যে মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে সে পরন্তপ রায় বাবুজির ঔরসজাত বা রানীমাতার গর্ভজাত কন্যা নয়। রানীমায়ের এক মাসীর মৃত্যুকালে এই শিশুটিকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে যথারীতি তাকে দত্তক গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন পণ্ডিতমশায়, ঐ মেয়ের দেহে রক্তদহের রাজবংশের একবিন্দু রক্ত নেই। না পিতৃকুল থেকে, না মাতৃকুল থেকে। পণ্ডিত মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, এ কথা কি দীপ্তিনারায়ণ বাবুজি বিশ্বাস করেছিলেন?

সহজে করেননি। রাজবংশের গুরুঠাকুর পুরোহিতঠাকুর স্বয়ং রানীমাতা গৃহবিগৃহ শ্রীশ্রীলক্ষ্মী জনার্দনজীর সম্মুখে তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে যখন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন, তখন বাবুজির আর বিশ্বাস না করে উপায় রইল না। শুনে পণ্ডিতমশাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, যাক্ আপদঃ—শান্তি।

দু'পুরুষের বাদবিসম্বাদ এবারে বন্ধ হয়ে যাবে দেখছি। ভালোই হল। এই ক'বছর ধরে কি অশান্তি না চলেছে। এবার নূতন বধূমাতার কল্যাণে গাঁয়ের লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। তা এপক্ষ থেকে বিয়েতে যোগ দিতে যাবেন বলে কি মনে হল?

রাজবাড়ির পুরুতঠাকুর বলল কি কিছু বুঝলাম না। ভাবগতিক কিছু ভালো মনে হচ্ছে না। ছ'আনির বাড়িতে তো কেউ নেই। দশআনির বাড়ির বুড়ো কর্তা সব শুনে বললেন, আচ্ছা আপনি এখন আসুন, দেখি কে কে যায়। আমার তো এই শেষ অবস্থা দেখছেন—আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাতেই বুঝলাম গতিক ভালো নয়। নিতান্ত আপনি ছিলেন বলে স্নানাহারের অসুবিধা হয়নি। নতুবা রক্তদহ থেকে আসছি শুনে জমিদারবাড়িতে বসতে অবধি বলল না। পণ্ডিতমশাই বললেন, যাক্, যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে। শুভস্য শীঘ্রম্। এখন শুভবিবাহটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেলে সব দিক রক্ষা হয়।

এই পর্যন্ত বলে পার্থনারায়ণ বলল, দাদা এবারে তো বুঝলেন, না আসবার কারণ কি? পণ্ডিতমশায় কথাটা চেপে না রেখে ক'দিন আগে বললেই বিয়ের সময় উপস্থিত হতাম।

এমন সময় ইন্দ্রাণী প্রবেশ করলেন।

দীপ্তিনারায়ণ উঠে দাঁড়ল আর পার্থকে দেখিয়ে পরিচয় করে দিল, মা, পার্থনারায়ণ আমাদের দশআনি বাড়ির খুড়োমশায়ের সন্তান, আমার খুড়তুতো ভাই। আর পার্থর উদ্দেশে বলল, ইনি রানীমাতা।

তখন পার্থ তাঁকে প্রণাম করল।

ইন্দ্রাণী শুধালেন, তা বাবা বিয়ের সময় এলে না কেন? বোধ করি কোনো বাধা পড়েছিল?

পার্থ কিছু বলবার আগেই বাধা দিয়ে দীপ্তি বলল, সে অনেক কথা মা, পরে বলব। এদের কোনও দোষ নেই।

তখন ইন্দ্রাণী বলল, পথশ্রমে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, ভিতরে চলো, স্নানাহার করবে।

পার্থ বলল, সে হবেই। তার আগে বৌঠাকরুনের দর্শন চাই।

সেসব যথাসময়ে হবে, এখন ভিতরে এসো। তখন পার্থর ইঙ্গিতে তার সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, একটি শৌখিন বাক্স হাতে করে প্রবেশ করল। এতক্ষণ লোকটি বাইরে অপেক্ষা করছিল।

ও আবার কি?

পার্থ সবিনয়ে বলল, শুধুহাতে কি বৌঠাকরুনের শ্রীচরণ দর্শন করতে পারি? তাই কিছু উপহার এনেছি।

আচ্ছা ওকে আসতে বল, বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। দীপ্তি ও পার্থ সে লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাণীর অনুসরণ করল।

এখানে একটা কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। দর্পনারায়ণ চৌধুরীর ধুলোউড়ির কুঠিতে আত্মনির্বাসনের পরে তাঁর জ্ঞাতিরা কেউ বড় তাঁর খোঁজ নিত না। শরিকের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, তাঁর খোঁজখবর নেওয়া মানবস্বভাবসঙ্গত নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম পার্থনারায়ণ চৌধুরী। পার্থ ও দীপ্তি প্রায় সমবয়স্ক, দীপ্তি কিছু বড, সম্বন্ধে জ্ঞাতিভ্রাতা। পার্থ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হল মাঝে মাঝে ধুলোউড়ির কুঠিতে আসত। শেষবার এসেছিল দর্পনারায়ণ জীবিত থাকতে, সে খুব খুশি হত, পার্থকে দেখেনি, সে প্রায়ই শুধাতো, জেঠামশায়, জোড়াদীঘিতে নিয়ে যাবেন না? প্রত্যেক বারেই উত্তর পেত, যাব রে যাব।

কবে যাবেন?

সময় হলেই যাব।

পার্থ ও দীপ্তি অবাধে মাঠের মধ্যে বিলের ধারে ঘুরে বেড়াত। তাদের একমাত্র আলোচনার বিষয় ছিল, কি ভাবে রক্তদহের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়। নানারকম অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করত কিন্তু সিদ্ধান্ত বড় হত না। জোডাদীঘি বনাম রক্তদহর বাদবিসম্বাদের ইতিহাস সে জানত, আর জানত রক্তদহর জমিদারবাড়ির সম্বন্ধে দর্পনারায়ণের মনোভাব ও প্রচণ্ড জিঘাংসা। দর্পনারায়ণের মনোভাবের শাণপাথরে তারা দুজন তাদের কিশোর মনকে শাণিত করত আর ভাবত প্রতিশোধ নেওয়া যদিবা সম্ভব না হয়, তবু ক্ষমা কিছুতেই নয়। তারপরে যখন হঠাৎ রক্তদহের জমিদারবাড়ির মেয়ের সঙ্গে দীপ্তি-নারায়ণের বিবাহের সংবাদ পেল সে হতভম্ব হয়ে গেল, বিবাহে যোগদান তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হল। তারপরে কি ভাবে প্রকৃত তথ্য জানলো এবং উপ-ঢৌকন নিয়ে রক্তদহে রাজবাড়িতে এসে উপস্থিত হল সে বৃত্তান্ত পাঠক অবগত হয়েছেন।

২৫

দিন দুয়েকের মধ্যেই চন্দনীর সঙ্গে পার্থর বেশ ভাব জমে গেল। সেকালে নূতন বৌদিদের প্রধান নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল ছিল দেওরগণ। শ্বশুর ভাসুর শাশুড়ী প্রভৃতি অত্যন্ত ভক্তির পাত্র ছিল, আর ভক্তির পাত্র বলে ঘেঁষবার রীতি ছিল না। এমন কি স্বামীও দিনের আলোয় অসূর্যম্পশ্য ছিল। এরকম ক্ষেত্রে একটি দেবররূপ ভাসমান ভেলা না পেলে বৌদিদের নূতন সংসারে জীবনযাপন প্রায় অসম্ভব হত। যা কিছু আদর-আব্দার চলত দেবরের সঙ্গে। একালে অবশ্য সমস্তই উল্টে গিয়েছে। ভক্তিজনক দূরত্বটা লোপ পেয়ে সমস্তটা কাছাকাছি এসে পড়ায় ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তা জানি না, যা হয়েছে বলছি। বৌঠাকুরানীদের দল এখন বৌদিতে পরিণত হয়েছে। স্বামীদের এখন অবারিত দ্বার। কাজেই পার্থর সঙ্গে যে চন্দনীর ভাব জমে যাবে তা অপ্রত্যাশিত নয়। তবে চন্দনীর ক্ষেত্রে কতকটা সুবিধা ছিল এই যে, বাপ-মায়ের সে একমাত্র মেয়ে। অন্য ভাই-বোন না থাকায় নিতান্ত আদরের ছিল। আর দীপ্তিনারায়ণের বিয়ের আগে থেকেই আদর আব্দার রেষারেষি চলত, তবু পার্থকে না পেলে তার জীবন-ধারণ এত সহজ হত না।

পার্থ বলত, বৌঠাকরুন, তোমার ঐ চন্দনী নামটা বদলে ফেল।

চন্দনী বলত, কেন বল তো!

ওটা তোমাকে মানায় না।

কেন আমি কি কালো?

আমি কি তাই বলেছি? আমি বলতে চেয়েছিলাম চন্দন দুই রকমের।

আমি কোন্ রকমের শুনি?

বলছি, ব্যস্ত হচ্ছো কেন, শোন, তুমি যখন দাদার উপর রেগে যাও তখন তোমার মুখে রক্তচন্দনের আভা পড়ে।

আমি কখনো তোমার দাদার উপরে রাগিনি।

রাগবে রাগবে, এখনি কি হয়েছে! সবে তো খেলা শুরু!

আর শ্বেতচন্দন কখন?

এই যেমন আমার সঙ্গে কথা বলছ।

এখন রঙের ব্যাখ্যা থাক। তারপর তোমাদের জোড়াদীঘির কথা বল।

সেই কথা বলব বলেই তো বসেছি তোমার কাছে। একদিন দেখলাম, মেলা লোকজন, মিস্ত্রী, ছুতোর ঢুকলো তোমাদের বাড়িতে। শুধোলাম এসব কি হচ্ছে ? উত্তর পেলাম বাড়ি মেরামত করবার জন্য আমরা এসেছি। কে পাঠালো তোমাদের ? বলল, বাড়ির মালিক। ভাবলাম দাদা আমার কোথাও গুপ্তধন পেয়েছে, নইলে এত খরচের মধ্যে গেল কি করে ? দেখতে দেখতে মাস দুয়েকের মধ্যে বেমেরামতি বাড়ি দিব্যি নতুন হয়ে উঠল। ভাবলাম তবে কি দাদা বিয়ে করছে ? নইলে হঠাৎ এমন রাজসূয় আয়োজন করতে যাবে কেন ?

এবারে চন্দনী বলল—তোমার দাদার মুখে তোমাদের গাঁয়ের কথা শুনেছি। একবার আরম্ভ করলে আর শেষ হতে চাইত না। বলতাম, এতই যদি গাঁয়ের প্রতি টান, ফিরে যাও না কেন ? বলত কি জানো ? আমি আমার গাঁয়ে যাই, আর তুমি খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে অন্য গাঁয়ে উড়ে চলে যাও !

আচ্ছা বৌঠান, তোমাদের বিয়ে তো হয়েছে এই কয়দিন, এত কথা বলার সময় পেলে কোথায় ?

কেন ? বিয়ের আগে কি কথা বলতে নেই।

চন্দনীর উত্তর শুনে পার্থ হকচকিয়ে গেল। সে জানতো না বিয়ের আগে কথা কয় কনেতে। তাকে কোনও উত্তর দিতে না দেখে চন্দনী জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছো ?

ভাবছি তুমি বলে তাই, বাপ-মায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে, যা করছো যা বলছো তাতেই সকলে খুশী।

বুঝেছি মশায়। তোমার সঙ্গে এমন একটি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, বিয়ের আগে যে তোমার সঙ্গে কথা বলেছে, তাহলে আর হিংসার কারণ থাকবে না।

পার্থ বলল, বৌঠান, এখন কথা-কাটাকাটি থাক। তোমার বৃন্দাবনী মাসীকে বল একটা গান শোনাক।

মাসী কি বলে জানো ? সবাই যদি আমার গান শুনতে চায়, তবে ঐ কুসমীর গান শুনবে কে ?

বেশ, তবে কুসমীই শোনাক।

চন্দনীর ডাকে কুসমী এসে উপস্থিত হল। এই কয়দিনে কুসমীর বেশ পরিবর্তন হয়েছে। এখন ধুলোউড়িতে থাকতে তার যে বিষণ্ণ ভাব ছিল, তা কেটে গিয়েছে। এখানে তার দুটি কাজ। বৃন্দাবনী মাসীর কাছে গান শেখা আর চন্দনীর ফাইফরমাস খাটা।

কুসমী, আমার এই দেওরকে একটা গান শোনাও। সে তোমার গলার খুব প্রশংসা করছিল।

গান শোনাতে বললে কুসমীর বড় আপত্তি হত না। সে বসে পড়ে গুন্‌গুন্ করে শুরু করল।—

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হোল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নিলজ্জা রমণী বোলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক ধিক আমারে, ধিক সে বিধাতারে।
নারী জনম যেন করে না॥

এমন সময় পিছন থেকে হঠাৎ দীপ্তিনারায়ণ বলে উঠল, এই তো এসেছি। বৃথা খেদ না করে কি বলবার ছিল বলে ফেল।

মাথায় ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে চন্দনী বলল, তুমি কখন এলে?

তোমার করুণ মিনতি শুনে কাছারিতে আর মন টিকল না। পরগণার মণ্ডলদের বললাম, তোমরা বসো আমি আসছি। তারপরে পার্থর দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই, তুমি যে তোমার বৌদিকে দখল করে বসলে, আমাকে কাছেই বসতে দেয় না।

কৃত্রিম উষ্মার সঙ্গে চন্দনী বলল, কি বাজে কথা বলছ? এই প্রথম গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হল, গল্প করব না?

শুনলে পার্থ? এর মধ্যেই জোড়াদীঘি ওঁর গাঁ হয়ে গেল। আর যেখানে শৈশব থেকে মানুষ হলেন সেই রক্তদহকে আর মনেই ধরল না। আচ্ছা দেখা যাবে। বাড়ি ছেড়ে জোড়াদীঘি যাবার সময় কাঁদো কিনা!

সে তো সব মেয়েই কাঁদে।

আচ্ছা বাপু তাই হল, তোমারই জিত।

এমন সময় অন্দর থেকে ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চন্দনী একবার এদিকে এসো তো মা।

'আসি মা' বলে চন্দনী দাঁড়িয়ে উঠল। আর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, এবারে দুই ভাই বসে গল্প করো, আমি চললাম।

চন্দনীকে ডাকবার আগে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল ইন্দ্রাণী। তার মনে হল এই যেন প্রথমবার তাকে দেখতে পেল। মনে হল এই মেয়ে যেন তার মেয়ে নয়, কোথায় কি একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কিসে ঘটলো পরিবর্তন, কি ভাবে সে পরিবর্তন ঘটেছে বুঝতে পারল না। সে কি কোনো অজ্ঞাত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় না প্রেমের উদ্বোধনে! ঘরের মেয়েকে নববধূ বেশে দেখলে কেন এমন দেখায় বুঝতে পারল না ইন্দ্রাণী। এ যেন ঘরের প্রদীপ নয়, আকাশের শুকতারা। দিগন্তের কাছে, তবু দিগন্তকে স্পর্শ করেনি। অবাক হয়ে গেল ইন্দ্রাণী, ডাকবে ডাকবে করেও ডাকতে পারেনি। এমন সময় শুনল, চন্দনী বলছে কেন ডাকছো মা?

ইন্দ্রাণী বলল কেন ডাকছি আবার, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে না? সে কি রে বোকা মেয়ে? বয়স হল তবু বুঝতে পারছিস না?

মা, তোমার ভাবগতিক বুঝতে পারি না। এতদিন বলতে বয়স হয়নি, আজ আবার বলছ বয়স হল।

তোকে যেতে হবে না?

কোথায় যাব মা?

কেন, শ্বশুরবাড়ি!

এ বাড়িতে তবে কি দোষ করল?

আরে বোকা মেয়ে, বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় সে কি জানতিস না?

যদি জানতাম, তবে বিয়ে করতাম না।

শোন একবার মেয়ের কথা। এতদিন বিয়ের জন্য ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিলি, এখন বলছিস এমন জানলে বিয়ে করতাম না!

কেন মা, তোমার তো বিয়ে হয়েছে, তুমি তো এই বাড়িতেই রয়ে গিয়েছো।

শ্বশুরবাড়ি যেতে পারলাম না, এ কি আমার কম দুঃখ!

দুঃখের তো কিছু দেখিনি তোমার মুখে। বেশ হাসিখুশিতে আছ, সকলের উপর কর্তৃত্ব করছ, সকলে রানীমা বলে টিপ্‌ টিপ্‌ করে দুবেলা প্রণাম করছে, আবার বলো কি না দুঃখ!

শোন বোকা মেয়ে, সব মেয়েই বিয়ের পরে নিজের বাড়িতে রানী। সেখানেও তোকে প্রণাম করবার লোকের অভাব হবে না। সকলেই রানীমা বলে টিপ্‌ টিপ্‌ করে প্রণাম করবে।

তবে কি এ-বাড়ি আমার নয়?

তোর বৈকি। মাঝে মাঝে যখন খুশি আসবি।

তুমিও কেন আমার সঙ্গে চলো না?

আরে বোকা মেয়ে, শাশুড়ী কি মেয়ের বাড়িতে যায়? তাছাড়া আমি তো এ বাড়িতে থাকছি না, তোরা রওনা হলেই আমি বলে বৃন্দাবন চলে যাব।

একবার তো বৃন্দাবন চলে গিয়েছিলে। তবে আবার ফিরে এলে কেন?

তখনও সব দায় মিটে যায়নি বলেই ব্রজেশ্বর কৃপা করলেন না।

তোমার ব্রজেশ্বরের বলিহারি যাই মা। মেয়ে হল কি না দায়, তাকে বিলের জলে ফেলে দিয়ে দায়মুক্ত হলে।

ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বলিস না, বৃন্দাবনী মাসী শুনলে ভীষণ রাগ করবে।

তোমরা দুটিতে বেশ জুটেছো, একজন ব্রজেশ্বরের দালাল, আর একজন তার সেথো।

তুই জানিস বৃন্দাবনী মাসী তোকে কত ভালোবাসে!

আর আমার ভালোবাসায় দরকার নেই, আমি তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাব।

বৃন্দাবনে যাবি, তবে আমার সঙ্গে নয়। স্বয়ং ব্রজেশ্বরের সঙ্গে।

তবে ব্রজেশ্বরকেও নিয়ে চলো না কেন?

সকলের বৃন্দাবন তো এক জায়গায় নয়। তোর বৃন্দাবন জোড়াদীঘিতে, তোর বাড়িতে।

বৃন্দাবন কিনা জানি না, তবে ঘোর বন। পার্থর কাছে সব শুনেছি।

সে কি বলিস, সেটা মস্ত গ্রাম। এই রক্তদহর থেকেও বড়। আর জোড়া-দীঘির জমিদাররা রক্তদহর জমিদারের চেয়ে অনেক বড়। এখানে আমাকে রানীমা বলে, তোকে ওখানে মহারানীমা বলবে।

আমার আর মহারানী হয়ে কাজ নেই, আমি চললাম।

কোথায়?

জিনিসপত্র গোছাতে, বিদায় তো করবেই জানি, তাই সব গুছিয়ে নিই। মনের ভুলে কিছু না ফেলে যাই।

ইন্দ্রাণী মৃদু হেসে বলল, এই দেখ শ্বশুরবাড়ির রস ধরেছে। এতকালের বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় কোনও কিছু ফেলে যেতে চায় না মন, একেই বলে শ্বশুরবাড়ির রস!

তোমার তো বৃন্দাবনের রসে ধরেছে, ভুলে কিছু ফেলে যেয়ো না।

আমার আবার জিনিসপত্র কি, হরিনামের মালাই একমাত্র সম্বল।

ওরকম সম্বল নিয়ে অনেকেই বৃন্দাবনে যায় শুনেছি। কলকাতার এক মহারাজা তোমার মতো হরিনামের মালা সম্বল করে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন, আর তাঁর দেওয়ান মাসে মাসে তাঁকে মোটা টাকা ইরশাল করত।

সে তো বৃন্দাবনের সাধুসজ্জনদের ভোজের জন্য।

এখানেও দেওয়ানজি তোমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাবে, সেখানে ভুঁড়ি-ওলা সাধুসজ্জনদের ভোজ দেবে। দেখো যেন ওদের অজীর্ণ রোগে না ধরে।

তা তুই না হয় দেওয়ানজিকে নিষেধ করে দিস টাকা পাঠাতে। এখন তো সমস্তই তোর হল।

আমার না তোমার জামাইয়ের!

ও দুই একই কথা।

এমন সুখের জায়গা না হলে কি আর লোকে তীর্থে যায়? দায়দফা নেই, প্রজাদের সুখদুঃখের নালিশ শুনবার ঝক্কি নেই, কেবল মাসান্তে মণিঅর্ডার সই করে নিয়ে সাধুসজ্জনের পেট ভরানো। দেখো মা, সাধুসজ্জনদের পেট ভরাতে গিয়ে হরিনাম করতে ভুলে যেয়ো না।

আমি ভুললেও তোর বৃন্দাবনী মাসী ভুলতে দেবে না।

সেইজন্যই তো তাকে ব্রজেশ্বরের দালাল বলেছি।

বৃন্দাবনের উপর এত রাগ কেন? মাঝে মাঝে না হয় তোরাও যাস।

আমার বাপু অত ভক্তিটক্তি নেই।

ওই শোন, বৃন্দাবনী মাসী গান করছে।

বজরার সঙ্গে একখানা ডিঙি নৌকোও জুড়ে দিয়েছো!

সেটা আবার কি?

কেন, কুসমী মেয়েটা! আচ্ছা মা, অতটুকু মেয়েকে তীর্থে টেনে নিয়ে যাচ্ছো কেন?

ওর যে তিনকুলে কেউ নেই।

যার তিনকুলে কেউ নেই, তার বুঝি সবই গোকুলে!

যাক্ এতক্ষণে একটা জ্ঞানের কথা বলেছিস।

জ্ঞান হবে না! বৃন্দাবনী মাসী কানের কাছে সারাক্ষণ যে ঘ্যানঘ্যান করছে, এতেও যদি জ্ঞান না হয়, তবে আর জ্ঞান হবে কিসে?

ওরে বৃন্দাবনী মাসীকে তো তুই জুটিয়েছিস।

এমন জানলে কি তাকে জোটাতে যাই! ও-ই তোমাকে ঘর-ছাড়া করল।

ও নিজেই যে ঘরছাড়া। যা, এখন আর কথা-কাটাকাটিতে কাজ নেই, দেখিস যেন কিছু ফেলে যাসনে, তাহলেই পরদিন জোড়াদীঘির পাইক এসে দাবী করবে।

তাতে তোমার ভয় কি মা, সে দাবী মেটাতে তো তুমি এখানে থাকবে না। আচ্ছা বৃন্দাবনে গেলে কি কেউ আর ফেরে না?

ব্রজেশ্বরের অভিপ্রায় হলেই ফেরে।

তোমার ব্রজেশ্বরটিও কম দালাল নয়। বেছে বেছে ধনীঘরের লোককে আমদানি করেন, যাতে তাঁর ভক্তদের ভোগের না অভাব হয়।

চরাচরের যিনি মালিক, তাঁর আর অভাব কিসের?

অভাব যদি না থাকে, তবে তিনি নিজে যোগালেই পাবেন। ধনীঘরের লোক বেছে বেছে টান দেওয়া কেন?

এটা আর বুঝলি নে, ভগবান তো নিজের হাতে কিছু দেন না, পরকে দিয়ে দেওয়ান।

এখন দেখছি তোমরা সবাই ছোটখাটো ভগবান। তোমাদের হাত হচ্ছে দেওয়ান, মুৎসুদ্দিরা, দেখো মা, হাতের কৃপায় তোমায় না ফতুর করে ফেলে!

ফতুর হলেও তুই, আর না হলেও তুই, আমার কি?

আমি দেওয়ানজিকে সাবধান করে দেবো, বুঝেসুঝে টাকা পাঠাতে।

দেখিস আমাকে যেন না খেয়ে মরতে না হয়।

তোমার আর অন্নের দরকার কি? হরিচরণামৃতই তো তোমার এখন অন্নজল।

আহা বাছা, তোমার কথা যেন সত্যি হয়।

এমন সময় একজন দাসী এসে জানালো বাইরে দেওয়ানজি রানীমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছে।

বৌমা, এবার তো যাত্রার আয়োজন করতে হয়।

ওর মধ্যে আর আমাকে টানবেন না। আপনি আছেন, ভাদুড়ী আছেন, আবার দয়ারাম চক্রবর্তী আছেন—যা হয় স্থির করে ফেলবেন।

বুঝেছি, যাত্রার কথা মনে করতেই তোমার চোখ ছলছল করে ওঠে। কিন্তু বিয়ে যখনই দিয়েছ তখনই তো মেয়েকে মনে মনে বিদায় করে দিতে প্রস্তুত হয়েছ। তবে আমি ভাবছি সে-বাড়িতে লোকজন অবশ্যই আছে, বাড়িটাও আমাদের লোক গিয়ে মেরামত করে প্রায় আগেকার মতই করে দিয়ে এসেছে, কিন্তু ভাবছি কি নূতন বৌ গেলে সেখানে বরণ করে ঘরে তুলবে কে?

সেসব কথা আমি পার্থর মুখে শুনেছি। পার্থর মা সম্পর্কে দীপ্তিনারায়ণের খুড়িমা, চন্দনীর খুড়ি-শাশুড়ী। তিনি ঘাটে এসে বৌকে ঘরে নিয়ে যাবেন। আবার দীপ্তিও তার মামীমাদের লিখে দিয়েছে, তাঁরা যেন আসেন। তাছাড়া এখান থেকে মুক্তা নামে যে দাসী শৈশব থেকে ওকে মানুষ করেছিল, তাকেও সঙ্গে দেবো ভাবছি।

তবে আমি ভাবছি কি বৌমা, যাদের কথা বললে, তারা সবাই তার গুরুজন, কেউই সমবয়সী নয়। আচ্ছা একটা কাজ করা যায় না? ঐ যে কুসমী নামে যে মেয়েটা এসেছে, তাকে সঙ্গে দিতে পারো না? তাহলে বেশ হয়।

সেসব কথা আমি তুলেছিলাম কুসমীর কাছে, শুনে সে চোখের ধারা খুলে দিল, আর আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল—রানীমা, আপনার চরণ ছাড়া আর কোথাও যাব না। আমি বললাম—সে কি রে, চন্দনী তোকে এত ভালোবাসে, তুই সঙ্গে থাকলে দুটো কথা বলার লোক পেত। শুনে সে কি বলল জানেন? এখন চন্দনীদিদির কথা বলবার লোকের অভাব হবে না। আর তাছাড়া সে যাচ্ছে নূতন ঘর করতে। আমি বললাম, শুধু দালানকোঠা নিয়ে কি ঘর, একটা মনের মতো মানুষও তো সঙ্গে থাকা চাই। তারপরে সে কাঁদে আর বলে, আমি অলুক্ষুণে মেয়ে, জীবনে কোথাও ঘর জুটলো না। আমি সঙ্গে গেলে চন্দনীদিদির অমঙ্গল হবে। বললাম—ও কি কথা বাছা? তুমি সঙ্গে গেলে দুটো গান শোনাতে পারবে, ধুলোউড়ির কথা, এখানকার কথা সবই হতে পারবে তোমার সঙ্গে। তা ওর মুখে এক বুলি, না মা—আমি আর কোথাও যাব না—তোমার চরণ থেকে গিয়ে পড়ব একেবারে ব্রজেশ্বরের চরণে। যার আর কোথাও ঠাঁই হল না, তিনি নিশ্চয়ই দয়া করে চরণে আশ্রয় দেবেন।

ইন্দ্রাণীর কথা শুনে দেওয়ানজি হেসে বলল, মনে হচ্ছে এসব কথা সে বৃন্দাবনী মাসীর কাছে থেকে শিখেছে।

না দেওয়ান জেঠা, ঐ দুঃখী মেয়েটাকে আমার কাছছাড়া করব না।

তবে তাই হোক—বলল দেওয়ানজি। এদিকে আমি কি ব্যবস্থা করেছি, তাই শুনিয়ে যাই তোমাকে। দুখানা বড় বজরা, একখানা তো ছিলই তোমার, আর একখানা বর-কনের জন্যে ফরমাস দিয়ে তৈরী করিয়ে নিয়েছি, তাছাড়া দুখানা ঢাকাই নৌকো আনিয়েছি, দানসামগ্রী আর যৌতুকের জন্য। সেই দুখানার মধ্যেই এখান থেকে যারা সঙ্গে যাবে তাদের কুলিয়ে যাবে, আর তোমার জন্য আমাদের আগেকার সেই বড় বজরা আছে, তাতেই কুলোবে।

ইন্দ্রাণী দেওয়ানজির কথা শুনে বলল, তবে তো সব রকম ব্যবস্থাই সুসম্পন্ন করেছেন।

না বৌমা, সকল ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। ঐ মুকুন্দ লোকটার কি গতি হবে?

ইন্দ্রাণী বলল, তাকে পথে ঐ ধুলোউড়ির ঘাটে নামিয়ে দিতে হবে। আমি তাকে বললাম, কেন মুকুন্দ, আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে চলো না। তোমার তো বৃন্দাবনে যাবারই এই বয়স। শুনে সে কি বলল জানেন? তীর্থে যাবার সময় অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু অবস্থা হয়নি। আমি শুধালাম, অবস্থা বলতে কি বুঝছ মুকুন্দ?

সে বলল, অবস্থা বলতে ব্যবস্থা।

ব্যবস্থা আবার কি?

কর্তাবাবুর আদেশ, ধুলোউড়ির কুঠি যেন ছেড়ে না যাই। আরো বলেছিলেন, কুঠি তুমি আগলাবে। দীপ্তিকে আগলাবে মোহন। মোহন তো দাদাবাবুর সঙ্গেই যাচ্ছে। এবার এখন তোমার সঙ্গে আমি রওনা হব, আমাকে দয়া করে ধুলোউড়ির ঘাটে নামিয়ে দিয়ে যেও।

আমি বললাম, ধুলোউড়ি নিয়ে তো এখন আর ভাবনার কারণ নেই। কুঠি-বাড়িটার ওপর লোভ ছিল ঈশান রায় নামের ঐ লোকটার। তা কুঠি আক্রমণ করতে এসে পাটহাতী সমেত লোকটা চলনবিলের চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে গেল।

আর কি শুধু তাই মা! মোহনের কাছে শুনলাম, হাতিসমেত সে যখন তলিয়ে যাচ্ছে, কি একটা সংস্কৃত শোলোক আউড়েছিল।

ইন্দ্রাণী হেসে উঠে বলল, সেকথা শুনেছি। দয়ারাম চক্রবর্তী বলল, লোকটা নরকে গিয়েও সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে থাকবে, তাতে নাকি যমরাজ ঘাড় ধরে তাকে নরক থেকে তাড়িয়ে দেবেন, বলবেন—এখানে তোর ঠাই হবে না, যা পাঠশালে গিয়ে পণ্ডিতি কর্ গিয়ে।

ইন্দ্রাণী বলল, মুকুন্দ, তবে তো কুঠিবাড়ির সংকট কেটেই গিয়েছে। এমন অবস্থায় তোমার কর্তাবাবু থাকলে তোমার কর্তাবাবু তোমাকে বৃন্দাবনে যেতে হুকুম দিতেন।

তা কি করে জানবো মা! যেটুকু জেনেছি সেই অনুসারে আমাকে চলতে হবে।

মুকুন্দর কথা শুনে ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপরে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমিই সুখী মুকুন্দ। যা হোক একটা হুকুম পেয়েছ, আর সেটাকে আঁকড়ে ধরে আছ।

মুকুন্দ তার পায়ের কাছে প্রণাম করে বলল, সেই আশীর্বাদ করো মা যাতে চলনবিল আমার যমুনা হয়। আর কুঠিবাড়ির বাগানটা হয় আমার বৃন্দাবন। ওখানেই যেন আমি দেহরক্ষা করতে পারি, এই আশীর্বাদ করো। বলে আবার পায়ের ধুলো নিলো।

ইন্দ্রাণী বলল, এতবড় আশীর্বাদ করবার আমি কে? যিনি বৃন্দাবনের রাজা, তিনিই তোমায় আশীর্বাদ করবেন।

এতক্ষণ দেওয়ানজি নীরবে শুনছিল, এবার বলল—দর্পনারায়ণ বাবুজি দুটো লোকের মতো লোক রেখে গিয়েছেন, কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। ঐ মুকুন্দ আর মোহন।

তখন দেওয়ানজির উদ্দেশে ইন্দ্রাণী বলল, আগামীকাল তো আমাদের যাত্রার দিন। কি রকম কি ব্যবস্থা করেছেন? বজরার কথা তো শুনলাম, কিন্তু সঙ্গে লোকজন কারা যাবে তা তো বললেন না! অবশ্য আমাদের সঙ্গে একজন বরকন্দাজ থাকলেই চলবে। কিন্তু বর-কনের সঙ্গে ভালো রকম পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে।

দেওয়ানজি বলল, সে ব্যবস্থা আমাদের বিশেষ করবার দরকার আছে মনে হয় না। পরগণার প্রধানরা আমাকে জানিয়ে গিয়েছে, নৌকোর সঙ্গে পাহারার ভার তাদের। আমরা যেন ব্যস্ত না হই।

তবে তো ভালোই হল। তারা কবে এসেছিল?

এসেছে আজ দিন দুই হল, এখনও তারা বাইরে বসে আছে।

কেন বলুন তো?

তারা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে নজরানা দিতে চায়।

ইন্দ্রাণী বলল, না না দেওয়ান জ্যাঠা, নজরানা এখন আমাকে না। ও-সম্পত্তির মালিক এখন দীপ্তিনারায়ণ। কাজেই নজরানা দিতে হলে তাকেই যেন দেয়।

সে কাজ তো তারা রাজবাড়িতে পৌছেই সেরেছে। তবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবে, সে কি খালি হাতে করতে পারে?

ইন্দ্রাণী বলল, এতদিন যা হয় করেছি, মেয়ের গোত্রান্তরের সঙ্গে সম্পত্তিরও

হস্তান্তর ঘটে গিয়েছে। তাদের বলবেন, আমি অমনি তাদের আশীর্বাদ করছি। তারপরে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমাকে একবার ভেতরে যেতে হবে। পাড়ার মেয়েরা সবাই এসেছে, চন্দনীকে বিদায় জানাতে।

তা যদি বললে বৌমা, বাইরের কাছারিঘর আর উঠোন ভরে গিয়েছে বক্তদহ গাঁয়ের লোকজনে। ইতর ভদ্দর ছেলে বুড়ো কেউ আর বাদ নেই। আমি বললাম, এখানে বসে আর তোমরা কি করবে, কালকে নদীর ঘাটেই তো সকলকে দেখতে পাবে। তারা কি বলল জানো বৌমা? সেখানে দোবে, চোবে, বরকন্দাজদের ভিড় ঠেলে কি আমরা এগোতে পারব?

এই কথা শুনে ইন্দ্রাণী বলে উঠল, কেউ যেন দেখা করতে এসে বাধা না পায় খেয়াল রাখবেন।

সে খেয়াল আমার আছে, আর ওরাও তা জানে, তবে কি না সুযোগ পেলে দোবে, চোবে, বরকন্দাজদের উপর দোষ চাপানো অভ্যেস হয়ে গেছে।

এমন সময়ে দেওয়ানজি বলে উঠল, আহা, অন্দরমহলে এমন সুন্দর গানটি কে করছে? নিশ্চয় আমাদের বৃন্দাবনী মাসী।

ইন্দ্রাণী বলল, মাসীর সঙ্গে বোনঝিও জুটেছে।

কে, আমাদের ধুলোউড়ির কুসমী বুঝি?

হ্যাঁ, এই গানটা বজরার মধ্যে গেয়ে শোনাবে বলে দুইজনে অভ্যেস করে নিচ্ছে।

দেওয়ানজি বলল, কাল কি ভিড়ের আর লোকের ব্যস্ততায় গান শুনবার অবকাশ থাকবে? বৌমা এখন কাজের কথা থাক্, আমি দুই কান ভরে গানটা শুনে নিই।

তখন অন্দরমহল থেকে দুজনের কণ্ঠে মিলিত সুরে গীত হচ্ছিল।—

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্ত প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী॥
মুক্তিকামনা আমারি, হবে বৃন্দা গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনার্দন, পাপ ভার গোবর্ধন।
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি।
তিষ্ঠ সদা হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি॥

আমার প্রেমরূপ যমুনাকূলে, আশা-বংশী বট-মূলে।
সদয় ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি॥
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আমি ব্রজধামে।
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি॥

গানটা শুনতে শুনতে বৃদ্ধ দেওয়ানের দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল। ইন্দ্রাণীর চোখও শুষ্ক ছিল না।

দেওয়ানজি আপন মনে বলে উঠল, আহা! গানটি যেন তোমাদের বৃন্দাবন যাত্রার কথা ভেবেই লিখিত হয়েছিল। তোমাদের দুজনের বজরা দুই মুখে যাত্রা করবে, আর এদিকে এতবড় গ্রামটা খালি হয়ে গিয়ে খাঁ-খাঁ করতে থাকবে।

এসব কথার তো উত্তর কেউ প্রত্যাশা করে না। কাজেই দুজনে চুপ করে থাকল। কেবল দুজনের মনই একটি কথা ভাবছিল। এখানকার পালা শেষ হয়ে গেল, না-জানি ভাগ্যে কি আছে! যাই থাকুক, নূতন পথে যাত্রা করা ছাড়া আর উপায় কি?

আগামীকল্য সেই দিন।

সমাপ্ত